Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.07.01 19:31:43 +06'00'

মধ্যরাতের রাখাল

সমরেশ মজুমদার

www.boiRboi.blogspot.com

মধ্যরাতের রাখাল
সমরেশ মজুমদার

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৩
প্রকাশক : অমল সাহা
সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ : অনুপ রায়
মুদ্রক : প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২বি বেলেঘাটা রোড কলকাতা ৭০০ ০১৫
দাম : ১০০ টাকা।
ISBN 81-7870-017-4

www.boiRboi.blogspot.com

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৭৭
খুলনা

সূচিপত্র

মধ্যরাতের রাখাল ৯
মেঘবালকের সমুদ্রযাত্রা ৪৯
নিকটকথা ১০৮
ম্লান-অম্লান ১৫৮

www.boiRboi.blogspot.com

মধ্যরাতের রাখাল

লাফিয়ে উঠল অমিতাভ বচ্চন। আজ সেই লাফানোর মুহূর্তেই তার ডান পায়ের লাথিতে তিন তিনটে গুণ্ডা গড়িয়ে গেল। প্রচণ্ড চিৎকার উঠল মাঠজুড়ে। চার পাশের ঘন অন্ধকার ফুঁড়ে সেই চিৎকার গড়িয়ে গেল ভুটানের পাহাড় পর্যন্ত। এরই মধ্যে কেউ কেউ চিৎকার শুরু করেছে, দৃশ্যটা আবার দেখাতে হবে। অপারেটার সেই দাবীতে কান দিচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি ছবি শেষ করতে পারলে আজ রাতের মত তার ছুটি। অমিতাভ বচ্চন এখন হেমা মালিনীর সামনে দাঁড়িয়ে। স্বপ্নের সুন্দরী! চিৎকারটা পাল্টে গেল। উঃ, আঃ, ওহো ইত্যাদির সঙ্গে বকরবকর আওয়াজ পাওয়া গেল। এসব ছাপিয়ে বেদিয়া বুড়ির গলা শোনা গেল, 'এই হারামীর দল, আওয়াজ বন্ধ করে মন দিয়ে দ্যাখনা, জিন্দেগীতে যা দেখিসনি তা দেখার সময় মন দিয়ে দেখতে হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে ঠ্যা ঠ্যা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বেদিয়া বুড়িকে কেউ চট করে চায় না।

অপারেটারের নাম প্রেমনাথ। বয়স চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে। মদ্যপানে তার আসক্তি প্রবল। গুরু বলে দিয়েছিল কাজের সময় পেটে যেন মাল না থাকে। আজ পর্যন্ত সেই আদেশ মেনে চলেছে। ইদানীং মানতে খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে কষ্টটা বেড়ে গেলে দু-একটা রিল দেখায় না ছবি ছোট করার জন্যে। একবার ধরা পড়ে মার খাওয়ার জোগাড়। এ শালারা হাভাতে। খেতে বসার আগে খাবারের পরিমাণ দেখে রাখে। কত রিল কটা ক্যানে আছে জেনে নেয়।

প্রেমনাথ ক্যানগুলো বাঁধার উপক্রম করছিল। ছবি ভেঙ্গেছে, আলো জ্বলেছে তবু ভিড় সরে যায়নি। চাবাগানের নারী-পুরুষ শ্রমিকেরা এখন প্রেমনাথের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। প্রেমনাথের এখন অনেক কাজ। পর্দা খোলা, বাক্স বাঁধা থেকে শুরু করে প্রজেক্টার নিরাপদে নিয়ে যাওয়া, সবই প্রায় এক হাতে করতে হয়। তবে এই বাগানে এলে ডেভিড নামের একটা ছোকরা তার ন্যাওটা হয়ে যায়। এইসব কাজ করতে পারলে ছোকরা যেন খুশী হয়। প্রেমনাথ দেখল ডেভিডের পেছন পেছন আরও তিন-চারজন কাছে এসে মাথা চুলকাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

ডেভিড বলল, 'এই হারামীদের মন ভরেনি বলছে।'

প্রেমনাথ মাথা নাড়ল, 'না ভরারই কথা। সুপার ডুপার হিট ফিল্ম। কলকাতা বোম্বেতে হাজার হাজার নাইট হাউসফুল। এক একজন দশবার দেখেছে। এরা তো মাত্র একবার দেখল! কিন্তু বাবারা আমাকে যেতে হবে।'

২—

ডেভিড বলল, 'যদি ওই জায়গাটা আর একবার দেখিয়ে দেন!'

'কোন জায়গাটা? টিসুম?' শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ল প্রেমনাথ।

'নাঃ লাস্টের ওই ড্যান্স।'

'হুম্! ওরকম ড্যান্স এর আগে দেখেছিস?'

'না।'

'শহরে হলে পয়সা পড়ত ওই ড্যান্সের সময়। নো টাইম। আমার সঙ্গে কোম্পানির কন্ট্রাক্ট একটা সিনেমা মানে দেখাতে হবে। দেখিয়ে দিয়েছি। রিপিট দি পিকচার করার কোন কথা নেই। তবে তোরা যখন বলছিস—! ভাল জিনিস দেখতে হলে পয়সা খরচ করতে হয়। এক বোতল ভুটান নিয়ে আয়।'

এক বোতল ভুটান মানে কমসে কম ষোল টাকা। ছেলেগুলো অসহায় হয়ে গেল। মাইনের দিন হলে কোনমতে হয়ে যেত, এখন মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। তবু চাঁদা তোলা আরম্ভ হল। কুড়িয়ে বাড়িয়ে টাকা বারো উঠতে প্রেমনাথ দয়া করে সেই দৃশ্যটি পর্দায় ফেলল যেখানে হেমা মালিনীর শরীর বিভিন্ন ভঙ্গীতে নেচে যাচ্ছে। কেউ একজন হেঁড়ে গলায় চেঁচাল, 'স্বপ্ন কি রাণী কব আয়েগী তু—?'

ফ্যাক্টরির পাশে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসের একটা ঘরে বসে হাঁড়িয়া খাচ্ছিল প্রেমনাথ খালি গায়ে। এই বাগানে সিনেমা দেখাতে এলে বড়বাবু এখানেই তার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। রাত্রের খাবার তার নিজেরই কিনে খাওয়ার কথা কিন্তু দোকান কোথায়? বিশত্রিশ মাইল ধরে শুধু জঙ্গল অথবা চা-বাগান। ফলে বাগানের হাসপাতাল থেকে তার জন্যে রুটি তরকারির ব্যবস্থা করা আছে। এক রাত্তির, কাল সকালেই চলে যেতে হবে অন্য বাগানে।

ডেভিড আর তিনটে ছোকরা বসেছিল প্রেমনাথের সামনে। ভুটানি মদ ওরা যোগাড় করতে পারেনি। যা উঠেছিল তার কিছুটা দিয়ে হাঁড়িয়া কিনে এনেছে রামচন্দ্রের ভাটিখানা থেকে বাকিটা প্রেমনাথের পকেটে গিয়েছে। প্রেমনাথ ওদের গল্প বলছিল, 'বম্বেতে গেলে তোদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। কাকে ছেড়ে কাকে দেখবি। এই হেমা তো ওই জিনাত। বাঁ দিকে হাঁটবি তো মীণাক্ষী ডানদিকে যাবি তো মাধুরী দীক্ষিত। পাগলা হয়ে যাবি রে তোরা, একদম পাগলা। আঃ।' বড় ঢোঁক নিল প্রেমনাথ।

ডেভিডের সঙ্গী একটি ছেলে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই রকম দেখতে?'

চোখ বন্ধ করে প্রেমনাথ বলল, 'কিরকম? মাখন মাখন? উজবুক। এই অজ চা বাগানে বসে মেয়েছেলের রূপ বর্ণনা করছিস? মেয়েছেলের কি বুঝিস তোরা?'

সবাই স্বীকার করল মেয়েছেলের কিছুই বোঝে না তারা। মাসে একবার প্রেমনাথ তাদের কাছে মেয়েছেলের চেহারাগুলো নিয়ে আসে। তখন যা দেখার দেখতে পায়। নইলে—।

প্রেমনাথ সঙ্গে সঙ্গ সতর্ক করে দেয়, 'তাই বলে নিজের মা, বোন, দিদি, বউকে অস্বীকার করবি না। তারাও মেয়েছেলে। তোদের মা, দিদি, বোন, বউ আমারও মা, দিদি, বোন, বউ। ঘরের মেয়েছেলে ঘরের আর বাইরের মেয়েছেল বাইরের। বুঝলি? ঠিক

আছে পরের মাসে তোদের জন্যে মিস প্যামেলা নিয়ে আসব।'

ডেভিড নড়ে উঠল, 'মিস পামেলা?'

'ব্রো হট সেক্স। দু বোতল ভুটানি চাই। সিক্ত স্মিতা। নাম শুনেছিস? শুনিসনি। কাফি কাফি লোকের ঘুম কেড়ে নিয়েছে শরীর দেখিয়ে। আনব! শুধু দু বোতল রেডি থাকে যেন!'

ওয়েলফেয়ার অফিস থেকে বেরিয়ে চার বন্ধু নির্জন চা-বাগানে খালি পথ দিয়ে হাঁটছিল। লোকটা মাল খেতে চায় বটে কিন্তু জিনিস অনেক জব্বর। প্রেমনাথের আগে যে লোকটা এসেছিল সে শুধু ঠাকুর দেবতার ছবি আনত। মেরে স্বপ্ন কি রানী কব আয়েগী তু—!

মাংরা বলে উঠল, 'কাঁহা, হেমামালিনী আউর কাঁহা সেবারানী!'

নোয়াম বলল, 'সচ বাত। এইসব সিনেমা দেখার পর বাগানের মেয়েদের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। শালা সবগুলোকে ভূত বলে মনে হয়!'

বুধুয়া হি হি করে হাসল, 'ভূত না রে, পেত্নী, পেত্নী বল!'

ডেভিড চুপচাপ হাঁটছিল। এবার কথা বলল, 'বুঝলাম, কিন্তু এইসব সিনেমা দেখার পর আমাদের সম্পর্কে মেয়েদের ধারণা কি তার খোঁজ নিয়েছিস?'

মাংরা বলল, 'তার মানে? ওরা আমাদের আবার কি ভাববে? এই তো আজ সকালে পাতি তুলতে গিয়ে সেবা আমাকে বার বার বলছিল অমিতাভর অ্যাকটিং করে দেখাতে। কেন বলছিল? আমাকে হিরো ভাবছিল বলেই তো!'

বুধুয়া জিজ্ঞাসা করল, 'তুই অ্যাক্টিং করে দেখালি?'

মাংরা মাথা নাড়ল, 'জী হ্যাঁ।'

বুধুয়া বলল, 'দেখা তো। আমাদের দেখা!'

মাংরা চারপাশে তাকাল। এখন নিস্তব্ধ চা-বাগানের ওপর আকাশ থেকে একটা হালকা আলো নেমে এসেছে, মায়াময় মশারির মত ঘিরে রেখেছে চারধার। চা-বাগানের গলিপথের অন্ধকার আলো গোলা হয়ে গেছে তার প্রভাবে। মাংরা বন্ধুদের কাছ থেকে খানিকটা সরে গিয়ে জায়গা করে নিল। তারপর আচমকা গলা ওপরে তুলে অভিনয় শুরু করল। দূরে দাঁড়ানো তিন বন্ধু ওই অভিনয়ে অমিতাভ বচ্চনকে কোথাও খুঁজে না পেলেও অন্য এক ধরনের ভাললাগা এবং মজা নিয়ে মাংরাকে দেখে যাচ্ছিল। হঠাৎ মাংরা কথা থামিয়ে আক্ষেপ করল, 'দূর! হয় নাকি! হেমা দূরের কথা মমতাজও নেই!'

ব্যবস্থাটা বেশ কয়েক বছর ধরে চালু। শ্রমিকদের মনোরঞ্জনের কি ব্যবস্থা চা-বাগানের কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। এরকম পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় মনোরঞ্জন বলতে ওই মাসে একবার পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দ্যাখানো, এছাড়া আর কী-করা সম্ভব। উদয়ন এ নিয়ে ভেবেছে। শহর থেকে থিয়েটার বা গানের দলকে এনে লাভ নেই। এরা সেসব পছন্দ করবে না। বাংলা বোঝে কিন্তু হিন্দী ছাড়া কিছুতেই আনন্দ পায় না। শিলিগুড়িতে নাকি কিছু ছেলেমেয়ে আশা কিশোরের গলা নকল করে ফ্যাংশনে গান গায় কিন্তু তাদের দক্ষিণা মেটানো এ বাবদ যে বাজেট আছে তার মধ্যে অসম্ভব। কিন্তু ছবিটা দ্যাখানোর পরই একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দু-এক দিনের জন্যে নজরে আসে। ছেলেগুলো খুব স্মার্ট

www.boiRboi.blogspot.com

হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েরা সেই ছবির নায়িকার শাড়ি পরার ধরন অথবা এমন কোন কিছু যা তাদের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব করে কাজে আসে।

চা-বাগানের ম্যানেজার এতকালের প্রচণ্ড শ্রমিক আন্দোলনের পরেও এদের কাছে বড় সাহেব। অবশ্য এই বাগানে তেমন কোন বড় ধরনের বিপ্লব হয়নি। এর আগের ম্যানেজার সুখেই ছিলেন বলা যায়। কোম্পানি মনে করেছিল তিনি উৎপাদন বাড়াবার জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। নির্দিষ্ট একটা জমির সীমায় চা-গাছগুলোয় যে পাতা বৃষ্টির কারণে জন্মায় তার সংখ্যা বেশী পরিশ্রম করলে হয়তো বাড়ানো যায়, কিন্তু সেটাও একটা বিশেষ সীমায় সীমিত।

উদয়ন তখন আসামের একট চা-বাগানে ছিল। এই কোম্পানির লোক পৌঁছে গেল তার কাছে। আরও বেশী মাইনে, আরও সুবিধার আশ্বাস পেয়ে সে রাজী হল এই বাগানে আসতে। তাকে বলা হয়েছিল শারীরিক কারণে এখানকার ম্যানেজার অবসর নিতে চলেছেন। কলকাতার হেড অফিসে গিয়ে সে এম ডি-র সঙ্গে দেখা করেছিল। কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টারসে এম ডি-র পরিবারের সদস্যরাই আছেন। ভদ্রলোক অমায়িক। ওঁর সঙ্গে এক বিমানে বাগডোগরায় আসতেই এই বাগানের গাড়ি তাদের তুলে নিল। বাগানে এসে ম্যানজোরের সঙ্গে আলাপ হল। এম ডি তাঁকে একবারও বলছেন না উদয়ন কেন এসেছে, কি তার পরিচয়। কাজকর্মের বর্তমান অবস্থা দেখে নিয়ে ওরা তিনজনে একসঙ্গে লাঞ্চ করল। সেদিন শ্রমিকদের রেশন দেওয়া হচ্ছে বলে তদারকির জন্যে ম্যানেজার সাময়িক বিদায় চাইলে এম ডি যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গীতে তাঁকে দাঁড়াতে বললেন। ব্রিফকেস থেকে একটা খাম বের করে বললেন, আপনার চিঠি।'

অবাক হয়ে ম্যানেজার ভদ্রলোক খামটি নিলেন। চিঠি বের করে যখন তিনি সেটা পড়ছিলেন তখন উদয়ন দেখেছিল ভদ্রলোক কাঁপছেন, মুখ রক্তশূন্য হয়ে এসেছে। পড়া শেষ করে কোনরকমে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার অপরাধ কি স্যার?'

এম ডি হাত নাড়লেন, 'আমি জানি না। বোর্ড অব ডিরেক্টার্স চাইছে না আপনি আর এ বাগানের চার্জে থাকুন। উদয়নকে আপনি চার্জ বুঝিয়ে দিন। আমি থাকতে থাকতে দেখে যেতে চাই হি ইজ সেটলড।'

বজ্রাহত হলেও মানুষ যদি হাঁটতে পারে তাহলে সেই ভঙ্গীতে ম্যানেজার হেঁটে গেলেন। উদয়ন হতভম্ব। তার সামনে লোকটাকে স্যাক করলেন এম ডি! সে বেশ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি হল স্যার?'

'কোনটা?'

'আমি জানতাম উনি শারীরিক কারণে অবসর নিচ্ছেন আর ওঁর জায়গায় আমি আসছি। আমাকে মিথ্যে জানানো হয়েছিল। অবশ্য কাকে রাখবেন বা না রাখবেন সেটা আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী হবে। কিন্তু এই কাজটা আমাকে বাগানে নিয়ে আসার আগে করতে পারতেন। এটা অত্যন্ত অমানবিক।' বেশ উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলেছিল উদয়ন।

'তাহলে আমাকে দুবার এই বাগানে আসতে হত। এক্সপেন্সিভ। তাছাড়া এটা আমার ইচ্ছেয় হয়নি, বোর্ড অফ ডিরেক্টার্স চেয়েছে তাই হয়েছে।'

উদয়ন বলতে গিয়েছিল বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স মানে তো আপনারই বউ, ছেলে-মেয়ে। বলেনি। সে ম্যানেজার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে নিজের মনের কথা বলেছিল। ভদ্রলোক চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, 'আজই আমি জলপাইগুড়িতে চলে যাব। দয়া করে যদি আমার জন্যে ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে উপকৃত হব।'

একজন শ্রমিককে এভাবে বরখাস্ত করলে ইউনিয়ন বিক্ষোভ জানাত। এখন কারণ খুব জোরালো না হলে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু একজন ম্যানেজারের চাকরির কোন নিরাপত্তা নেই। কোন ইউনিয়ন নেই তাদের। প্রতিটি মুহূর্ত ছুঁচের ডগায় দাঁড়িয়ে তাঁদের কাজ করে যেতে হয়।

দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার পর এম ডি ফিরে গেলেন কলকাতায়। যাওয়ার আগে তিনি বললেন, 'শোন উদয়ন, যে গলায় এবং ভঙ্গীতে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলেছ আমি তা পছন্দ করছি না। আমার কোন সমালোচনা আমি সহ্য করি না। যে মুহূর্তে তোমার চেয়ে বেটার লোক পাব সেই মুহূর্তেই তোমাকে আমার দরকার হবে না।'

চার বছর চলে গেছে তারপর। এম ডি প্রতি দু মাসে একবার আসেন। এখনও তাঁর মনে সেই স্মৃতি আছে। শুধু আরও কাজের লোক পাচ্ছেন না বলেই তিনি চুপ করে আছেন। উদয়নকে ক্ষমতা দিয়েছেন প্রচুর কিন্তু সেই সঙ্গে উৎপাদন বাড়ছে কিনা লক্ষ্য রেখে যাচ্ছেন।

চা-বাগানের আয়তন খুব কম নয়। এক ধারে ভুটানের পাহাড় অন্যদিকে গভীর অরণ্য। চা-বাগানের এবং অরণ্যের মাঝখান দিয়ে একমাত্র হাইওয়ে ছায়া মাখতে মাখতে চলে গেছে সিঁথির মত। আগে দুটো বাস আসা যাওয়া করত এখন তাদের সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে ভারি মাল নিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রাকের সংখ্যা। কিন্তু কেউ এক পলকের জন্যে দাঁড়ায় না। দাঁড়াবার কোন কারণ নেই। রবিবার হাট বসে বাগানের ফুটবল মাঠে। কুড়ি তিরিশ মাইল থেকে ব্যাপারীরা মাল নিয়ে আসে। দিনটা কাটে রমরমায়। সন্ধ্যে হবার আগেই যে যার জায়গায় ফিরে যায়। দুপুর পার হলে বাজারটা মেলার চেহারা নিয়ে নেয়। সাজুগুজু করে মদেশিয়া মেয়েরা আসে তেল সাবান কিনতে। কেউ কেউ হেমা মালিনীর কানে দ্যাখা দুল খোঁজে।

উদয়নের সহকারী ম্যানেজার আছে আরও দুজন। বিশেষ কারণেই দূরত্ব থেকেই যায় তাদের সঙ্গে। ওরা বাইক নিয়ে চলে যায় কাজের শেষে হাসিমারা বীরপাড়া আলিপুরদুয়ার। কার্শিয়াঙ-এর দৌলতে টিভির প্রোগ্রাম দেখে ঘরে বসে। টিভি-র দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না উদয়নের। ওটা তার স্ত্রী অরুণিমার অভ্যেস। সুন্দরী অরুণিমা সারা দিন একা কাটায়। তার ছেলে পড়ছে দার্জিলিং-এ। প্ল্যান্টার্স ওয়াইফ হতে হলে তোমাকে নির্জনতা ভালবাসতে হবে, একাকীত্বে আনন্দিত হতে হবে। অরুণিমা টিভি আসার পর হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। টিভি এবং ভিসিআর। উদয়নকে সপ্তাহে একদিন শহরে লোক পাঠাতে হয় সিনেমার ক্যাসেট নিয়ে আসার জন্যে। স্ত্রীর জন্যে এটুকু কর্তব্য তো করতেই হয়।

চা-বাগানটাকে উদয়ন ভালবেসে ফেলেছে। উৎপাদন বাড়াবার সবকটা কৌশল কার্যকরী করায় কোম্পানি তার ওপর খুশী। নির্দিষ্ট কাজের ওপর কিছু করলে সে বেশী

www.boiRboi.blogspot.com

পয়সা শ্রমিকদের পাইয়ে দিচ্ছে বলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। এখন সমস্যা একটাই। মাঝে মাঝে সরকারি গভীর অরণ্য থেকে হিংস্র জন্তু বেরিয়ে আসছে। কুলি লাইনের দু-একজন জখম হচ্ছে। বনবিভাগকে মৌখিক এবং লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। তাদের বক্তব্য, এত বড় জঙ্গলের কোন ফাঁক দিয়ে রাত্রে বাঘ বেরিয়ে আপনার বাগানে ঢুকে পড়ছে তা আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। আইন অনুযায়ী তাদের মারতে পারবে না উদয়ন। তাই বাগানের মাঝে মাঝে বাঘ ধরার কল পাতা হয়েছে। ঠিক ইঁদুর ধরার কলের মত। প্রথম প্রথম তিন তিনটে বাঘকে ধরে সে বনবিভাগের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই বাঘগুলোই আবার যখন ফিরে এসেছে তখন কল এড়িয়ে গিয়েছে। এই উৎপাত বেশীদিন সহ্য করবে না শ্রমিকরা, উদয়ন জানে। চিন্তা সেই কারণে। আর আছে হাতি। ভুটান-পাহাড় থেকে হঠাৎ হঠাৎ দল বেঁধে নেমে আসে তারা খাবারের সন্ধানে। ক্রাকার ফাটিয়েও তাড়ানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আজকাল। এছাড়া আপাতত চা-বাগান শান্ত। সারাদিন ঘুঘুরা আরামে ডেকে যায়।

উদয়নের দিন শুরু হয় ভোর হতেই। জিপ নিয়ে সে একা বেরিয়ে পড়ে। কাঁচা রাস্তা দিয়ে সোজা সে চা-বাগানের শেষ প্রান্তে চলে যায় যেখানে ভুটানের পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাহাড়ি নদী ছুটে যাচ্ছে। এই যাওয়ার পথটায় বাগানের চেহারাটা মোটামুটি বোঝা যায়। ফেরার সময় খানিকটা ঘুরে সে হাইওয়ের ওপর উঠে পড়ে। তারপর মসৃণ পথ ধরে বাগানের গা ঘেঁষে মাইল খানেক গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসে। শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষা একটা ভোরও এই টহলদারিতে কামাই করে না উদয়ন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর সঙ্গে ধীর ধীরে তার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। এখন ওদের অবস্থান দেখে সে বলে দিতে পারে গতরাত্রে সেই এলাকার ঝড়ো বাতাস বয়েছিল কিনা।

শীতকালে শুকনো নদীর বুকে জিপ নামানো যায়। এই ভোরে সেখানে পৌঁছে উদয়নের মনে হল সামনের পাহাড়টা আর নিরাপদ পাঁচিল হয়ে থাকছে না। এলাকাটা ভুটানের। সে দেশের সরকার বিরোধী কিছু মানুষ বিতাড়িত হয়ে ওই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। প্রায়ই খাবারের সন্ধানে তারা নেমে আসছে ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে। এদিকে সীমান্ত পাহারার ব্যবস্থা তেমন নেই। পাহাড়ে খাদ্যাভাব আছে। লোকগুলোর টাকা পয়সাও নেই। ফলে ডাকাতি বাড়ছে। এখন উদয়নের বাগানে তারা নামেনি কিন্তু গতকালই পাশের চা-বাগানের ম্যানেজার সেন বলছিলেন ওঁর ওখানে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে এবং করেছে ওই লোকগুলো। পুলিশ শুধু তদন্ত করেই যাচ্ছে।

ব্যাপারটা ভাবতেই হাসি পেল। লোকাল থানায় একজন সাব-ইন্সপেক্টর আছেন। খুব রোগা পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া মানুষটি অপেক্ষা করছেন কবে তিনি অবসর নিতে পারবেন তার জন্যে। ভদ্রলোক আমাশায় রুগী। কোন ব্যাপারেই তার উৎসাহ নেই। সেন বলেছিল লোকটা নাকি ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারির নাম জানে না। এই ইনিই তদন্ত করছেন।

বাগান পেরিয়ে হাইওয়েতে উঠতেই এক ঝাঁক টিয়া দেখতে পেল উদয়ন। আকাশ সবুজ করে উড়ে যাচ্ছে। মন ভাল হয়ে যায়। ভোরের জঙ্গল থেকে অদ্ভুত বুনো গন্ধ বের হয়। যতটা সম্ভব আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল সে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল হাইওয়ের ধারে

www.boiRboi.blogspot.com

পি ডব্লু ডি-র জমির ওপর অনেকগুলো বাঁশ সাজানো আছে। এগুলো গতকালও ছিল না। উদয়ন চারপাশে কোন মানুষ দেখতে পেল না। বাঁশগুলো সাইজ করে কাটা। চা-বাগানের বেড়া এবং হাইওয়ের মাঝখানের ঢালু জমি সরকারের সম্পত্তি। সেখানে যে কেউ কিছু ফেলে রাখতেই পারে। কিন্তু এমন পাণ্ডব বর্জিত এলাকায় সেটা করবে কেন? অস্বস্তি নিয়ে ফিরেছিল উদয়ন।

আজকাল সিনেমা দেখানোর পর খুব মন খারাপ হয়ে যায় সেবার। এই চা-বাগানের বেশীরভাগ মেয়ের শরীর অভাবজনিত কারণে তেমন উজ্জ্বল নয়। অভাব তাদের সংসারেও আছে কিন্তু মায়ের ধারা পেয়েছে বলেই নিজেকে সুন্দরী বলে মনে হয় তার। অন্তত মেয়ে বন্ধুরা ঈর্ষা করে তাকে সেকথাই বলে। সতের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল সেবার মধু বাগানের বংশী ওঁরাওর বেটার সঙ্গে। ছয় মাস যেতে না যেতেই লোকটাকে সাপে কামড়ালো। বিধবা হয়ে সে আবার ফিরে এসেছে বাপের সংসারে। এতে বাপ খুশীই হয়েছে। রোজগারের লোক সংসারে বাড়লে কে না খুশী হয়।

ওদের জাতের আর পাঁচটা মেয়ের মত মায়ের রঙ ঠিক কালো কুচকুচে নয়। ওর মা অবশ্য ওর চেয়ে ফর্সা। দিদিমা নাকি আরও ফর্সা ছিল। সবাই জানে দিদিমা তখনকার বাগানের এক সাহেব ম্যানেজারের মেয়ে। দিদিমার মা বাংলোতে কাজ করত। তখন কেউ এসব ব্যাপারে প্রতিবাদ করত না। দিদিমার বিয়ে হয়েছিল বাগানে কাজ করা এক মদেশিয়ার সঙ্গে। আস্তে আস্তে দিশি রক্ত মিশে রঙ কালো হতে আরম্ভ করলেও সেবাকে এখন ঠিক কালো বলা যায় না।

সুন্দরী বলে মনে মনে বেশ অহংকার ছিল সেবার। বাগানের উঠতি যুবকেরা তার দিকে যে চোখে তাকায় তাতেই তার অহংকার জোরালো হয়। ডেভিডের সম্পর্কে তার বেশ আগ্রহ আছে। পেটাই করা লম্বা চেহারা। মুখ-চোখ ভাল। ডেভিড যে তাকে অপছন্দ করে এমন কোন প্রমাণ সেবা এখন পর্যন্ত পায়নি। কিন্তু মুশকিল করছে সিনেমাগুলো। যে রাত্রে সিনেমা দেখানো হয় তার পরদিন থেকেই ছেলেগুলো একদম পাল্টে যায়। অন্তত সপ্তাহখানেক সামনে দিয়ে চলে গেলেও ডেভিড তার দিকে ঘুরে তাকায় না। শুধু ডেভিড নয় ওই হাড়গিলে দেখতে মাংসটাও যেন তাকে পাত্তা দিতে চায় না। সিনেমার নায়িকারা ওদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। সে নিজে ওইসব নায়িকাদের দেখেছে। গায়ের রঙ ফর্সা, চোখ ছলবল করে। তার ওপর পোশাক। নিজের শরীর দেখানোর সব রকম কৌশল ওই নায়িকারা জানে। দরকার নেই তবু বৃষ্টিতে ভেজা চাই আর সেই সময় সাদা কাপড় পরা থাকবে। ছ্যা! একজন মানুষকে দেখাও সেটা আলাদা ব্যাপার। যে বাগানে সিনেমাটা যাচ্ছে সেখানকার সব ছেলেবুড়ো যে দেখছে। লজ্জা বলে কিছু নেই ওদের। আর এই টোপ গিলে ফেলে ছেলেগুলো। সব সময় ভাবে মেয়েছেলে মানে ওই রকম হবে। নির্লজ্জ। ফলে নিজের বাগানের নিজের জাতের মেয়েদের আর মনেই ধরে না। হ্যাঁ, ব্যাপারটার রেশ থাকে সপ্তাহ ধরে। তারপর এদিক ওদিক তাকানো শুরু হয়। অন্য মেয়েদের কথা সে জানে না, সেবার তখন খুব রাগ হয়ে যায়। সে ভাবনা নাকি! ছেলেবেলায় নাকি ঠাকুর দেবতার সিনেমা দ্যাখাতো। তাদের দেখে তখনকার ছেলেদের কোন ভাবান্তর হত না। সেটাই ভাল ছিল।

টুকরি নিয়ে দলের সঙ্গে পাতি তুলতে যাচ্ছিল সেবা। যদিও এই মরশুম নয় কিন্তু কয়েকদিন আগে আচমকা বৃষ্টি হয়ে যাওয়াতে কিছু নতুন পাতা বেরিয়েছে। এর পরে দীর্ঘদিন পাতি তোলা বন্ধ থাকবে। তখন অন্য কাজ। ডেভিড কাজ করে ফ্যাক্টরিতে। তার সঙ্গে দেখোশোনা হয় হঠাৎ হঠাৎ। সেবা দেখল মাংরা আসছে পেছন পেছন। তার মুখে গতরাত্রে দেখা সিনেমার সংলাপ। হাসি পাচ্ছিল সেবার। ওইরক হ্যাংলা চেহারা নিয়ে স্বপ্নের রানীর সঙ্গে কথা বলছে। একটি মেয়ে ফোড়ন কাটল, 'মাংরা হিরো হো গিয়া।'

সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ থামিয়ে মাংরা বলল, 'আমরা হিরোইন পাচ্ছি না, এই দুঃখ।'

সেবার খুব রাগ হয়ে গেল। সে বলল, 'কাকও আবার গান গায়।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল পাশে মাংরা, 'কি বললে? নিজেকে খুব সুন্দরী ভাব না? যে দেশে নদীতে মাছ নেই সেখানে ব্যাঙাচিকেও বড় মাছ বলে মনে হয়।'

একটি মেয়ে হেসে উঠল, 'আরে সেবা তো সুন্দরীই!'

'তাই নাকি? কাল হেমার ঝিকে দেখেছিস? সেবার চেয়ে অনেক ভাল।'

সেবা জিজ্ঞাসা করল। 'তুই কিরে? নিজের কথা বল।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি না হয় একটু দুর্বল। কিন্তু ডেভিড। একদম অমিতাভ বচ্চন। ও বলে এ বাগানের তাকানোর মত মেয়ে নেই।' মাংরা হাসল।

সেবা আরও রাগল, 'তোরা তো মেয়েছেলের শরীর ছাড়া কিছু বুঝিস না!'

মাংরা মাথা নাড়ল, 'ঠিক। শরীর না থাকলে মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে সমান।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেবার। পাতি তোলায় মন ছিল না। উনিশ কেজির বেশি নিয়ে গেলে উপরি পাওয়া যায়। সেটাও ইচ্ছে করছিল না। ডেভিড ওই কথাগুলো বলেছে? অথচ কাল রাত্রে সিনেমা দ্যাখার পর নিজেকে হেমা আর ডেভিডকে অমিতাভ ভাবছিল একা বিছানায় শুয়ে। কি লজ্জা! হয়তো এই সায়ার ওপর কালো আংরা পরা, ব্লাউজের ওপর ওড়না, খালি পা দেখে ডেভিডের মন ওঠে না। সে যদি হেমার মত ছোট ব্লাউজ আর ফিনফিনে শাড়ি পরত অথবা সেই দৃশ্যের মত গেঞ্জি আর হাঁটুর অর্ধেক ওপরে নামা প্যান্ট তাহলে কি ডেভিড একই কথা বলত? অসম্ভব। কিন্তু এই বাগানের হাটে তো দূরের কথা হাসিমারা বাজারে মেয়েদের ওই পোশাক বিক্রি হয় না। আর যদি বা হত তাহলে সে কি সবার সামনে পরে বেড়াতে পারত!

হঠাৎ তার বড় মেমসাহেবের কথা মনে পড়ল। একদম হিরোইনদের মত দেখতে। শাড়ি পরে কিন্তু শরীরের একটুও দেখা যায় না। তার সঙ্গে কথা বলেছিল একদিন। বাগানের মধ্যে বেড়াতে এসেছিল। মেমসাহেবকে দেখে হেসেছিল সেবা। মেমসাহেব বলেছিল, 'বাঃ, তুমি তো বেশ দেখতে!' ওই মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়! বিকেলবেলায় মেমসাহেব বাংলোর লনে বসে বই পড়ে। তখন যাবে। জিজ্ঞাসা করবে সিনেমার হিরোইনের পোশাক কোথায় পাওয়া যায়!

পাতি তুলতে তুলতে ওরা হাইওয়ের দিকে চলে এসেছিল। এবং তখনই শব্দ পেল। শব্দের উৎস খুঁজতে খানিকটা এগোতে দেখতে পেল বেশ কিছু লোক পি ডব্লু ডি-র জমিতে বাঁশ পুঁতছে। এর মধ্যে ঘরের আদল হয়ে গেছে। এখানে ঘর হচ্ছে কেন? ফেন্সিং-এর এপাশে দাঁড়িয়ে ওরা দেখছিল। হঠাৎ মাংরার গলা শুনতে পেল সেবা।

চেঁচিয়ে সে জিজ্ঞাসা করছে, 'কি করছ তোমরা?'

একটা লোক বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ। এখানে ধাবা হবে।'

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ধাবা? যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে ধাবা হবে?

ছুটির পর দুটো সাইকেলে ওরা চারজন পৌঁছে গেল হাইওয়েতে। এখন ছায়া নেমেছে। ওপাশের জঙ্গল থেকে ঝিঁঝি পোকারা চিৎকার করে যাচ্ছে সমানে। লোকগুলোর কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। একটা টেম্পো এসেছে হাসিমারা থেকে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ওরা দেখল বিরাট আটচালা হয়েছে। উনুন বানানো হয়ে গেছে সেই সঙ্গে। খদ্দেরদের বসার জন্যে বেঞ্চি পাতা হয়েছে মাটিতে গর্ত করে। ধাবা চালু হলে নিশ্চয়ই খাটিয়া আসবে। যে লোকটা এসব তদারকি করছিল সে এগিয়ে এল, 'তোমরা কোথায় থাকো?'

ডেভিড জবাব দিল, 'বাগানে।'

'ও। মাইনে পেলে ধাবায় এসো মাংস খেতো। এমন রান্না কখনও খাওনি।' লোকটা মৌজ করে সিগারেট ধরালো।

মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'ধাবা মানে তো খাবারের দোকান?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'কিন্তু খাবে কে? চার ধারে যে জঙ্গল।'

'ঠিক লোক এসে যাবে। এই যে এখান দিয়ে এত ট্রাক যায় তার ড্রাইভার খালাসিদের তো একটা খাওয়ার জায়গা চাই। এই রাস্তায় কোন ধাবা নেই। ঠিক কিনা?' লোকটাকে খুব বিচক্ষণ দেখাচ্ছিল।

'কি কি বিক্রী হবে?'

'কষা কারি মাংস, চিকেন মটন দুটোই, চাপাটি, মাটন তড়কা, পালং পনির, আলু-মটর। কাল থেকে শুরু হয়ে যাবে।'

'দাম কি রকম হবে?'

'সস্তা। মাংস চার পিস দশ টাকা। তড়কা পাঁচ টাকা প্লেট।'

মাংরা বলল, 'বাপস।'

লোকটা বলল, 'এতো খুব কম দাম। ধাবা চালু করার জন্যে মালিক দাম কমিয়ে দিয়েছে।'

'রাত্রে এখানে লোক থাকবে?'

'আরে দিনরাত খোলা থাকবে।'

টেম্পোয় চেপে লোকগুলো চলে গেল। আটচালাটা খালি রইল। ওরা জানে এমন নির্জন জায়গায় বাঁশগুলো খুলতে আসার গরজ কারো হবে না। আর আগামীকাল থেকে তো দিনরাত লোক থাকবে। মাংরার মনে হল লোকটাকে মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল জঙ্গলের কথা। হাতি আর বাঘ যেকোন সময় ধাবায় চলে আসতে পারে।

বুধুয়া বলল, 'খুব ভাল হবে। এখন থেকে আমরা শহরের রান্না খেতে পাব।'

নোয়াম খেঁকিয়ে উঠল, 'তুই একটা গরু। কত দাম শুনেছিস।'

'শুনেছি। একদিন তো খেতে পারব প্রত্যেক সপ্তাহে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'চার পিস মাংসে তোর হবে?'

'নাঃ। আট পিস চাই।'

'তার মানে বিশ টাকা। আই বাপ!'

ওরা চারজনেই একটু বিষণ্ণ হল কিন্তু এমন সুযোগ তো জীবনে কখনও আসেনি। এই জঙ্গল বা বাগান দেখতে দেখতে কষা মাংস খাওয়া! এর জন্যে দূরে কোথাও যেতে হচ্ছে না। যত দামই হোক মাসে একবার নিশ্চয়ই খাওয়া যায়।

ডেভিড ধাবাটা ঘুরে দেখছিল এমন সময় জিপটা সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা দেখল বড়সাহেব জিপ থেকে নামছে। তাকে নামতে দেখেই বুধুয়া সেলাম করল। উদয়ন মাথা নেড়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা এখানে কারা বানালো?'

মাংরা হাত দেখাল ডান দিকে, 'ওরা। হাসিমারা থেকে এসেছিল। বলল ধাবা হবে। মাংস তড়কা বিক্রি হবে ড্রাইভারদের জন্যে।'

উদয়ন ছেলেগুলোকে দেখল। এদের মুখচেনা তার। শুধু ডেভিডকে একটু বেশী চেনে কারণ ফ্যাক্টরিতে কাজ করে সে। উদয়ন জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা এখানে কি করছিস?'

নোয়াম বলল, 'এ্যাইসাই!'

উদয়ন কথা বাড়াল না। তার শরীর জ্বলছিল। সে সোজা জিপে ফিরে গেল। থানা এখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে। আঠারো মিনিটে পৌঁছে গেল উদয়ন। বড়বাবু নেই। সেই প্রৌঢ় সাব ইন্সপেক্টর বসে আছেন। উদয়নকে দেখেই তিনি অনুমান করে নিয়েছেন কোন সমস্যা হয়েছে। তাঁর মুখে বিরক্তি ফুটল। তিনি বললেন, 'আসুন স্যার। ও সি জলপাইগুড়ি গিয়েছেন।'

'আপনি তো আছেন।' চেয়ার টেনে বসল উদয়ন। ইচ্ছে থাক না থাক থানার সঙ্গে তাকে ভাল সম্পর্ক রাখতেই হয়। বাগানে টুকটাক কিছু হলে সে নিজে সামলায় কিন্তু বড় ব্যাপারে থানায় আসতে হয়। প্রতি সপ্তাহে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনার সময় এঁদের সাহায্য নিতে হয়। অবশ্য সহযোগিতা দু পক্ষেরই দরকার এবং কোম্পানির অলিখিত আইন অনুযায়ী উদয়ন তা মান্য করে আসছে।

'খুনটুন হল নাকি?' এস আই নির্লিপ্ত হয়ে জানতে চাইলেন।

'না। শুনুন। আমি শান্তিতে থাকতে চাই। আমার বাগানের গায়ে হাইওয়ের পাশে ধাবা বানানোর অনুমতি আপনারা দিয়েছেন?'

'ধাবা? আমরা? জানি না তো?'

'হ্যাঁ। ওরা স্ট্রাকচার করে ফেলেছে। কাল থেকে চালু হবে। ধাবা মানেই এ্যান্টি সোস্যালদের ভিড়, মদ বিক্রী, বাইরের লোকের আনাগোনা। আমি চাই না আমার বাগানের পাশে সেটা হোক।'

'তাতো ঠিকই! এসব যে কেন করে! কোথায় হয়েছে?'

উদয়ন জায়গাটা বোঝাল।

'জমিটা তো পি ডব্লু ডি-র। ওরা পারমিশান দেয়নি তো?'

'জানি না। আপনাদের অনুমতি নিতে হয় না?'

'সরাসরি না। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি দেখছি। ও সি ফিরুন।'

উদয়ন বলল, 'এসব ব্যাপার একবার চালু হলে বন্ধ করা মুশকিল হয়। আপনি আজই স্টেপ নিন।'

'কে বানাচ্ছে বলুন তো?' এস আই বিব্রত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি জানি না। স্পটে কেন মানুষ দেখলাম না।'

'ও, কেউ নেই? তাহলে কার বিরুদ্ধে স্টেপ নেব? ঠিক আছে, ও সি-কে বলব।'

বিরক্ত উদয়ন বেরিয়ে এল।

চায়ের টেবিলে অরুণিমা স্বামীর মুখে ঘটনাটা শুনল। তৎক্ষণাৎ তার প্রতিক্রিয়া হল, "বাঃ। দারুণ খবর। এবার একটু মুখ বদলানো যাবে।'

উদয়ন অবাক হল, 'তুমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না?'

'না।' অরুণিমা মাথা নাড়ল।

'এইরকম একটা জায়গায় ধাবা হওয়া মানে অ্যান্টি সোসাল এলিমেন্টে ভরে যাওয়া। লোকালয় বলতে এই চা-বাগান। এখানকার ছেলেমেয়েরাই শিকার হবে।'

'কিসের শিকার?'

'ধাবা মানেই উটকো লোক। নেশার জিনিস বিক্রি হবার জায়গা। যে শান্তি এবং সারল্য এখানে আছে তা আর থাকতে পারে না।'

অরুণিমা গম্ভীর হল। বিয়ের পর থেকেই দেখেছে স্বামীর এই চেহারা। যে ব্যাপারে কাজ করবে সেই ব্যাপারটা কিছুতেই হালকা ভাবে নিতে পারে না। ওর সিরিয়াস স্বভাবের জন্যে তিলকে বেশীরভাগ সময় তাল করে তোলে। অরুণিমা বলল, 'যতক্ষণ ওই ধাবার কাজকর্ম তোমার বাগানে সমস্যা তৈরি না করছে ততক্ষণ চুপ করে থাকাই ভাল। তাছাড়া ওরা কি বাগানের জায়গায় ধাবা বানাচ্ছে?'

'না। তাহলে আমিই ভেঙ্গে দিতাম। পি ডব্লু ডি-র জায়গা ওটা।'

'কেউ যদি তোমার বাড়ির সামনে জায়গা কিনে কিছু করে আইনত তোমার হাত-পা বাঁধা। তোমার অপেক্ষা করা উচিত।' অরুণিমা বলল।

পরের ভোরে টহল দেবার সময় উদয়ন লক্ষ্য করল ধাবাতে তখনও লোকজন আসেনি। জঙ্গল এবং চা-বাগানের গায়ে বাঁশের কাঠামোকে ক্ষতের মত মনে হচ্ছিল।

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে অফিসে ঢোকার মুখে উদয়ন দেখল দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘরে ঢুকতেই পিওন জানাল যারা দেখা করতে চায় তারা হাইওয়ের ধাবার লোক। উদয়ন তাদের নিয়ে আসতে বলল। লোক দুটো ঢুকে নমস্কার করল। উদয়ন ইচ্ছে করেই বসতে বলল না। বয়স্ক লোকটি বলল, 'আমরা খুব গরীব ব্যবসায়ী। আপনার বাগানের পাশ দিয়ে রোজ অনেক গাড়ি যায়। তারা খাবার পায় না বলে ছোট্ট একটা দোকান করেছি সরকারের জায়গায়। দোকানটা আজ চালু হয়েছে। যখন যা ইচ্ছে আপনি হুকুম করবেন স্যার। আপনার আশ্রয়েই তো থাকব।'

দাঁতে দাঁত চাপল উদয়ন, 'আপনারা এরজন্যে অনুমতি নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ স্যার। থানার বড়বাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

'ব্যবস্থা মানে? আইনসঙ্গত অনুমতি নেননি?'

www.boiRboi.blogspot.com

'সেটা আমি জানি না স্যার। মালিক জানে।'

'মালিক মানে?'

'উনি শিলিগুড়িতে থাকেন। ডুয়ার্সে ওঁর বাইশটা ধাবা হল।'

'আপনারা কি কি বিক্রি করবেন?'

'খাবার-দাবার। বুঝতেই পারছেন এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। দূর দূর থেকে আনতে হবে।'

'নেশার জিনিসপত্র?'

'ছি ছি ছি। তবে ড্রাইভারদের বিশ্বাস নেই। ওদের সঙ্গেই ওসব থাকে।'

'ঠিক আছে। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন আমার বাগানে যেন আপনাদের জন্যে কোন ঝামেলা না হয়।'

দুপুরে বাড়ি ফিরে লাঞ্চে বসলে অরুণিমা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি চিকেন কষা খাবে?'

'সাবাস। সকালেই কিচেনে ঢুকেছ?

'আমি করিনি। ধাবা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'ধাবা থেকে? আশ্চর্য! নিলে কেন?'

'কেউ ভেট দিলে নিতে হবে না বলনি তো! নিউ ইয়ার্স ক্রিসমাসের সময় কন্ট্রাক্টররা যখন ভেট দেয় তখন তো আপত্তি করো না।'.

'দুটো এক ব্যাপার হল?'

'ভেবে দ্যাখ, একই!'

বিরক্ত উদয়ন বলল, 'বাবুর্চি যা বানিয়েছে তাই দাও।'

দুটো ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। ধাবার সামনে খাটিয়ায় বসে এই পড়ন্ত বেলায় কয়েকটা লোক চোঁ চোঁ করে বিয়ার খেয়ে মাংসের থালায় হাত বাড়াল। ধাবার ভেতর ব্যস্ততা। একজন কর্মচারী হ্যাজাক রেডি করে রাখছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ডেভিডরা এদের দেখছিল।

ধাবার ওপরে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়ে গেছে। নাম দিয়েছে ওয়েসিস। ধাবার ম্যানেজার ভেতর থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলে ঠ্যা ঠ্যা করে হাসতেই উল্টো দিকের জঙ্গল থেকে কয়েকটা পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। ম্যানেজারে চোখ পড়ল ডেভিডের দিকে। হাত নেড়ে কাছে ডাকল লোকটা।

ওরা এগিয়ে এল।

ম্যানেজার বলল, 'চিকেন কষা, মাটন কষা আউর চাপাটি। হোগা?'

বুধুয়া মাথা নেড়ে না বলল চটপট।

'আরে ভাই খা লেও। পহেলা দিন ফিফটি পার্সেন্ট রিডাকসন। আধা দামকে পুরা খানা। কালসে নেহি মিলেগা।'

ডেভিস বলল, 'ঠিক হ্যায়। দিজিয়ে।'

ম্যানেজার ইশারা করতেই একটা ছোকরা গামছা কাঁধে এগিয়ে এল, 'মাটন কষা, চিকেন কষা, পালং পনির, তন্দুরি রোটি, চাপাটি, বলিয়ে ঝটপট।'

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। প্রতিটি খাবার ওদের কাছে লোভনীয় বলে মনে হচ্ছিল। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা বলবে?

ম্যানেজার ধমকালো, 'এ্যাই মেহমুদ, কষা মাংস আর চাপাটি দেও ইনলোগকো।' ছেলেটা মজাদার ভঙ্গী করে ফিরে গেল। এই রকম মজাদার ভঙ্গী করতে একজনকে সে সিনেমায় দেখেছে। তার নামও মেহমুদ। একটা খালি খাটিয়া দেখে সে বন্ধুদের নিয়ে বসল। ওরা প্রত্যেকেই বেশ উত্তেজিত। বুধুয়া চারপাশে তাকাচ্ছিল। গত মাসে যে সিনেমাটা দেখিয়েছিল তার নায়ক ছিল ড্রাইভার। এইরকম ধাবায় খাটিয়াতে বসে খবার খেত। হঠাৎই নিজেকে সে সেই নায়কের ভূমিকায় দেখতে পেল যেন। এখানেই নায়কের সঙ্গে ভিলেনের মারপিট হয়েছিল। নায়ক খাটিয়া তুলে বেদম মেরেছিল লোকটাকে। লোকটার মাথা খাটিয়ার দড়ির জাল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত খাটিয়া গলায় নিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল সে। দৃশ্যটা দেখার সময় হেসে গড়িয়ে পড়েছিল সবাই। আজ আবার হাসি পেল।

মাংসার খুব আফশোশ হচ্ছিল। এখন বাগানের ডিউটি শেষ। গতকাল যদি এই ধাবা খুলত আর তারা যদি গতকাল এমনভাবে খাটিয়ায় বসত তাহলে মেয়েগুলো পাতি তুলতে তুলতে এদিকে এলে তাদের নির্ঘাৎ দেখতে পেত। আঃ, কি ভালই না লাগত সেরকম হলে। ওরা যে আর পাঁচটা বাগানের লোকের মত ফেকলু না সেটা প্রমাণ করা যেত। সেবার নিশ্চয়ই খুব বুক টাটাতো। বুকের কথা মনে আসতেই তার হেমা মালিনীর মুখ মনে পড়ে গেল। আহা, হঠাৎ যদি এখন এই ধাবার পাশ দিয়ে হাইওয়ে ধরে ছুটে যাওয়া যে কোন একটা গাড়ি থেকে হেমা মালিনী নেমে আসত!

নোয়ামের অস্বস্তি অন্যকারণে। বাগান ছেড়ে এতদূরে কেউ আসবে না। একটু বাদে সন্ধ্যে নামলে জন্তু জানোয়ারের ভয়ে কেউ এ তল্লাটে পা বাড়াবে না। তবু কথায় বলে গাছেরও চোখ আছে। খবরটা যদি মায়ের কানে যায় তো দেখতে হবে না। এ মাসের হপ্তার টাকা বাপ ভাটিখানায় শেষ করেছে। দিদির বিয়েতে যে টাকা ধার করা হয়েছিল তা শোধ হয়নি বলে পাওনাদার রোজ অপমান করছে। আর সে বাবুদের দোকানে বসে রুটি মাংস খাচ্ছে পয়সা খরচ করে। মাকে যে বলবে সে হয়তো আরও বাড়িয়ে বলবে। ছায়া ঘন হয়ে আসা রাজপথটির দিকে তাকিয়ে যখন কোন মানুষকে দেখা গেল না তখন সে নিঃশ্বাস ফেলল।

ছেলেটা প্লেট দিয়ে গেল। চারপিস করে ঘন মাংস আর দুটো রুটি। এককোণে পেঁয়াজ আর চাটনি, একটা কাঁচা লঙ্কা। ডেভিড শুরু করতেই ওরা হাত চালাল। আঃ। অমৃত বলে মনে হল ওদের। কি স্বাদ। জীবনে এমন রান্না খায়নি ওরা। চার টুকরো মাংস একটা রুটির সঙ্গে পেটে চলে গেলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা বলল, 'আউর এক প্লেট চাহিয়ে?'

ডেভিড মাথা নাড়ল, না।

ছেলেটা শব্দ করে হাসল। হাসিটা যে ওদের পকেটের অবস্থা বুঝে তা গোপন থাকল না। চট করে ছেলেটা একটা পাত্র নিয়ে এল ভেতর থেকে। হাতায় তুলে মাংসের কাই ঢেলে দিতে লাগল প্লেটে। মুখে চিৎকার করল, 'ইয়ে ফাউ হ্যায়। পয়সা নেহি লাগেগা।'

ওরা খুশী হল। মাংসতো মাঝে মধ্যে খায়। কিন্তু এই ঝোলটাই তো স্বপ্নের! অথচ

www.boiRboi.blogspot.com

এর জন্যে দাম দিতে হচ্ছে না। একই মাংস শুধু রান্নার গুণে অন্য স্বাদ এনে দেয়। এটা সত্যি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!

ম্যানেজার সামনে এসে দাঁড়াল, 'টেস্ট লাগতা, হ্যাঁ?'

ডেভিড বলল, 'জী।'

মাংস আউর লেড়কি, হর জায়গামে হররকম হোতা হ্যায়। বাকি হামারা ধাবামে ফার্স্ট ক্লাশ।' হো হো করে হাসল লোকটা।

চব্বিশ টাকা পকেট থেকে বেরিয়ে গেল। সাইকেলে চেপে ফিরে আসার সময় বুধুয়া বলল, 'এই খাবার আমাদের জন্যে না।'

ডেভিড ধমকালো প্যাডেল করতে করতে, 'ভোটা! খানা হ্যায় তো এ্যাইসাই।

মাংরা সায় দিল, 'লেড়কি হ্যায় তো হেমা।'

নোয়াম মনে মনে ঠিক করল আবার সামনের মাসে এখানে খেতে আসবে। মাসে পনের টাকা যে করে হোক বাঁচাতে হবে।

বাগানের ঠিক গায়ে ধাবা হয়েছে। সেখানে দারুণ দারুণ খাবার পাওয়া যায়, সমস্ত শ্রমিক নারীপুরুষ দুদিনেই জেনে গেছে। সেই সঙ্গে এও জেনেছে ওই খাবার তাদের সাধ্যের বাইরে। একদিন খেলে দুদিন উপোস করে থাকতে হবে। কষ্ট মেশানো একরকমের ঈর্ষা বুকে জমলেও যে যার মত জীবন যাপন করতে লাগল।

উদয়ন ভোরের টহলদারিতে ওই পথে ওই সময়েও দুতিনখানা ট্রাক দেখতে পায়। সে ভেবেছিল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাতির দল এক রাত্রে ওই ধাবা গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হচ্ছে না। থানার ওসি অফিসে এসে বলে গেছেন, 'আপনি অযথা টেনসড হচ্ছেন স্যার। ওরা হাইওয়ের ধারে দোকান করেছে, আপনার বাগানে ঢোকেনি। যতক্ষণ নিরীহ ব্যবসা করবে ততক্ষণ আমার কিছু করার নেই।'

দুতিনদিনে উত্তেজনা একটু কমেছিল। এখন পর্যন্ত ধাবাকে কেন্দ্র করে কোন ঝামেলা হয়নি। তাই উদয়ন বলেছিল, 'ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি তাই আপনার থানায় গিয়েছিলাম। আচ্ছা, ওরা প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েছে?'

'কোন ফাঁক নেই। মালিক শিলিগুড়ির। আইনকানুন সব জানেন।' হেসে বলেছিলেন ওসি।

অতএব মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। দিনগুলো যাচ্ছে বেশ শান্তিতেই। ধাবা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে সে নিয়মিত। ট্রাকের সংখ্যা বাড়ছে। ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের জন্যে গাড়ির গতি কমাতে হয়। শুধু এই কারণ দেখিয়ে পুলিশের কাছে নালিশ করা যায় না। আর সবচেয়ে যেটা খারাপ ব্যাপার, তার বাংলোতে ধাবার খাবার আসছে। খেতে বসে গন্ধে সেটা প্রথম টের পায়। অরুণিমা বললেও সেই খাবার মুখে তোলেনি উদয়ন। স্ত্রীর স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেনি সে। ওর যদি ভাল লাগে খেতে পারে। সে শুধু লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে। যদি কখনও কোন গোলমাল পায় ছেড়ে দেবে না। এর মধ্যে কলকাতার অফিসে সে নিয়মমাফিক রিপোর্ট দেবার সময় ধাবার কথা উল্লেখ করে রেখেছে।

মাস ঘুরতেই প্রেমনাথ এসে গেল এক বিকেলে তার যন্ত্রপাতি নিয়ে। বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে বলল, 'বহুৎ মজাদার পিকচার লেকে আয়া দিস টাইম।'

বড়বাবু এ বাগানে পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করছেন। নিরীহ মানুষ। নাক কুঁচকে বললেন, 'তোরা যা হয়েছিস। আগে তবু ভগবানের ছবি আনতিস, বউ মেয়ে নিয়ে দেখা যেত। এখন ওসব ধাড়ি ধাড়ি নাচনকোদন দেখা যায় না।'

প্রেমনাথ বলল, 'জমানা বদলা গিয়া। এক কাম করেন না, আজ পিকচার আরম্ভ হলে চুপচাপ অন্ধকারে একা এসে দেখে যান না?'

'কেন? কি ছবি আজকে?'

'মিস পামেলা। বহুৎ ডিম্যাণ্ড।'

'ইংরেজী ছবি নাকি?'

'নো নো। হিন্দী। সিল্ক স্মিতা। নাম শুনেছেন?'

বড়বাবু বোকার মত মাথা নেড়ে না বলেন। পাশে বসা ছোটবাবু একটু গলা নামিয়ে বললেন, 'সেক্স বম্ব। সাউথের।'

প্রেমনাথ ওয়েলফেয়ার অফিসের দিকে চলে গেলে বড়বাবুর খুব অস্বস্তি হল। তিনি একটা কাগজের কোণে দুবার দুটো দুর্গা লিখলেন। তারপর চেয়ার ঠেলে উঠে বড়সাহেবের ঘরের দিকে এগোলেন।

উদয়ন টেলিফোনে কথা বলছিল। পর্দা সরিয়ে বড়বাবু ঢুকতেই রিসিভার কানে মাথা নাড়ল। দুবার না বললে ভদ্রলোক বসেন না। আজকাল মেজাজ খুব ভাল না থাকলে সে দুবার বলে না।

টেলিফোন শেষ করে উদয়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'স্যার। মনে হয় একটা প্রব্লেম্ হবে।'

'প্রব্লেম? কি ব্যাপারে?'

'ওই সিনেমা নিয়ে।'

'বুঝলাম না।'

'আজ প্রেমনাথ এসেছে সিনেমা দেখাতে।'

'এতে প্রব্লেম কি আছে?'

'না। মানে, সিনেমাটা পাবলিকলি দেখানো উচিত কি না।'

'কেন? আনসেনসরড ফিল্ম নাকি?'

'না না। সেসব ঠিক আছে।'

'মা মেয়ে ভাই বোন দেখবে তো!'

'খুলে বলুন তো মশাই।'

'আজ্ঞে, প্রেমনাথ বলছিল ছবিটার নাম মিস পামেলা। ছোটবাবু বলেছিলেন সাউথের কে এক বোম্ব আছে ছবিতে।'

'বোম্ব? মানে?'

'বড়বাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন, 'ওই শরীরসর্বস্ব মেয়েছেলে।'

'হুঁ। কিন্তু সরকার তো ছবিটিকে হলে দেখানোর অনুমতি দিয়েছে!'

www.boiRboi.blogspot.com

উদয়চন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

'তা দিলেও।'

উদয়ন হেসে ফেলল, 'ঠিক আছে। আপনি আজ প্রেমনাথের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে থাকবেন। তেমন কিছু অরুচিকর দৃশ্য দেখল বন্ধ করে দেবেন।'

বড়বাবুকে আরও অসহায় দেখাল, 'স্যার, বড় বিপদে পড়ে যাব।'

'কেন?'

'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।'

'কিসের প্রতিজ্ঞা?'

'ওয়াইফের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাকে বাদ দিয়ে সিনেমা দেখব না।'

অনেক কষ্টে হাসি চাপতে পারল উদয়ন। তারপর মনে পড়ে যেতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ওয়াইফকে ধাবার খাবার খাইয়েছেন?'

'হ্যাঁ স্যার। তড়কা আনিয়েছিলাম।'

গম্ভীর হয়ে গেল উদয়ন। মুখে বলল, 'ঠিক আছে যান, আমি দেখছি।'

হাওয়ার মুখে খবর ছড়িয়ে গেল। প্রেমনাথ এসেছে ছবি নিয়ে। আজ সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা থেকে মাঠে সিনেমা দেখানো হবে। সাজ সাজ রব পড়ে গেল... কুলি লাইনে, ছোলা বাদামওয়ালাও সেই খবরে বিকেল হতেই উপস্থিত। চার বন্ধু এসে জমিয়ে নিয়েছে প্রেমনাথের সঙ্গে।

ক্যাম্প খাটে শুয়ে প্রেমনাথ চোখ বন্ধ করল, 'উঃ, কি হিরোইন।'

মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'হেমামালিনীর চেয়ে ভাল?'

প্রেমনাথ গম্ভীর হল, 'এ্যাই, কৌন দেখনে বড়িয়া, দুর্গা ঠাকুর না কালী ঠাকুর?'

ওরা চারজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

প্রেমনাথ হাসল, 'এর জবাব হল যে যার পূজা করে তার কাছে সে বড়িয়া। সিক্ষ স্মিতা হল চার বোতল দারু।' তারপর হাত বাড়াল, 'আমারটা কোথায়? মনে নেই তোমাদের?'

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

প্রেমনাথ রেগে গেল, 'কথা ছিল দুবোতল ভুটানি খাওয়াবি, মনে নেই?'

দু বোতলের দাম তিরিশ টাকা। সেটা জোগাড় করা অসম্ভব। প্রেমনাথ রেগে কাঁই। চিৎকার করে বলল, 'ঠিক আছে, মিস পামেলা দেখাব না।'

'তাহলে?' বুধুয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

প্রেমনাথ জবাব দিল না। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

অনেক চেষ্টা করে ডেভিডরা সন্ধ্যের মধ্যে এক বোতল ভুটানি জোগাড় করতে পারল। লাইনের ধারে পদমবাহাদুর চৌকিদারের ঘরে ছিল মালটা। কিন্তু প্রেমনাথের এক কথা দুবোতলের কমে হবে না।

ছবি আরম্ভ হবার সময় ওদের আশা ছিল প্রেমনাথের রাগ কমবে। অন্ধকারে পর্দায় যখন আলা পড়ল তখন দেখা গেল বীর হনুমান শুরু হয়েছে। দর্শকদের গলা থেকে হতাশ স্বর ছিটকে উঠল। প্রেমনাথ নির্বিকার। ছবি শুরু হতেই উদয়ন অফিস থেকে বেরিয়ে খানিকটা বসে থমকে দাঁড়াল। পর্দায় তখন রামচন্দ্রের সামনে হনুমান জোড় হাতে বসে।

www.boiRboi.blogspot.com

সে হেসে ফেলল। একি হল? বড়বাবু ছবিটাকে বদলে দিলেন নাকি?

একথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে দর্শকদের আনন্দিত করছে না সিনেমাটা। তারা যে হাসছে সেটা হনুমানের কাজকর্মের জন্যে। প্রতি মাসে নবীন নায়ক নায়িকাদের ছবি দেখতে অভ্যস্ত দর্শকদের মনে ভগবানের মাহাত্ম্য দেখার আগ্রহ একটুও নেই। হয়তো বড়বাবু সপরিবারে ছবি দেখছেন। উদয়ন হেসে ফেলল। এখনও অনেক বাঙালি স্ত্রীকে ওয়াইফ বলে পরিচয় দেন।

ফিরে আসার পথে উদয়ন ছেলেগুলোকে দেখল। সিনেমা যেখানে হচ্ছে সেখান থেকে অনেকদূরে হাসপাতালের বারান্দার সামনে নিজেদের মধ্যে খুব গভীর পরামর্শ চলছে। এদের উদয়ন চেনে। ইন্টার টি গার্ডেন ফুটবল ম্যাচে এই বাগানের হয়ে খেলে। স্বাস্থ্য ভাল ছেলেটো ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। তাকে দেখে কথা থামিয়ে চুপচাপ দাঁড়ায় ওরা।

কি মনে হতে উদয়ন প্রশ্ন করল, 'কিরে সিনেমা দেখছিস না?'

একজন অদ্ভুত শব্দ করল। যার অর্থ ওসব দেখা যায় নাকি।

উদয়ন হাসল, 'তোরাই শুধু দেখবি? তোদের বাবা কাকারা দেখবে না?'

ডেভিড বলল, 'ওরাও ভাল করে দেখছে না বড়সাব।'

'ঠিক আছে, পরের বার ভল সিনেমা আনতে বলে দিস।' উদয়ন হাঁটতে আরম্ভ করতেই মাংরা বলে ফেলল, 'ওর কাছে ভাল সিনেমা আছে।'

উদয়ন দাঁড়াল, 'তাই নাকি? কি সিনেমা?'

'মিস পামেলা।' বুধুয়া জবাব দিল।

উদয়ন বুঝল এটা বড়বাবুর কীর্তি। সে ওদের সান্ত্বনা দিল, 'এক মাসে দুটো সিনেমা দেখাবে না ওরা। এটাই নিয়ম।'

'দুবোতল ভুটানি পেলেই দেখাবে।' মাংরা বলল।

'মানে?'

'গতবারই প্রেমনাথ বলে গিয়েছিল দুবোতল ভুটানি এনে রাখতে। ও মিস পামেলাকে আনবে। আমরা এক বোতল আনতে পেরেছি বলে হনুমানের সিনেমা দেখাল।' মাংরা সত্যি কথা বলে ফেলল।

'এক বোতলের দাম কত?'

'পনের।'

উদয়ন একটু ভাবল। মিস্টার হনুমান বন্ধ করে মিস পামেলা চালাতে বলা খুব শোভনীয় হবে না। এদের হাতে পনের টাকা দেওয়াটাও একই ব্যাপার। আর ছবিটা বদলে গেছে বড়বাবুর জন্যে নয় প্রেমনাথের মদ না পাওয়ার কারণে। লোকটাকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় হবে।

সে বলল, 'সিনেমা শেষ হলেই প্রেমনাথকে বলবি বাংলোয় আমার সঙ্গে দেখা করতে। বুঝলি?'

সে পা বাড়াল। অনেকটা চলে আসার পর তার খেয়াল হল ওদের জিজ্ঞাসা করা হল না ধাবায় গিয়ে খাবার খেয়েছে কিনা। হপ্তার দিনে যে টাকা ওরা পায় তা থেকে কতটা ধাবায় খরচ হয় সেটা জানা দরকার।

৩—

খবরটা ছড়িয়ে গেল। বড়সাহেব প্রেমনাথকে সিনেমার পর বাংলোতে দেখা করতে বলেছেন। খুব রেগে গেছেন। যে যার মত করে ভাবনা জুড়তে লাগল সেইসঙ্গে। খবরটা প্রেমনাথও পেয়েছিল। বিভিন্ন বাগানে সিনেমা দেখায় সে ঘুরে ঘুরে। কখনই ম্যানেজারের সামনে যাওয়ার দরকার হয় না। বড়বাবুই তার সব। সে যে ভুটানি মদ চেয়েছিল বলে ম্যানেজার রেগে গিয়েছে এমন কথা জেনে সামান্য বিচলিত হল। ম্যানেজার ইচ্ছে করলে তাকে নিষেধ করতে পারে বাগানে আসতে। একটা বাঁধা ঘর নষ্ট হবে। ডেভিডদের ওপর রাগ হচ্ছিল তার।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে প্রেমনাথ যখন বাংলোর পথে হাঁটতে শুরু করল তখন তার পেছনে অন্তত শখানেক ছেলেবুড়োর ভিড়। জয় বজরংবলী বলে আওয়াজ দিচ্ছে তারা। বাংলোর চৌকিদার দাঁড়িয়েছিল গেটে। জনতাকে সেখানেই আটকে রেখে সে প্রেমনাথকে ভেতরে যেতে বলল।

এই সাজানো গোছানো হিন্দী সিনেমার মত বাড়িতে ঢুকতেই খুব অস্বস্তি হয়। প্রেমনাথ সসঙ্কোচে দরজায় পৌঁছে দেখল একজন চাকর তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সে অনেকটা নিচু হয়ে নমস্কার করল। উদয়ন সোফায় বসে টিভি দেখছিল। রিমোট টিপে সেটা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'আপ হুকুম করিয়ে সাব।'

'তুমি ছেলেদের কাছে মদ চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ সাব।'

'তোমার লজ্জা করেনি? এটা অন্যায় তুমি জানো না?'

'ঠিকই। কিন্তু উপায় ছিল না সাব।' হাত জোড় করে জবাব দিল প্রেমনাথ।

'কেন?'

'একদম রঙিন নয়া প্রিন্ট। শিলিগুড়ির ডিস্ট্রিবিউটার পঞ্চাশ রুপিয়া এক্সট্রা মাংতা ইসকা লিয়ে। বাগান তো দেবে না ওই টাকা। আমি ওদের দু বোতল ভুটানি দিতে বললাম। পঞ্চাশের বদলে দুবোতল ভুটানি নিতে রাজি করিয়েছি ডিস্ট্রিবিউটারকে। আমার কোনো দোষ নেই।'

'তোমার ডিস্ট্রিবিউটার ভুটানি মদ খায়?'

'নেহি সাব। উসকো এক দোস্ত আয়া কলকাত্তা সে—।'

হাসি চাপল উদয়ন, 'তা ছেলেরা তো দিল না। ফিল্মও এনেছ। এখন কি দেবে ফিরে গিয়ে?'

'হাম বলেগা শো নেহি হুয়া।'

'ঠিক আছে, এরকম আর করো না।' উদয়নের কথায় হাসি ফুটল প্রেমনাথের। বলল, 'সাব, শিলিগুড়ি থেকে ভাল ক্যাসেট এনে দেব? নয়া নয়া ইংলিশ ফিল্ম?'

'এখন দরকার নেই।' উদয়ন জানলার কাছে উঠে অত রাত্রেও মানুষগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সে চাকরকে ডাকল, 'এরা কি জন্যে এখানে অপেক্ষা করছে?'

চাকরটা বিনত গলায় জানাল ওরা ভাবছে সাহেব প্রেমনাথকে এমন বকবে যে ও আবার একটা সিনেমা দ্যাখাবে।

উদয়ন বলল, 'ওদের চলে যেতে বল। মাসে দুটো সিনেমা দেখানোর নিয়ম নেই। যাও। যত ঝুট ঝামেলা।'

রাত্রে ডিনার টেবিলে বসে উদয়ন অরুণিমাকে বলল, 'তুমি হয়তো জানতে চাইবে না এই যে এখানকার ইয়াং ছেলেদের মনে এ্যাডাল্ট ফিল্ম দেখার বাসনা তা ধাবা হবার আগে ছিল না।'

অরুণিমা অবাক, 'ধাবার সঙ্গে এ্যাডাল্ট ফিল্মের কি সম্পর্ক?'

'নিয়ম ভাঙার উৎসাহটা ওরাই জুগিয়েছে।'

'বুঝলাম না।'

'এত রাত্রে টাকা জোগাড় করতে পারছিল না বলে ভুটানি মদ কেনেনি। এখানে কোনও মদের দোকান নেই। হাসিমারায় যেতে হলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আট মাইল পার হতে হয়। সেটা কেউ করবে না। তা হলে পাবে কোথায়? আমি নিশ্চিত যে এরা ধাবায় যেত। সেখানে নিশ্চয়ই ভুটানি মদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ টাকা থাকলে এরা ধাবা থেকে মদ কিনে এনে ঘুষ দিতে শিখত।'

অরুণিমা হাসল, 'তুমি এত ভাবো?'

'তার মানে।'

'আমি মিস পামেলা দেখব।'

'সিনেমা?' চমকে উঠল উদয়ন।

'না।, ওখানে গিয়ে তোমার কর্মচারীদের সঙ্গে বসে সিনেমা দেখা আমার নিষেধ তা আমি জানি। তুমি ক্যাসেট আনাও। প্লিজ, এটা যে ধাবার খাবারের প্রতিক্রিয়া এমনটা ভাবতে বসো না।' অরুণিমা উঠে গেল।

বিস্তৃত আসাম রোডের লরিচালকদের জানা হয়ে গেলেও জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে খেতে নামতে অনেকের কুণ্ঠা ছিল। দিনের বেলায় তাই যত ট্রাক ধাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত রাত্রে তার একাংশও নয়। সবাই স্পীড তুলে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ছোট জেনারেটার এনে ওয়েসিসকে আলোকিত করে শুধু জঙ্গলের পোকাদেরই ডেকে আনা সার হয়েছে। অথচ দিনের চেয়ে রাত্রেই ধাবায় বিক্রি বেশি হয়। ধাবাওয়ালা যতই বলুক এখানে ডাকাতির কোনও সম্ভাবনা নেই, বাছাই করা গার্ড আছে পাহারায়, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তবু ভরসা পাচ্ছে না লরিওয়ালারা। এর মধ্যে অবশ্য একদিন হাতির দল বেরিয়েছিল। হাইওয়ের ওপর গোটা পনের এসে চুপচাপ ধাবার দিকে তাকিয়েছিল। তখন তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে। সময়টা বিকেল। হাতিরা যেমন এসেছিল তেমনই ফিরে গেল কিন্তু ড্রাইভারগুলো পালালো তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে। সামনাসামনি হাতি দেখার গল্প আরও রঙিন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল অন্য ধাবাগুলোতে। তাই বিকেল হতে না হতেই ধাবা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। রাঁধা খাবার রোজ রোজ কে নষ্ট করে। গালে হাত পড়ে গেল ম্যানেজারের।

খবরটা উদয়নও পেয়েছিল। ধাবার বিক্রী কমেছে। এমন চললে উঠে যেতে বেশি দেরি নেই। মনে মনে খুশী সে। কিন্তু এক ভোরের টহলদারিতে হাইওয়ে দিয়ে আসার

www.boiRboi.blogspot.com

সময় সে দেখতে পেল ধাবার লাগোয়া ঢালু জমিতে বাঁশ পোঁতা হচ্ছে। সে দাঁড়ায়নি। ওই জমি পি ডব্লু ডি-র। কিন্তু ব্যবসা যখন খারাপ চলে তখন কেউ সেটা বাড়ায় না। অথচ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ধাবাটাকে আরও প্রসারিত করা হচ্ছে। ঘটনাটা তাকে চিন্তায় ফেলল। দুপুরের পর তার নিজস্ব আর্দালি সাইকেলে চেপে জায়গাটা ঘুরে এসে জানাল সেখানে পর পর দশটা দরমার বেড়া দেওয়া ঘর তৈরি হয়ে গেছে। একে ধাবা তার ওপর ঘর। খবরটা শুনেই উদয়ন জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ধাবার ম্যানেজার তাকে জিপ থেকে নামতে দেখে সসম্মানে এগিয়ে এল, 'আইয়ে সাব, আইয়ে সাব। আইয়ে সাব। কি সৌভাগ্য। হুকুম করুন কি সেবায় লাগব?'

কোমরে হাত দিয়ে ধাবার পাশে এক লাইনে তৈরি ঘরগুলো দেখল সে। চারটে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ড্রাইভার খালাসিরা খাটিয়ায় বসে খাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ঘরগুলো কেন তৈরি করলেন?'

ম্যানেজার মাথা নাড়ল, 'বর্ষাকাল আসছে। খোলা আসমানের নিচে বসে কাস্টমাররা তো খেতে পারবে না। তাছাড়া অনেকদূর থেকে গাড়ি চালিয়ে আসে ওরা, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সেই জন্যেই ওগুলো মালিক বানালো। খাটিয়া পাতিনি, ভেতরে দরমার ওপর মোটা বস্তা পেতে দিয়েছি বিশ্রামের জন্যে।'

উদয়ন আর দাঁড়াল না। জিপ নিয়ে সোজা চলে গেল কুড়ি মাইল দূরে বিডিওর অফিসে। ম্যানেজার যে যুক্তি দিল তা এখনকার মত অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সত্যি কথা, বৃষ্টির মধ্যে কেউ খাটিয়ায় বসে খেতে পারবে না। এ তল্লাটে বৃষ্টি ভালই হয়। আর তার জন্যে ওইরকম ঘর তৈরি করাটাও খুব অস্বাভাবিক নয়। তবু তার ভাল লাগছিল না।

বিডিও নিজের চেয়ারেই ছিলেন। অল্প বয়সী। উদয়নকে চেনেন। ঘরে ঢুকতেই সমাদর করে বসালেন। উদয়ন সমস্যা বলল।

ভদ্রলোক বললেন, 'ওরা শুধু ধাবার অনুমতি নিয়েছিল। তাও একেবারে বড়কর্তার কাছ থেকে। কিন্তু ঘরগুলো বেআইনিভাবে করা হয়েছে। আচ্ছা, এতে আপনার অসুবিধে কি হচ্ছে?'

'আমি খুব ডিস্টার্বড ফিল করছি।'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু যতক্ষণ ওরা এ্যান্টি সোস্যাল কাজকর্ম না করছে ততক্ষণ আমার পক্ষে কোনও স্টেপ নেওয়া অসম্ভব। আর আপনি যদি বলেন বেআইনি ঘরগুলো ভেঙে দিতে বলতে পারি।' বিডিও বললেন।

কিছু করার নেই। উদয়ন ক্যাসেট লাইব্রেরিতে গেল বিডিওর অফিস থেকে বেরিয়ে। এখানে হিন্দী ক্যাসেটের সংখ্যাই বেশি কিন্তু মিস পামেলা নেই। নামটা শুনেই বোধহয় ছেলেটা বলল, 'আপনি যদি চান তাহলে থ্রি এক্স ক্যাসেট দিতে পারি।'

উদয়ন কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। শহরগুলো গোল্লায় গেছে যাক কিন্তু তার চা বাগানকে সে স্বাভাবিক রাখবে, যতক্ষণ পারে।

দু প্লেট মাংস চারজনে খাবে এমন মতলব নিয়ে ওরা সাইকেলে চেপে হাইওয়ে ধরে আসছিল। দুটোতে চারজন। আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। সূর্য এখন গাছগুলোর আড়ালে।

ফলে হাইওয়েতে ঘন ছায়া জমছে। মিনিট পনেরর মধ্যে অন্ধকার নামবে। মাঝরাস্তায় এসে ওরা দ্বিধায় পড়ল। খেয়ে দেয়ে ফিরে যেতে রাত হবে। গতরাত্রেও পাঁচ নম্বর বিটে বাঘ ঢুকেছিল। সঙ্গে কোনও আলো নেই। দুজনে ফিরতে চাইছে দুজন এগোতে। এইসময় ট্রাককে ছুটে আসতে দেখে সরে দাঁড়াল ওরা। ট্রাকটা যখন পাশ দিয়ে গেল তখন মহিলা কণ্ঠের গান ভেসে এল। একটা দমকা বাতাসের মত সেই গান কানে পৌঁছেই মিলিয়ে গেল। বাগানের কাজে শ্রমিক এবং কামিনদের ট্রাকে চাপিয়ে মাঝে-মাঝেই নিয়ে যাওয়া হয়। মন মেজাজ ভাল থাকলে তারা দলবেঁধে গান গায়। কিন্তু এই গান সেরকম নয়। ডেভিড দেখল দূরে ট্রাকটার গতি কমে যাচ্ছে। তারপর রাস্তার একপাশে ঠিক বিন্দুর মত থমকে থাকল সেটা।

সে বলল, 'শালা। ট্রাকে চেপে ধাবায় খেতে এসেছে।'

বুধুয়া মজা পেল, 'ভাল চাঁদা উঠেছে মনে হচ্ছে!'

নোয়াম জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে এল বলতো?'

মাংরা হাত নাড়ল, 'ওরা দূর দূর থেকে এল আমরা এখন ডরপুক যে পালিয়ে যাচ্ছি।'

সংলাপটা কাজে লাগল। ট্রাকে অনেক মেয়ে ছিল। সেই ট্রাক ধাবায় থেমেছে। ধাবায় চমৎকার খাবার হয়। অতএব একবার চেখে যাওয়া যাক এমন মন নিয়ে ওরা এগোল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যে নামছে ঝুপঝাপ। ঘন ছায়ায় কালো মিশছে। ওরা দূর থেকেই ধাবায় আলো জলতে দেখল। বেশ জোরালো আলো, জেনারেটরের আওয়াজ রাত্রের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল। সম্ভবত এই আওয়াজেই হিংস্র জন্তুরা এদিকে পা বাড়াতে সাহস পায় না। ওরা আর একটু কাছে এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। ওরা কারা?

ব্যাপারটা ওদের কাছে বিভ্রম আনল। গোটা দশেক মেয়ে জেনারেটারের আলোয় দাঁড়িয়ে সাজগোজ করছে। অদ্ভুত চেহারার দুটো লোক দুটো আয়না ধরে আছে। মেয়েগুলো তাতে নিজেদের দেখে নিচ্ছে। মুখে পাউডার ঘষছে। এইসময় ম্যানেজার একটা কাগজ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাগজের লেখা পড়তে লাগল। মেয়েগুলো নিজের নিজের নামের সময় হাঁ জী হাঁ জী বলতে লাগল।

গোনা শেষ হয়ে গেলে ম্যানেজার ওদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিল। দশটা ঘর দশজন মেয়ের জন্যে। একটা লোক বাঁশের মধ্যে দশটা হ্যারিকেন ঝুলিয়ে নিয়ে এসে এক একটা মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। মেয়েগুলোর অভিজ্ঞতা আছে নইলে ওরা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে ওই ভাবে হেসে উঠতে পারত না। ওপাশে ধাবার সামনে জমা ট্রাক ড্রাইভারদের জমায়েত থেকে একটা তীব্র সিটি বাজল। মেয়েগুলো হেসে উঠল আরও জোরে।

ওরা চারজন স্তম্ভিত। এমন মেয়ে জীবনে দ্যাখেনি ওরা। যারা শাড়ি পড়েছে তাদের কায়দা কানুন ঠিক হেমামালিনীর মত। বোধহয় তার চেয়ে বেশি। বুকে আঁচল থাকছে না বলা চলে। কি হেয়ার স্টাইল! আহা! দুজন সালোয়ার কুর্তা পরেছে। একজন স্কার্ট। তার হাঁটুর ওপর অনেকটা দেখা যাচ্ছে। ওপরে গেঞ্জি, বোতাম লাগানো নেই।

মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কারা?'

বুধুয়া বলল, 'কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

নোয়াম মাথা নাড়ল, 'স্যুটিং হবে নাকি?'

ডেভিড বলল, 'মেয়েগুলোর চেহারা দেখেছিস? সবাই মিস পামেলা!'

মাংরা হিক হিক করে হাসল, 'আর আমরা মিস্টার হনুমান।'

ডেভিড বলল, 'অ্যাই শালা! চুপ।'

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা দেখছিল। ইতিমধ্যে একটা ছুটন্ত ট্রাক খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ব্রেক কষল। তারপর ব্যাক গিয়ারে পিছিয়ে এল খানিকটা। ম্যানেজার হাঁকল, 'আইয়ে জনাব। মাটন কষা, চিকেন কারি আ-র বেহেস্ত কি হুরী আপকো সেবামে হ্যায়?

দুটো লোক খাবারের অর্ডার দিয়ে মালের বোতল চাইল। ম্যানেজার তার কথা রাখতে টাকা দিয়ে দিল ওরা। তারপর কাঁচা মদ গলায় ঢেলে প্রথম দুটো ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলল। ডেভিডরা দেখল লোকদুটো দুটো ঘরে ঢুকে গেলে মেয়েরা দরজা বন্ধ করে হ্যারিকেনের আলো আড়াল করল। চার বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

মাংরা জিভ চাটল। 'ওই প্রথম মেয়েটা হেমার মত দেখতে।'

নোয়াম বলল, 'ধ্যাৎ! ওকে দেখতে রাখীর মত। একটু মোট্টি!'

ডেভিড ধমকালো, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে? খাবি না?'

অতএব ওরা আড়াল ছেড়ে কাঁপা পায়ে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে দেখল আগে থেকে যেসব ড্রাইভার বসে খাবার খাচ্ছিল তারা তৃতীয় ও চতুর্থ মেয়ের ঘরে ঢুকে গেল। ওদের দেখে ম্যানেজার একটু অবাক হল, 'কিয়া চাহিয়ে?'

'খানা।' ডেভিড বলল।

'আজ ফুল দাম দেনে হোগা।'

'দেগা।'

'গুড। কিয়া খানা চাহিয়ে?'

'দো মাটন কষা আউর চার রুটি।'

'দো মাটন চার আদমিকে লিয়ে?'

'জী?'

'কেয়া ভাই! জেবমে রুপিয়া কমিত হ্যায় কেয়া?'

'ইসকো জবাব দেনে পড়েগা?' ডেভিড রাগত গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। ওস্তাদ, দো মাটন কষা আউর চার রোটি বাহারমে! গোস্তাকি মাপ করনা জী! হ্যাঁ, খানেকো আগে তোরা দিল ভর লেগা ক্যা? দেখা হ্যায় আপনে? ম্যানেজার হাতের মুদ্রায় মেয়েদের দেখালো। ওরা দেখল। দশ নম্বর ঘরের সামনে স্কার্ট পরা মেয়েটি চোখাচোখি হওয়া মাত্র ডেভিডের দিকে হাত নাড়তে লাগল।

ম্যানেজার বলল, 'যাও, যাও ভাই, বাতচিত কর লেও।'

মাংরা ডেভিডকে বলল, 'ওই মেয়েটাকে একদম রেখার মত দেখতে।'

এইসময় স্কার্টপরা মেয়েটা গালে হাত রেখে গেয়ে উঠল, 'তেরে স্বপ্ন কি রানী ম্যায় আ গিয়া—।' সঙ্গে দরজায় দাঁড়ানো অন্য মেয়েরা হেসে উঠল।

বুধুয়া বলল, 'স্বপ্ন কি রানী! আমি যাব?'

ডেভিড বাধা দিল, 'না, আমি আগে।'

এইসময় ছোকরাটা এসে জিজ্ঞাসা করল, 'দারু চাহিয়ে? বিলাইতি, ভুটানি, বিয়ার, যো চাহিয়ে মিল যায়েগা!'

ডেভিড থমকালো, 'বিলাইতি!'

'হ্যাঁ। হুইস্কি, রম, ব্রান্ডি। ছোটো বোতল 'শ রুপিয়া।'

'একশ?' সমস্ত উৎসাহ উধাও হয়ে গেল বিলিতি মদ সম্পর্কে।

ছেলেটা গলা নামাল, 'আরে দোস্ত একই বাৎ হ্যায়। ভুটানকো মাল আউর কল্যাণীকা বিলাইতি মালমে কেয়া ফারক পড়তা। ভুটান দেগা?'

ডেভিড মাথা নেড়ে না বলল। যাক কখনও প্রেমনাথ এসে ঝামেলা করলে একটা জায়গা জানা থাকল। ছেলেটা বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলে ডেভিড পা বাড়াল। তার শরীরে কাঁপুনি এল, বিশেষ করে পা দুটোতে। নাঃ, এই মেয়ে দুটো বড্ড বেশি পাউডার মেখেছে। ওটার বয়স খুব বেশী। মনে মনে সবাইকে বাতিল করে সে স্কার্ট-এর সামনে চলে আসতেই মেয়েটা দুলে দুলে বলল, 'চুমা দে চুমা দে।'

ডেভিড বিগলিত হল। আজ পর্যন্ত সে স্বপ্নেও এমন দৃশ্যের কথা কল্পনা করতে পারেনি। সিনেমার পর্দায় যা নায়কদের হয় তাই তার জীবনে হতে যাচ্ছে। সে বোকা বোকা হাসল। মেয়েটি কোমরে ঢেউ খেলিয়ে বলল, 'আউ প্যায়ারে পাস হামারে কাহে ঘাবড়াও, কাহে ঘাবড়াও।'

ডেভিড এগোল। এখন সে অমিতাভ আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রেখা। রেখা হাত বাড়াল, 'রুপিয়া! দো কুড়ি মেরি লিয়ে দশ ধাবাওয়ালাকো। পঞ্চাশ নিকালো পহেলে!'

প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ডেভিড। পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে!

সে কাতর গলায় বলল, 'এতনা রুপিয়া দেনে পড়েগা?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'বাহারে বাঃ। হাম তেরে ঘরকা আওরাৎ হ্যায় ক্যা? পয়সা বিনা ফুর্তি? দেও—।'

ডেভিড পকেটে হাত দিল। তার খেয়াল হল আজ পকেটে বারো টাকা আছে। সে দুরে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়ানো বন্ধুদের দিকে তাকাল। ওদের পকেট যা আছে সব একজায়গায় করলেও পঞ্চাশ টাকা হবে না।

ডেভিড ঠোঁট চাটল, 'আমি ফুর্তি করব না। শুধু কথা বলব।'

'ভ্যাট।' মেয়েটি বেঁকে দাঁড়াল।

'মাইরি বলছি।'

'দিলকি বাৎ শুন দিলওয়ালা কিন্তু টাকা ছাড়া না। আচ্ছা, তোমার জন্য দশ টাকা কমিয়ে দিলাম। চল্লিশ। দাও বাবা চল্লিশ।'

'আমার কাছে অত টাকা নেই।'

'তাহালে কেটে পড়। ফোরটুয়েন্টি। এ একেবারে চারশো বিশ!' স্কার্ট পরা মেয়েটি পাশে দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটির কাছেই যেন অভিযোগ জানাল। আর জানাতে জানাতে নিজের জামার বোতাম একটা খুলে দিল।

ডেভিডের মনে হল চল্লিশটা টাকা তার থাকা উচিত ছিল। এবার পাশের দরজার

www.boiRboi.blogspot.com

মেয়েটা বলল, 'এই রানী, জিজ্ঞাসা কর না কত আছে পকেটে!'

স্কার্টপরিহিতার নাম তাহলে রানী। সে এবার প্রশ্নটা ডেভিডকে করল।

ডেভিড সত্যি কথা বলতে হাসির ফোয়ারা উঠল। আর তখনই ছুটে যাওয়া দুটো ট্রাক এদিকে তাকিয়ে গাড়ির গতি কমাল। থেমে গেল শেষ পর্যন্ত। তাদের ড্রাইভারদের দেখে মেয়েরা উল্লসিত হল। ডেভিডের চোখের সামনে এক সর্দারজী ড্রাইভার রানীর হাতে পঞ্চাশটা টাকার নোট গুঁজে কোমরে হাত জড়িয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ডেভিডের কান্না পাচ্ছিল। ও চট করে হাইওয়েতে উঠে এল। তারপর অন্ধকারেই হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করল। বন্ধুরা দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে ওকে তাড়া করে ধরে ফেলল।

মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল? তুই পালিয়ে এলি কেন?'

'ওখানে দাঁড়িয়ে কি করব? ওটা বড়লোকদের জায়গা। মনের কোনও দাম নেই। আমার কাছে টাকা নেই বলে কি রকম অপমান করল।' ডেভিড ফুঁপিয়ে উঠল। নোয়াম বল, 'এখানকার খানা ড্রাইভারদের মেয়েছেলেও ওদের। আমরা শালা ফালতু।'

বুধুয়া বলল, 'দুনিয়ার এই নিয়ম। আমাদের চোখের সামনে এই বাগানের ধারে ওরা মেয়েছেলে নিয়ে আরাম করবে আর আমরা দূর থেকে দেখব।'

ডেভিডের খুব রাগ হচ্ছিল, 'কি করা যায়।'

মাংরা বলল, 'কত টাকা চাইল?'

'পঞ্চাশ।'

'ধার করবি?'

'ধার করলে শোধ করতে হবে না। চল এখান থেকে। কক্ষনো এই জায়গায় আসব না। এরা সব শয়তান।' ডেভিড আবার হাঁটতে লাগল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল উদয়ন। বড়বাবুর মুখের দিয়ে তাকিয়ে সে প্রথমে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কে বলল আপনাকে?'

'পাতিবাবু। ওকে বলেছে একজন সর্দার।'

'ঠিক কি শুনেছেন আবার বলুন।'

বড়বাবুর উত্তেজনাও কম ছিল না। প্রথমবারে তিনি ঠিক গুছিয়েও বলতে পারেননি। এবার বললো, সন্ধ্যেবেলায় প্রচুর সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আসছে ধাবাওয়ালা। তাদের দিয়ে ড্রাইভারদের কাছে মদ বিক্রী করছে। এই নতুন তৈরি ঘরগুলো খারাপ কাজের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাগানের কয়েকটি ছেলে রাত্রে দেখে এসেছে।'

'ছেলেগুলো রাত্রে ওখানে গিয়েছিল কি করতে?'

'তাতো জানি না।'

'ইন্টারেস্টিং। না, না, সব দিক দেখেশুনে এগোতে হবে। আজ সকালে যখন আমি রাউন্ড দিয়ে ফিরি তখন ধাবাতে কোনও মেয়ে দেখতে পাইনি। কাল রাত্রে যদি ওরা মেয়েদের দেখে থাকে তাহলে ভোরবেলায় গেল কোথায়।

বড়বাবু গালে হাত দিলো, 'তাতো বলতে পারব না।'

'যে চারটে ছেলে ওসব দেখেছে তাদের ডেকে আনুন। চটপট।'

হুকুম পাওয়া মাত্র বড়বাবু বেরিয়ে গেলেন। এ ব্যাপারে একটু উৎসাহী বলে মনে হচ্ছিল ওঁকে।

উদয়ন ভেবে পাচ্ছিল না কি করা উচিত। কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে ধাবাটাকে উচ্ছেদ করতে আর কোনও সমস্যা হবে না। বিক্রি বাড়াবার জন্যে ওরা প্রস্টিটিউট আনছে। এ তল্লাটে প্রস্টিটিউট কোথায়? ভেবে পেল না উদয়ন। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে প্রস্টিটিউট আনানো হত, এও তেমনি। অত্যন্ত খারাপ ধরনের অপরাধ। পালাবার কোনও পথ নেই। কিন্তু ধীরে সুস্থে এগোতে হবে। সে বাংলোয় টেলিফোন করল, আমার কথা তো বাসী হলে দামী হয়। ধাবা যে অ্যান্টি সোস্যালদের আড্ডা হয়ে উঠবে আমি আগেই বলেছিলাম।'

'কি হয়েছে?'

'ব্রেকফাস্টে গেলে বলব।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। তার বেশ উত্তেজনা হচ্ছিল। এতদিনে বাগে পাওয়া গিয়েছে। এখন একেবারে হাতেনাতে ধরতে পারলেই হল।

বড়বাবু এলেন দুজনকে সঙ্গে নিয়ে। বাকিরা অনেক দূরে কাজে চলে গিয়েছে। ডেভিড আর বুধুয়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। বড়বাবু বললেন, 'স্যার, এরাই দেখেছে।'

উদয়ন ছেলেগুলোর দিকে তাকাল। প্রেমনাথকে দিয়ে মিস পামেলা চালাতে এরাই উদ্যোগ নিয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে বল!'

ডেভিড বুধুয়ার দিকে তাকাল। হঠাৎ বুধুয়া হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, 'আমার কনো দোষ নেই সাহেব। আমি কিছু করিনি।'

বড়বাবু ধমক দিলেন, 'তোকে কেউ কিছু বলেছে যে কাঁদছিস?'

উদয়ন ডেভিডকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কজন ছিলে?'

ডেভিড মাথা নিচু করল, 'চারজন।'

'কখন গিয়েছিলে?'

'সন্ধ্যের আগে।'

'কেন?'

'খাবার খেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল।'

'হু। প্রায়ই তোমরা ধাবায় খাও?'

'না সাব।'

'তারপর কি হল?' উদয়ন বুধুয়াকে জিজ্ঞাসা করল।

'তারপর একটা ট্রাক এল। ট্রাকে সুন্দরী মেয়ে ভর্তি।'

'কোনদিক থেকে এল ট্রাকটা?'

'হাসিমারার দিক থেকে।'

'কজন ছিল।'

'এগার, না, দশ।'

'ওরা কি করছিল?'

'খুব সাজল। পাউডার মাখল। তারপর হ্যারিকেন নিয়ে একজন এক একটা ঘরের

www.boiRboi.blogspot.com

সামনে দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকজন ড্রাইভার খাটিয়ায় বসে মাংস খাচ্ছিল তারা তিন চারজনের ঘরে ঢুকে গেল।'

'তোমরা কোথায় ছিলে?'

'ওখানেই। আমাদের ম্যানেজার খুব বলছিল যেতে।'

এবার ডেভিড বলল, 'সাহাব, হামলোগ নেহি গিয়া।'

উদয়ন বুধুয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যিকথা?'

'হাঁ সাহাব। মেয়েটা পঞ্চাশ টাকা চাইছিল। অত টাকা কোথায়?'

'পঞ্চাশ টাকা কার কাছে চেয়েছিল?'

বুধুয়া ডেভিডের দিকে তাকাল। সত্যিকথা এখন বলা ঠিক হবে কি না সে বুঝতে পারছিল না। উদয়ন আর জেরা করল না। সে বলল, তোমাদের কাছে টাকা ছিল না এটা ভগবানের দয়া। ওরকম মেয়ের কাছে গেলে অসুখ হয়। আজ সকালে ওই মেয়েদের ধাবায় দেখা যায়নি। এমন হতে পারে ওরা ঘরের ভেতর ঘুমাচ্ছিল। তোমাদের দুজনকে আজ বাগানের কাজ করতে হবে না। তোমরা এখনই ধাবায় গিয়ে দেখে এসো মেয়েগুলো আছে কি না। যদি না থাকে বিকেলে আবার যাবে। যদি আজ আবার ওদের নিয়ে ট্রাক আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবে। বুঝতে পেরেছ?'

ডেভিড মাথা নাড়ল।

'ওরা খুব অন্যায় করছে। আমাদের বাগানের পবিত্রতা নষ্ট করছে। এই বাগানে তোমরা জন্মেছ। তোমাদেরও অসম্মান হচ্ছে এতে। হ্যাঁ, আজ যখন তোমরা নজর রাখবে তখন যেন ওরা টের না পায়।'

এ এক অন্য ধরনের উত্তেজনা। সাহেব হুকুম দিয়েছেন নজরদারি করতে। গতরাত্রে যে অপমানবোধ নিয়ে ওরা ফিরে এসেছিল তা যেন এখন আরও বলবান হল। হাইওয়ে ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে ধাবার কাছে ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। না কোন মেয়েছেলে নেই। ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকাও সম্ভব নয়। ওরা আবার কিছুটা ঘুরে হাইওয়ে পেরিয়ে ফেন্সিং ডিঙিয়ে চা-বাগনের জঙ্গলের আড়াল দিয়ে ঘরগুলোর পেছনে চলে এল। দরমার বেড়া। একটু চাপ দিলেই গর্ত হয়ে যাচ্ছে। তার ফাঁক দিয়ে ওরা দেখল মাটিতে পাতা চ্যাটাই-এর ওপরে কোন মানুষ শুয়ে নেই।

যেসব ট্রাক আসছে তাদের ড্রাইভার মদ মাংস খাচ্ছে প্রকাশ্যেই। একমাত্র জঙ্গল ছাড়া দেখার কোন প্রাণ এখানে নেই। এমনকি পাখিরাও আজকাল এই তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে।

দুপুরে বড়সাহেবকে খবরটা দেবার জন্যে বড়বাবুকে বলে গেল ওরা?

ঠিক সন্ধে না হতেই ট্রাকটা এল মেয়েদের নিয়ে। গতকাল যারা এসেছিল তারাই আজ ট্রাক থেকে নামল। সেই স্কার্ট পরিহিতা যার নাম রানী সেও আছে। আজ রানী সিগারেট খাচ্ছে আর হাই তুলছে। পঞ্চাশ টাকা যদি পাওয়া যেত। ডেভিডের মনে পড়ল সাহেবের কথা। এদের নাকি অসুখ আছে। অসুখ থাকলে অমন হেলে দুলে সিগারেট খেতে পারে? সামান্য জ্বর হলে লোকে কথা বন্ধ করে দেয়। শুধু ভয় দেখানোর জন্যে সাহেব তাদের অসুখের কথা শুনিয়েছে। নিজের ঘরের সামনে যেতেই রানী আজ খদ্দের পেয়ে গেল।

এক বুড়ো ড্রাইভার তার বুকে পঞ্চাশ টাকা গুঁজে দিতে সে লোকটাকে টেনে ঘরে নিয়ে গিয়ে চিৎকার করল, 'এত বোতল বিলাইতি সোনাম আউর দো গ্লাস জলদি।' ওরা দেখল ছেলেটা মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে রানীর ঘরের দিকে দৌড়াল। ডেভিড বলল, 'শালী।'

বুধুয়া বলল, 'বেগার রুপিয়া কোই নেই পুছতা।'

ডেভিড বলল, 'যেদিন পঞ্চাশ টাকা ওর মুখে ছুঁড়ে মারতে পারব!'

বুধুয়া হাসল। ডেভিড জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছিস কেন?'

'আচ্ছা, আমাদের সেবাকে ওই পোশাক পরালে কেমন লাগবে?'

ডেভিড থমকে গেল। তারপর বলল, 'ভ্যাট!'

রাত্রেই খবরটা পেয়ে গেল উদয়ন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বের করল সে। একাই গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে উঠে স্পীড কমাল। নিজের চোখে দেখে নিতে চায় সে। সেই সঙ্গে ম্যানেজারটা যেন তার উপস্থিতি টের না পায়। ধাবার সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় সে একটুও থামল না। কিন্তু ছাইমাখা মাগুর মাছের মত চেহারার কয়েকটা মেয়েকে হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল।

নাঃ। আর কোন সংশয় নেই। এদের প্রতি সন্ধ্যেয় নিয়ে আসা হবে আবার ভোর হতেই ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে নিল উদয়ন।

উদয়ন জানত না মেয়েদের ঘরগুলোর পেছনে যে তারের দেওয়াল যার গা থেকে তার চা বাগান শুরু হয়েছে সেখানে আজ সাত আটটি তরুণ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। অন্ধকার এবং চা গাছের আড়াল তাদের লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করছে। এইদলে ডেভিড এবং বুধুয়া নেই। মাংরা এবং নোয়ামের নেতৃত্বে লাইনের আরও কয়েকটি ছেলে বিস্ময় নিয়ে ছুটে এসেছে নায়িকাদের দেখবে বলে। ইতিমধ্যেই মনে মনে তারা এক একজনকে সিনেমার এক একটি নায়িকার নামে ডাকতে শুরু করেছে। মশার কামড় উপেক্ষা করেও তারা হিসেব করে যাচ্ছিল কোন নায়িকার দরজা কতবার বন্ধ হচ্ছে। এইসময় তাদের মনে বন্যজন্তুর অথবা ভৌতিক কোন ভয় বিন্দুমাত্র জোরালো হয়নি। মাংরা ওদের বুঝিয়েছিল পর্দায় যেমন প্রেমনাথ নায়িকাদের ছবি ফেলে আর তারা দূর থেকে দ্যাখে এও তেমনি দূর থেকে দেখার। যে টাকা দিলে ওই নায়িকাদের পাওয়া যায় তা ওদের নেই। হপ্তা পেলে সেই টাকা এখানে দিলে একদম না খেয়েই থাকতে হবে। অতএব দ্যাখো, দেখে যাও।

দ্যাখাটা যে স্পষ্ট হচ্ছিল তা নয়। খদ্দের পেয়ে গেলে ওরা চোখের আড়ালে। না পেলে হেলেদুলে দু-এক কলি হিন্দী গান গাইতে গাইতে যখন সামনে বেরিয়ে আসে তখন চোখ ভরে দ্যাখা। এই করতে করতে রাত হল বিস্তর। এইসময় একজন নায়িকার প্রাকৃতিক প্রয়োজন হল। সে চলে এল তাদের ফেন্সিং-এর কাছে। নিঃসঙ্কোচে সে যখন ভারমুক্ত হচ্ছে তখন অন্ধকারে জমে থাকা একজন নড়ে উঠতেই গাছে শব্দ হল। মেয়েটি চমকে উঠে চিৎকার করল বসা অবস্থাতেই। তার চিৎকারে অন্য মেয়েরা এবং ধাবার লোকজন ছুটে আসার আগেই মাংরা বন্ধুদের নিয়ে পালাতে চাইল। কোন মেয়েকে লুকিয়ে দেখা এক জিনিস আর প্রাকৃতিক কাজ করার অবস্থায় দেখা আর এক জিনিস। দ্বিতীয়টি

www.boiRboi.blogspot.com

এমন অপরাধ যার শাস্তি প্রীতিপ্রদ হবে না। ওরা যখন পালাচ্ছে তখন বসে থাকা মেয়েটা সজোরে পাথর ছুঁড়ল। পাথরটা সরাসরি অন্ধকার ফুঁড়ে নোয়ামের মাথায় আঘাত করল। সবাই যখন বিপদসীমার বাইরে চলে এসেছে তখন আবিষ্কার করা গেল নোয়ামের মাথা ফেটে রক্তের ধারা নেমেছে। বিশল্যকরণী পাতা ছেঁচে রস বের করে ক্ষতের ওপর চেপে ধরেও যখন রক্ত বন্ধ করা গেল না তখন নোয়ামকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। সেই সময় হাসপাতাল ঘুমন্ত। ডাক্তারবাবুর থাকার কথা নয়। কম্পাউন্ডার নেই। যে নার্স ডিউটিতে ছিল সে কি করে এত রাত্রে মাথা ফাটল না জেনে হাত দেবে না কিছুতেই। তার ভয় এমন কেসে পুলিশ আসতে পারে। ওদের বানানো গল্প নার্স বিশ্বাস না করলেও রক্ত বন্ধ করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

পরদিন নোয়ামের মাথায় ব্যান্ডেজ, নার্সের অবিশ্বাস মিলিয়ে মিশিয়ে বাগানে বেশ কৌতুক তৈরি করল। এই কৌতুক নোয়াম এবং মাংরাদের মনে যে আক্ষেপ জন্মেছিল তাকে একটু একটু করে ক্রোধে পরিণত করছিল। কিন্তু ডেভিড ওদের শান্ত করার চেষ্টা করছিল এই বলে বড়সাহেব আজ এমন ব্যবস্থা নেবে যে ধাবার স্বপ্নসুন্দরীরা জীবনে ভুলবে না।

দারোগা সিগারেট ধরাতে গেলেন কিন্তু কাঠির আগুন সিগারেটে পৌঁছালো না। তাঁর মুখ থেকে অদ্ভুত স্বর বের হল, 'একি বলছেন স্যার।'

'আমি সত্যি কথা বলছি।'

'এটা কি সম্ভব?'

'অসম্ভব বলে কোন শব্দ একসময় ডিকসনারিতেও থাকবে না।'

'আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। আই হ্যাভ সিন দেম। আমার বাগানের গায়ে সারা রাত ওরা কয়েকটা মেয়েকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করিয়ে মুনাফা লুটছে। আপনাদের আইনে এই ব্যাপারটি কি অন্যায় নয়?'

'একশ বার অন্যায়।' দারোগা চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমি প্রথম থেকেই বলেছি ধাবা মানেই অ্যান্টি সোস্যাল ব্যাপার হবে। আপনার সেকেন্ড অফিসার কথাটা নিতে চাননি।'

ঘরের এক কোণের টেবিলে বসে থাকা সেকেন্ড অফিসার বললেন, 'তখন মেয়েছেলেরা ছিল না স্যার।'

দারোগাকে খুব চিন্তিত দেখাল, 'বাট, এইসব মেয়ে সুন্দরী।'

'ওদের সৌন্দর্য দেখতে আমি যাইনি।' বিরক্ত হল উদয়ন।

'না স্যার, আমি ভাবছি কোত্থেকে যোগাড় করল। হাসিমারায় দু-একঘর যা আছে পাতে দেবার নয়।'

'বাইরে থেকে আনিয়েছে। কাছাকাছি কোথাও রেখেছে।'

'তাই হবে। তাহলে তো ধাবায় এখন হেভি বিক্রি!'

'আপনি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?'

'রেইড করব। সবকটাকে ধরে জেলে পুরব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। দারোগা

উত্তেজনায় টেবিলে ঘুষি মারলেন।'

লাঞ্চের পর বাংলোর নিচে নামতেই সে পুলিশের জিপটাকে দেখতে পেল। গেটের কাছে এগিয়ে যেতেই উত্তেজিত দারোগাবাবু জিপ থেকে নেমে এলেন, 'আপনার ইনফরমেশন ঠিক নয়।'

'তার মানে?' উদয়ন অবাক।

'আমি এইমাত্র ধাবায় রেইড করেছিলাম। মেয়েছেলে দূরের কথা একটা চুলের ক্লিপ পর্যন্ত পাইনি ওখানে। শুধু শুধু শব্দ তৈরি করলাম।'

'আপনি এখন রেইড করেছেন?' দাঁতে দাঁত চাপল উদয়ন।

'ইয়েস। আপনি নিজের চোখে দেখেছিলেন বলেই—।'

'আপনাকে বলেছি মেয়েগুলোকে ওরা সন্ধ্যেবেলায় নিয়ে এসে ভোর পর্যন্ত রাখে। আর আপনি ভর দুপুরবেলায় ওদের খোঁজে গেলেন।'

'ওহো! তাই তো!' যেন জিভ কামড়েছেন ভদ্রলোক। তারপর সটান জিপে উঠে বসলেন, কোন চিন্তা করবেন না। আজ রাত্রে আমি আবার আসছি। এখন টাইমিং-এ গোলমাল হয়ে গেছে বলে—ঠিক বলে—ঠিক রাত্রে আর কোন চান্স নিচ্ছি না।' জিপটা চলে গেল।

দারোগাকে নির্বোধ ভাবতে পারা যাচ্ছে না। উদয়নের মনে হয় লোকটা ইচ্ছে করেই এই সময়টা বেছে নিয়েছে যাতে ধাবায় ম্যানেজার সতর্ক হয়। কে জানে হয়তো ওখানে বলে এসেছে উদয়নের অভিযোগের কথা।

সারাটা দুপুর মন দিয়ে কাজ করতে পারছিল না। বিকেলে একটা জিপ বাগানে ঢুকল। নিজের ঘরে বসে খোলা জানলার বাইরে জিপটাকে দাঁড়াতে দেখল উদয়ন। জিপ থেকে দুজন লোক নামল। তাদের কাউকেই সে আগে দ্যাখেনি এরা নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

অনুমতি নিয়ে লোকদুটো তার ঘরে ঢুকল। উদয়ন ওদের বসতে বলল। বিদেশি পারফিউমের অস্তিত্ব টের পেল না।

চেয়ারে বসে একজন বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট বের করে উদয়নের দিকে এগিয়ে ধরলে সে বিনীতভাবে না বলল।

লোকটা সিগারেট ধরাল কিন্তু সঙ্গীকে দিল না। তারপর হাসল, আমার নাম এম পি তেওয়ারি। শিলিগুড়িতে আমার ব্যবসা। আজ এদিকে এসেছিলাম কয়েকটা কাজে। আমি আপনার সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই।'

'কি বিষয়ে।'

'দেখুন ম্যানেজারবাবু, আমি জানি দিনকাল খুব টাফ হয়ে গেছে। চা বাগানে সাপ্লাই করলে যে পয়সা পাওয়া যায় তা আমার দরকার নেই। আমি আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই। ভদ্রলোকের চুক্তি।'

'আর একটু পরিষ্কার করুন।' উদয়ন বলল।

'আপনার চা বাগানের বাইরে সরকারি জমিতে যে ধাবাটা হয়েছে আমি তার মালিক। শুনতে পেলাম আপনি চাইছিলেন না ওখানে ধাবা হোক। এর আগে পুলিশ বি. ডি. ও

www.boiRboi.blogspot.com

সাহেব সব জায়গায় আপনার অপছন্দের কথা জানিয়ে এসেছেন। আর আজ আপনার অভিযোগ পেয়ে পুলিশ হামলা করল। চোখ বন্ধ করে লোকটা বলল, 'আসুন, আমরা একটা চুক্তি করি যাতে কেউ কাউকে ঝামেলায় না ফেলি।'

'অসম্ভব। আমি আপনার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই প্রস্তাব নিয়ে আপনি আমার কাছে আসার সাহস পেলেন কি করে?' উদয়ন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

'প্রস্তাব খারাপ লাগছে আপনার?'

'আপনি এখন যেতে পারেন। আমি ব্যস্ত আছি।'

'ম্যানেজারবাবু, রাগের মাথায় আপনি আমায় অপমান করছেন? আমি কিন্তু এখনও শান্ত আছি। মাসে আপনাকে দু হাজার দিলে চলবে। ওপেনলি কথা বলুন।'

আর পারল না উদয়ন। সে এমন চিৎকার শুরু করল যে অফিসের অন্য লোকজন ছুটে এল। যাওয়ার আগে লোকদুটো উদয়নকে শাসিয়ে গেল এর ফল ভাল হবে না। পুলিশ তাদের ক্ষতি করবে না কখনও। কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা উদয়নকে ছাড়বে না।

অরুণিমা দেখল বাংলোর গেটের সামনে দুটি মেয়ে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণ শ্রমিকদের পরিবারের কেউ চট করে এখনও গেট খুলে ঢুকতে সাহস পায় না। এখনও ম্যানেজার এবং সাধারণ শ্রমিক কয়েক লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করে। অরুণিমার মনে হল এই মেয়েদুটোকে সে আগে দেখেছে। একজনকে তো বটেই। ওর ফিগার অনেকের মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়ে।

অলস পায়ে অরুণিমা গেটের কাছে চলে এল। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে তোরা? কি নাম?'

সঙ্গে সঙ্গে দুজন হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে। অরুণিমা ভেবে পায় না সীমিত জীবনে থেকেও এত হাসি এরা কি করে হাসে।

'আমার নাম বাঁশি আর ওর নাম সেবা।'

'বাঃ, খুব সুন্দর নাম তো! আমাকে কিছু বলবি?'

'হুঁ।' বাঁশি মাথা নাড়ল।

'বল্।'

'আচ্ছা, সেবা জানতে চাইছে, এই তুই বল না।' বাঁশি ঠেলল সেবাকে।

'তুই বল।' সেবা হাসল।

'না, তোর কথা তুই বল।'

অরুণিমা অপেক্ষা করল, 'ঠিক আছে তুমিই বল।'

লম্বা সুন্দর মেয়েটাকে সে চট করে তুই বলতে পারল না।

সেবা এবার লাজুক মুখে বলল, 'ওই সিনেমার নায়িকারা যে পোশাক পরে তা কোথায় কিনতে পাওয়া যায়?'

অবাক হয়ে গেল অরুণিমা। তাকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে বাঁশি ব্যাখ্যা করল, 'ওই যে, হেমা মালিনী পরেছিল!'

'আমি তো জানি না হেমা মালিনী কি পরেছিল। কিন্তু সেটা জেনে তোদের কি হবে? তোরা পরবি নাকি?'

বাঁশি বলল, 'সেবাকে পরাবো।'

'কেন?'

'ও যে হেমা মালিনীর চেয়ে দেখতে খারাপ না তার প্রমাণ হবে।'

'কার কাছে?' মজা লাগছিল অরুণিমার।

'কার কাছে আবার!' সেবা জবাব দিল, 'আমি কারো জন্যে ওসব পরব নাকি! নিজের জন্যেই পরব।'

কয়েকটা প্রশ্ন করতে ব্যাপারটা জানতে পারল অরুণিমা। ওর একই সঙ্গে মজা এবং দুঃখ লাগছিল। বাঁশি বলল, 'এখানকার ছেলেদের মাথা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে। সবাই হেমা মালিনী রেখার স্বপ্ন দ্যাখে। আমাদের দিকে তাকায় না।'

'সব ছেলের এই অবস্থা?'

'সব ছেলে কেন? সবাইকে কে পাত্তা দিচ্ছে!' সেবা বলল।

'ঠিক আছে। তার নাম বল, আমি সাহেবকে দিয়ে বকুনি দেওয়াবো।'

সঙ্গে সঙ্গে সেবা মাথা নাড়ল, 'না। অন্যকে দিয়ে বাধ্য করে কিছু পেতে আমার মন ভরবে না বাবা। আচ্ছা, তুমি তো অনেক দেখেছ, আমি কি দেখতে ভাল নই?'

অরুণিমা বড় চোখে তাকাল, 'তুমি খুব সুন্দর।'

'তাহলে?' হঠাৎ মেয়েটার চোখে জল এসে গেল।

অরুণিমা তাকে সান্ত্বনা দিল, 'ওরা ঠাট্টা করেছে। এখানে সিনেমার নায়িকারা আসবে নাকি!'

'এসে গেছে।'

'মানে?'

'রোজ রাত্রে ধাবায় তারা আসে।'

'বাজে কথা। ওখানে যারা আসে তারা পয়সা নিয়ে শরীর বেচে।'

'কিন্তু তারাও নায়িকাদের মত পোশাক পরে।'

'ঠিক আছে, আমাকে দুদিন সময় দাও, আমি তোমাকে ওরকম পোশাক আনিয়ে দিচ্ছি।' হেসে ফেলল অরুণিমা।

সেবা খুশী হল, 'দাম কিন্তু আমি দেব। একবারে না পারলে দু তিনবারে।'

ওরা চলে গেলে অরুণিমার মনে হল ধাবাটা চালু করার বিরুদ্ধে গিয়ে উদয়ন বোধহয় ঠিকই করেছিল। এই সুন্দর সরল মেয়েগুলো তাহলে একটু ভাল থাকত।

সন্ধ্যের পর ডেভিড এসে খবর দিল আজ ট্রাকে করে মেয়েরা আসেনি। উদয়ন অবাক হল। যেভাবে ওদের মালিক তাকে শাসিয়ে গেছে তাতে মনে হয়েছিল আজ ওরা আরও দুঃসাহসী হবে। সে থানায় ফোন করল। দারোগাবাবু খবরটা শুনে বললেন, 'যাচ্চলে! এদিকে আমি অন্য থানা থেকে আরও সেপাই এনে আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে আছি।'

'মনে হচ্ছে দুপুরে গিয়ে আপনি ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।'

'হুঁ। তাহলে আজ আপনার কোন অভিযোগ নেই?'

www.boiRboi.blogspot.com

'যদি মেয়েদের দিয়ে পাপব্যবসা না করায় তাহলে আর কি বলার আছে।'

'গুড। আমি ওদের বলে দেব ঝামেলা না বাড়াতে।'

'মানে?'

'ম্যানেজার সাহেব, আমার থানা থেকে ধাবার দূরত্ব কত বলুন। খবর পেয়ে যেতে না যেতেই ওরা হাওয়া হয়ে যাবে। মিছিমিছি পেট্রল পুড়বে, হয়রানি হবে। লুকোচুরি খেলা মশাই।'

উদয়ন রেখে দিল রিসিভার। যে লোকটা তাকে দু হাজারের টোপ দিয়েছিল সে নিশ্চয়ই দারোগাবাবুর কাছে গিয়েছে। অতএব যতই উদয়ন অভিযোগ করুক ওরা রেইড করতে এলে কখনই কোন মেয়েকে স্পটে পাবে না। একমাত্র সে যদি এস পির সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা জানায় তাহলে একটা বিহিত হতে পারে।

রাত এগারটা নাগাদ চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল উদয়নের।

জানলায় দাঁড়িয়ে দেখল চৌকিদার দুজন ছেলেকে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না, আর তারা জেদ করছে বড়সাহেবের সঙ্গে কথা বলবে বলে। অরুণিমার ঘুম ভেঙেছিল। খাট থেকে নেমে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'দুজন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

'এত রাত্রে?'

'হুঁ। সাধারণত এতটা সাহসের কথা নয়।'

অরুণিমা জানলায় এসে দেখার চেষ্টা করল। গেটের কাছে অন্ধকার থাকায় ভাল করে দেখতে পেল না।

উদয়ন চিৎকার করে চৌকিদারকে বলল, 'ওদের বলে দাও কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

উদয়নের গলা পেয়েই ডেভিড চিৎকার করল, 'সাব। উনলোগ আগিয়া।'

'কৌন লোগ?' উদয়ন বিস্মিত।

'হিরোইনলোগ।' ডেভিডের গলা ভেসে এল।

উদয়ন তাকাল অরুণিমার দিকে। 'অরুণিমা জিজ্ঞেস করল, হিরোইন মানে?'

'প্রস্টিটিউটস। ট্রাকে চাপিয়ে সন্ধ্যেবেলায় না এসে মাঝরাত্রে এসেছে। কিরকম অর্গানাইজড ভাবো। চৌকিদার, ওদের ভেতরে আসতে দাও।' হুকুম দিয়ে উদয়ন টেলিফোনের কাছে ছুটে গেল।

অপারেটারকে বলল থানায় দিতে। থানায় অনেকক্ষণ রিঙ হবার পর একজনের গলা পাওয়া গেল, 'হেলো। কারে চাই?'

'থানা?'

'হাঁ, থানা।'

'দারোগাবাবুকে দিন।'

'তিনি কোয়ার্টারে ঘুমাইতেছেন।'

'ওখানে ফোন নেই?'

'না?'

www.boiRboi.blogspot.com

'মেজবাবু আছেন?'

'তার শরীর ঠিক নাই। পেট খারাপ।'

লাইন কেটে দিল উদয়ন। তারপর আবার অপারেটারকে চাইল। অপারেটারের সাড়া পেয়ে বলল, 'আমাকে জলপাইগুড়ি দিন। এস পি।'

'স্যার, জলপাইগুড়ির লাইন খারাপ।'

শব্দ করে রিসিভার রেখে চোখ বন্ধ করল উদয়ন।

বাংলোর সিঁড়িতে ওরা দাঁড়িয়েছিল। অরুণিমা দেখল ওদের। একজনের চেহারা ভাবভঙ্গীতে সিনেমার নায়কের অনুকরণ আছে। এই কি সেবা নামের মেয়েটার আকাঙ্ক্ষার পুরুষ? এইসময় উদয়ন বেরিয়ে এসে হতাশ গলায় বলল, 'হল না। কোন লাভ নেই।'

অরুণিমা বলল, 'তার মনে?'

'থানার সবাই ঘুমাচ্ছে। আজ রাত্রে কাউকে পাওয়া যাবে না।' উদয়ন ছেলে দুটোকে দেখল। ডেভিডের সঙ্গী ছেলেটির মাথায় ব্যান্ডেজ। সে বলল, 'ঠিক আছে। তোরা বাড়িতে ফিরে যা।'

নোয়াম বলল, 'পুলিস নেহি আয়েগা বড়াসাব?'

'আজকে আসবে না।'

ওরা চুপচাপ বাংলো থেকে বেরিয়ে গেল। অন্ধকার চা বাগানে দাঁড়িয়ে নোয়াম বলল, 'পুলিসগুলো বড়াসাহেবের কথাও শুনল না।'

'ঘুমালে কি করে শুনবে।'

'ডেভিড, ওই মেয়েটার মাথা আজ আমি ফাটাবো।'

'কি করে?'

'পাথর মেরে। বদলা নিতেই হবে।'

'এত রাত্রে ওখানে আবার যাবি?'

'নিশ্চয়ই। পুলিস যখন আসবে না তখন আমি বদলা নেবই।'

'দাঁড়া, মাথা গরম করিস না।'

'নেহি! আমার অপমান তোর অপমান না?'

'জরুর। কিন্তু ধর পাথরটা মেয়েটার মাথায় লাগল না। ওরা জানতে পেরে গেল। তখন? তার চেয়ে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

'কেন?'

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। চল, মাংরাকে ডাক। সবাই মিলে ঠিক করে নিই।' ডেভিড হাঁটা শুরু করল।

'কি মতলব?' নোয়াম বুঝতে পারছিল না।

'আমরা যাদের পাব না তাদের এখানে ব্যবসা করতে দেব না। ব্যাস।'

'জরুর। কিন্তু কি ভাবে?'

'একটু ভেবেছি। আর একটু ভাবি।' ডেভিড নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

8—

আজ ঘুম ভেঙেছিল একটু দেরিতে। জিপ নিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে টহল দিয়ে নদী ঘুরে হাইওয়েতে উঠতেই সূর্যদেব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়ে গেলেন। উদয়ন দেখল পাতি তুলতে শ্রমিকরা বাগানে ঢুকে পড়েছে। হাইওয়ে দিয়ে ধাবার কাছে পৌঁছে সে একটাও ট্রাক দেখতে পেল না। মেয়েরা তো থাকবেই না জানা আছে। কিন্তু ধাবার চেহারা আজ গাঁজা খাওয়া বুড়োর মত, ঝিমিয়ে পড়া। সে ধাবা পেরিয়ে যাওয়া মাত্র একটা হৈ হৈ চিৎকার কানে এল। জিপটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে সে পেছনে তাকাল।

ছেলেগুলো নেতৃত্ব নিয়েছিল। চা পাতা তুলতে যারা এসেছিল তারা বটেই, দলের সঙ্গে ভিড়ে থাকা আরও পঞ্চাশেক মানুষ হৈ হৈ করে নেমে পড়ল ফেনসিং পেরিয়ে। ধাবার ভেতর শুয়ে বসে থাকা জনা আটেক মানুষ একেবারে হতভম্ব। মানুষগুলো জলের স্রোতের মত লাফিয়ে পড়ল ধাবার উপর। যেখানে যা ছিল টান মেরে ফেলে দিল। কেউ কেউ মাংসের পাত্র নিয়ে ছুটল চাবাগানের ভেতরে।

ধাবার লোকজন সংবিত পেতেই বাধা দিতে উঠল। কিন্তু ওই ঢলের রুখে দাঁড়াতেই পারল না তারা। প্রাণ বাঁচাতে হাইওয়ে ধরে দৌড়াতে লাগল তারা। মেয়েরা টুকরি ফেল নেমে এসেছিল এপাশে। চালাঘরগুলো ভেঙে পড়ছে একটা পর একটা। যারা মাংস খেতে ইচ্ছে থাকলেও খেতে পারত না এখানে এসে, যারা মেয়েদের দূর থেকে দেখে আঙুল কামড়াতো তারা সবাই একত্রিত হল। আর বাগানের ছেলেদের যেসব চালাঘর নষ্ট করতে পারে সেগুলো ধ্বংস করার আনন্দে মেয়েরা আনন্দিত হল। তাণ্ডব শেষ হলে সমস্ত বাঁশ দরমা পাহাড় করে ওরা তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। যেন একটা পাপের পাহাড়কে পুড়িয়ে দিতে পেরেছে ওরা, এমন ভঙ্গী সবার।

জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। যে কারণে এদের মনে ক্ষোভ জমেছিল তা দূর করে ফেলার আনন্দে সবাই উত্তাল। উদয়নকে দেখে ডেভিড এগিয়ে এল, 'সাহাব, এই জায়গা আমাদের, এই জমি আমাদের, এখানে আমরা কোন অন্যায় কাজ করতে দেব না।'

উদয়ন খুশী হয়েছিল কিন্তু এদের উৎসাহিত করল না। আইন হাতে তুলে নেওয়ার পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সে শুধু বলল, 'আজ তোরা এখানকার ধাবা ভাঙলি কাল ওরা ওপাশে বানাবে।'

মাংরা চিৎকার করল, 'ইস! বানাতে দিলে তো।'

'কি করবি? মারপিট, ওরা পুলিস নিয়ে এসে বলবে তোরা ভেঙেছিস। পুলিসের সঙ্গে মারপিট কেউ করে নাকি?'

হঠাৎ বুধুয়া এগিয়ে এল, এক কাজ করলে হয়। চাবাগানের ওই তারের বেড়াটাকে তুলে যদি ওই পিচের রাস্তার পাশে তুলে আনি তা হলে ওরা কোথায় ধাবা বানাবে। বানাতে হলে আমাদের বাগানের বেড়া ভাঙতে হবে।'

মতলবটা মন্দ লাগল না। উদয়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কতখানি জায়গা এভাবে ঢেকে রাখবি?'

'যতখানি জায়গায় বাগানের পাশে রাস্তা আছে ততখানি।'

'সে তো অনেক জমি।'

লোক ছুটল অন্য শ্রমিকদের ডেকে আনতে। শাবল কোদাল নিয়ে নেমে পড়ল সবাই। রাস্তা পর্যন্ত গায়ে সে বৃক্ষের সারি তার গা ঘঁষে তুলে আনল চা বাগানের ফেন্সিং। উদয়ন ফিরে এল অফিসে। বড়বাবু খবর পেয়ে গেছেন এর মধ্যে। উদয়ন জিপ থেকে নামতে ছুটে এলেন কাছে, 'স্যার, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিংস নেবে না তো?'

উদয়ন জিজ্ঞাসা করল, 'থানা থেকে ফোন করেছিল?'

'না স্যার। যা শুনলাম তা যদি সত্যি হয় তা হলে বাগানের খুব লাভ হয়ে গেল। কতখানি জমি বিনা পয়সায় পাওয়া গেল তার হিসেব করতে হবে।'

'এ জমি পেয়েই বা কি লাভ?' অন্যমনস্ক গলায় বলল উদয়ন।

'কেন স্যার? নাসারি থেকে চা গাছ তুলে নতুন জমিতে লাগিয়ে দিলে আমাদের একটা রাইট তৈরি হয়ে যাবে।'

চমকে উঠল উদয়ন। নতুন জমির অভাবে চাগাছ সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে উৎপাদন একটা বিশেষ সীমায় আটকে থাকছে। কিন্তু এ আকাশফুঁড়ে পাওয়া জমিটা সরকারের। পি ডব্লিউ ডি দেখাশোনা করে। তারা এটা ছাড়বে কেন? বড়বাবুর মাথায় এসব ব্যাপারে ভাল বুদ্ধি খেলে। তিনি বললেন, 'স্যার কয়েকটা কাজ করতে হবে। ওরা দিনে দিনে কাজটা শেষ করুক। আমরা বাগানের তরফ থেকে থানায় একটা ডায়েরি করি এই বলে যে সমাজবিরোধীরা আমাদের বাগানের পাশের জায়গায় হামলা করেছে বলে আমরা জমিটা আপাতত ঘিরে রাখছি নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে।'

'দারোগা এই ডায়েরি নেবে ভেবেছেন?'

'এস আই নেবে? উনি যে কবিরাজের ওষুধ খান আমিও তাঁর কাছে যাই। আমার সঙ্গে ওই লেবেলে ভাব আছে।'

'ঠিক আছে দেখুন। আমি একটু বিডিওর সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'হ্যাঁ স্যার। আর একটা অর্ডার দিতে হবে।'

'কি?'

'সন্ধ্যে নামতেই জমিতে কোদাল ফেলতে হবে। গাছগুলো ভোরের মধ্যে লাগাতে হবে। এজন্যে ওভারটাইম যদি দেন—।'

'যে কোন বাড়তি খরচের জন্যে হেড অফিসে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কেন ওভারটাইম তার ব্যাখ্যা করতে বিস্তারিত জানাতে হবে। যদি জমি আবার ফেরৎ দিয়ে দিতে হয় তা হলে এম ডি ছেড়ে দেবেন না তাকে। কিন্তু ঝুঁকি নিল উদয়ন।

অফিসে ঢুকে সে অপারেটারকে বলল বিডিওকে লাইন দিতে। ভাগ্য ভাল লাইন এবং ভদ্রলোককে পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। উদয়ন বলল, 'নমস্কার। আমি উদয়ন বলছি।'

'হ্যাঁ বলুন। এনি মোর প্রোব্লেম?'

'আপনাকে বলেছিলাম ওরা চালাঘর তৈরি করেছে আপনার জমিতে। সেই ঘরে প্রস্টিটিউট এসে ব্যবসা করেছে।'

'সেকি? মাই গড!'

'আমাদের বাগানের শ্রমিকেরা এই অনাচার সহ্য করেনি। ওরা কাউকে না মেরে ঘরগুলো তুলে দিয়েছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বেশ করেছে। ঠিক করেছে।'

'এখন সমস্যা হল আপনার পক্ষে কি পি ডব্লিউ ডির জমি পাহারা দেওয়া সম্ভব? আবার ওরা ফিরে আসতে পারে। জমি খালি পেলেই ব্যবসা শুরু করে দেবে। তখন কিন্তু দাঙ্গা লেগে যাওয়া অসম্ভব নয়। শ্রমিকরা যেভাবে ক্ষেপে আছে!'

'অসম্ভব? আমার পক্ষে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তা হলে? দাঙ্গা লাগবেই।'

'বলছেন?'

'হ্যাঁ। এখন অবশ্য ওরা জমিটাকে ঘিরে রেখেছে কিন্তু ঘেরা সরিয়ে দিলে—।'

'সরাবে কেন থাক না।'

'কি বলছেন। বেআইনি ভাবে দখল হবে না?'

'আর বেআইনি। সারা দেশটাতেই বেআইনি দখল চলছে। তা ছাড়া ওই জায়গা থেকে সরকারের কোন রেভিন্যু পাওয়ার চান্স নেই। বিক্রী করলেও কেউ নেবে না। আমি কথা বলে দেখি আপনাদের লিজ দেওয়া যায় কি না। আপনি ওটা আপাতত ঘেরাও-এর ব্যবস্থা করুন।

উদয়ন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমি আপনকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।'

দুপুরে পুলিস বাহিনী এসেছিল। বাহিনীতে সেই এস আই আর তিনজন সেপাই ছিলেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন দারোগাবাবু। তাঁরা এসে দেখলেন কয়েকশ মানুষ মাইল খানেক জায়গা জুড়ে কাজ করছে। তারা চাবাগানের তারের বেড়াকে তুলে আনছে রাস্তার গায়ের গাছ পর্যন্ত। এখন আর এদিকে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ধাবা তৈরি করা সম্ভব। পাঁচজন নিরীহ পুলিসের পক্ষে এই জনতার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। দারোগাবাবু ফিরে গিয়ে আরও পুলিসের জন্যে ওপরতলায় আবেদন জানালেন। তাঁর ওপর যে চাপ আসছিল তা তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ধাবার ম্যানেজারকে তিনি কথা দিয়ে ফেললেন কাল সকালেই তিনি ওর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। হ্যাঁ, এইসব কাজ শ্রমিকদের দিয়ে করিয়ে আইন ভঙ্গ করেছেন বলে ম্যানেজার উদয়নকে অ্যারেস্ট করানো যায়। কিন্তু তাতে ঝামেলা আরও বাড়বে। উদয়নের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

পরদিন সকালে একটু বড়সড় বাহিনী নিয়ে গিয়ে দারোগাবাবু হতভম্ব। কে বলবে জায়গাটা খালি এবং ঢাল হয়ে পড়েছিল গতকাল পর্যন্ত। সেখানে এখন ছোট ছোট চাগাছ বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে। এত চাগাছ রাতারাতি লাগিয়ে ফেলা হয়েছে যা উপড়ে ফেলার ক্ষমতা দারোগাবাবুর নেই। কোর্ট থেকে হুকুম আনিয়ে করতে হবে বলে তিনি ছুটলেন বিডিও-র কাছে। বিডিও তাঁকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করলেন। বললেন, সমস্ত ব্যাপারটা তিনি খতিয়ে দেখছেন।

দারোগাবাবু বোঝাতে চাইলেন বেশী দেরি হলে চাগাছগুলো মাটিতে চেপে বসবে। তাদের শেকড়গুলো চারা পেয়ে যাবে। তরুণ বিডিও কোন জবাব দিলেন না। চোর ছ্যাঁচড় ডাকাত ধরার জন্যে পুলিস আছে। কিন্তু দাঙ্গা থামাতে হবে তাকে। থামাবার

চেয়ে সেটা শুরু করতে না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি বোকামি করতে রাজী নন।

হতাশ দারোগাবাবু ধাবার ম্যানেজারকে পরামর্শ দেন আর একটু এগিয়ে যেতে। ওই চাবাগানই শেষ সীমা নয়। মাইল পনের এগোলে আর একটা চাবাগানের শুরু। সেখানে নতুন করে ধাবা খুলতে।

কলকাতা থেকে এম ডি তাঁর হঠাৎ সফরে চাবাগানে এসেছেন। একটু আগে তিনি উদয়নকে নিয়ে নতুন পাওয়া জমির চাষবাস দেখে এসেছেন। এই পরিমাণ জমি কিনতে কোম্পানির যত টাকা লাগত তার হিসেব উদয়নের কাছে আছে। যে পরিমাণ চায়ের পাতা পাওয়া যাবে প্রতি বছর সেটাও।

এম ডি বললেন, 'তুমি খুব ঝুঁকি নিয়েছ উদয়ন। হাউএভার, এতে কোম্পানির শেষ পর্যন্ত লাভ হবে। সমস্ত শ্রমিকদের একদিনের মাইনে বোনাস হিসেবে কোম্পানি দেবে। আর যেসব ছেলেরা নেতৃত্বে ছিল তাদের তিন দিনের মাইনে কোম্পানি উপহার হিসেবে দিচ্ছে। তোমারটা আমরা একটু ভেবে জানাচ্ছি। আই অ্যাম হ্যাপি।'

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কোম্পানি বোনাস দিয়েছে আচমকা। সবাই খুব খুশী। উদয়ন ভেবেছিল ধাবার মালিক এবার প্রতিশোধ নেবে। অরুণিমা খুব ভয় পেয়েছিল। কিন্তু কিছুই হল না। তার কাছে খবর এল আবার চালু হয়েছে দূরের বাগানের গায়ে হাইওয়ের পাশে। সেই বাগান অন্য কোম্পানির এবং তারা যদি আপত্তি না করে তা হলে তার কি!

বোনাস দেবার দিন প্রেমনাথ এল নতুন ছবি নিয়ে। হাতে হঠাৎ পাওয়া টাকায় ডগমগে ডেভিডরা ছুটল প্রেমনাথের কাছে। দু বোতল ভুটানি এখনই তারা এনে দেবে যদি সে মিস পামেলাকে দেখায়। প্রেমনাথ ক্ষেপে গেল। সে আর ঝুঁকি নেবে না। দু বোতলের লোভে কাজটা হারাতে রাজী নয় সে। এবার সংসার নামের পারিবারিক ছবি এনেছে যা সবাই একসঙ্গে দেখতে পারবে।

মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল চার বন্ধুর। সিনেমা শুরুর আগে ওরা অবাক হয়ে দেখল বাঁশি আর সেবা আসছে। সেবার পরনে নায়িকাদের ধরনে শাড়ি পরা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। মেয়ে দুটো ওদের দিকে তাকাল না একবারও। মাংরা বলল, 'আপ বাপ, একদম অন্যরম দেখাচ্ছে।'

বুধুয়া বলল, 'মেয়েটা দেখতে খারাপ না।'

নোয়াম বলল, 'একটু জিনাত জিনাত ভাব আছে।'

ডেভিড বলল, 'ভ্যাট। কাল সকালে পাতি তোলার সময় দেখবি আবার আগের মত হয়ে গেছে। চল দারু খাব।'

'সিনেমা দেখবি না?'

'সিনেমা কে দেখবে? ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ।'

খুব একটা ইচ্ছে না থাকলেও বাকি তিনজন সিনেমা ছেড়ে রওনা হল। নোয়াম বলল, 'এতগুলো টাকা হঠাৎ পেয়ে খুব ভাল হল। ধার শোধ করা যাবে।'

বুধুয়া বলল, 'আমার একটা কম্বল নেই? এই টাকায় কম্বল কিনব। লাইনের হাঁড়িয়ার

www.boiRboi.blogspot.com

আড্ডায় ওরা বসে গেল।'

ডেভিড চুপচাপ হাঁড়িয়ায় চুমুক দিচ্ছিল। হঠাৎ বলল, 'তোদের ইজ্জত বলে কিছু নেই? সেই মেয়েটা টাকা নেই বলে আমাকে অপমান করল, আমাকে অপমান মানে তোদের না?

মাংরা বলল, 'জরুর।'

ডেভিড চেঁচালো, 'তা হলে কম্বল কেনার কথা ভাবিস কি করে?'

মাংরা বলল, 'ওই চিড়িয়া তো উড়ে গেছে। আমরাই তাড়িয়ে দিয়েছি।'

নোয়াম বলল, 'উড়ে গিয়ে বসেছে, পঞ্চাশ মাইল দূরে, লামডিং চা বাগানের গায়ে। ওখানে ধাবা হয়েছে।'

মাংরা বলল, 'আর স্বপ্ন কি রানী আয়েগী তু। শালীকে ঠিক রেখার মত দেখতে।'

বুধুয়া বলল, 'পাশের মেয়েটাকে হেমার মত ।'

নোয়াম হাসল খুক খুক করে, 'ওখানে হেমা রেখা জিনাত সব ছমছমাছম দাঁড়িয়ে থাকত। আর আমাদের বাগানে যেন ফ্যামিলি সিনেমার মেয়ে বউ। সংসার।'

মাংরা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আজ সেবাকে দেখেছিস? উহঃ! দারুণ।'

ডেভিডের গলা শক্ত হল, 'কি রকম দারুণ। রেখার চেয়েও?'

'না গুরু। রেখার পাউডার ড্রেশ হাসি সেবা কোথায় পাবে।'

'আমি রেখার কাছে যাব। এখনই। কেউ সঙ্গে যেতে চাও?' ডেভিডও উঠে দাঁড়াল। বুধুয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'পঞ্চাশ মাইল?'

'ছোড়! টেম্পো ভাড়া করব হাসিমারা গিয়ে। তারপর টেম্পোতে বসে গান গাইতে গাইতে যাব। মুখের ওপর পঞ্চাশ টাকা ছুঁড়ে বলব, নাচ রেখা নাচ, কাপড়া খুলে নাচ!' ডেভিড হাঁটতে আরম্ভ করল।

দৃশ্যটা কল্পনাতেই এতটা রঙিন যে অন্য তিনজন তাকে অনুসরণ করল। ওদের শরীরগুলো যেন আরও লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। বিরাট বিরাট পা ফেলে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। দূরে ফ্যাক্টরির সামনে প্রেমনাথ সিনেমা দেখাচ্ছে তখন।

হঠাৎ বুধুয়া মতলব দিল। হাসিমারা পর্যন্ত যেতে হবে কেন, প্রেমনাথ যে ভ্যানটা নিয়ে এসেছে সেটাকে ভাড়া করলেই তো হয়। ড্রাইভার তো কাল সকালে প্রেমনাথ আর তার মেশিনপত্র নিয়ে অন্য বাগানে যাবে।

লোকটিকে খুঁজে বের করল ওরা। প্রথমে আপত্তি করেছিল ড্রাইভার। প্রেমনাথের ভাড়া করা গাড়ি। তার অনুমতি ছাড়া সে যেতে পারবে না। ওরা টাকা দেবে বলল। প্রেমনাথের জন্যে ভুটানের মদ কিনতে যাচ্ছে তাই গাড়ি দরকার। মদের লোভে লোকটা রাজী হয়ে গেল।

ভ্যানটা ওদের নিয়ে বের হল। ডেভিড সতর্ক করে দিয়েছে কেউ যেন চেঁচামেচি না করে। হঠাৎ ওরা ভ্যানের আলোয় চাবাগানের মুখে দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিতেই ডেভিড গলা তুলল, এই, এখানে কি করছিস?'

সেবা হাসল, 'কাঁহা যাতিস রে?'

ডেভিড গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 'রেখার কাছে।'

সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিনজন তিনটে নায়িকার নাম উচ্চারণ করল। ড্রাইভার হেসে বলল, 'মাতাল হয়ে গিয়েছে। ভুটানি আনতে যাচ্ছে।'

বাঁশি সেবারা হাত ধরে টানল। 'চল সেবা, সিনেমা দেখি।'

ডেভিড বলল, 'হ্যাঁ, যাও সিনেমা দ্যাখ? সংসার।'

মাংরা হেসে উঠল, 'ঘরকা মুরগি ডাল বরাবর।'

বাকিরা গলা তুলে হাসতেই সেবা রাগত পায়ে ফিরে গেল। তার সঙ্গে যেতে যেতে বাঁশি চিৎকার করল, 'বুড়বক।'

দূর থেকেই আলো এবং জেনারেটারের শব্দ হদিশ দিল ওরা ঠিক জায়গায় এসেছে। মাঝখানে দুটো ঝামেলা হয়েছে। ড্রাইভার এতদূরে আসতে চায়নি। হাসিমারা অনেক কাছে, সেখানে অঢেল ভুটানি পাওয়া যায়। এরা লোকটাকে লোভ ভয় সব দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। মাংরা বলেছিল ওরা যদি চিনতে পারে। যারা ওদের ধাবা ভেঙেছে তাদের সামনে দেখলে যদি মারপিট করে! এটা কারও মাথায় ছিল না। কিন্তু হাড়িয়ার প্রতিক্রিয়া ওদের একটু একটু করে সাহসী করে তুলল। সকালে ধাবা ভাঙার সময় একবার দেখেই যেসব কর্মচারি চিনতে পারবে তার এখন নাও থাকতে পারে। তা ছাড়া ভ্যানে চেপে অতদূরে ওরা যাবে তা ভাবতে পারবে না। পুরো রাস্তার অনেকটাই ওরা গান গাইছিল কোরাসে। ভ্যান গিয়ে থামল ধাবার সামনে।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে হ্যারিকেন হাতে। ভ্যান থেকে নামতেই একটা নতুন লোক এগিয়ে এল, 'দিশি বিলিতি মাল মিলেগা, খানা যে চাহিয়ে।'

ডেভিড হুকুম দিল, 'একপ্লেট কষা মাংস আউর দো চাপাটি।'

লোকটা মেয়েদের দেখাল, 'হিরোইনসে ভি আচ্ছা হ্যায়।'

ডেভিড মাথা নাড়ল। তারপর বড় বড় পা ফেলে কোণার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে লণ্ঠন হাতে রেখা দাঁড়িয়ে মোহিনী হাসি হাসছে। ডেভিডকে চিনতেই পারল না সে। বলল, 'শ' রুপিয়া।'

হকচকিয়ে গেল ডেভিড, 'কেন? পঞ্চাশ ছিল না?'

রেখা চোখ নাচল, 'আগে ছিল। মালিকের লস হয়েছে বলে এখন একশ রেট। 'ফেল কড়ি মাখ তেল আমি কি তোমার পর?'

ভ্যানের ভাড়া, খাবারের দাম মিটিয়ে পকেটে সত্তর থাকার কথা। সে মিনতি করল, 'সত্তর দেব!'

রেখা লণ্ঠন নামাল নিচে। 'যাও, যাও, আগে যাও।'

আগে? পরের মেয়েটাকে হেমার মত দেখতে। এসব সংলাপ তার কানেও পৌঁছেছিল। ডেভিডকে এগোতে দেখে সে হেসে উঠল, 'যাও যাও আগে দ্যাখো।'

প্রচণ্ড রেগে ডেভিড বন্ধুদের কাছে চলে এল, 'ইনলোগ শ' রুপয়া মাংতা।'

'ব্যাপস।' মাংরা বলে উঠল, 'খানাকো দাম ভি জাদা।'

'তোরা আমাকে টাকা দিবি ?'

'বাঃ, তোকে দিলে আমাদের কি থাকবে? আমরা যাব না?'

খাবার এসে গেল। প্লেট হাতে ওরা দেখল নতুন আসা ড্রাইভাররা ঢুকে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দে

www.boiRboi.blogspot.com

এক এক ঘরে। মাংস মুখে দিতেই শরীর গুলিয়ে উঠল ডেভিডের। সে উঠে দাঁড়াল।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল? খাবি না?'

ডেভিড মাথা নাড়ল।

মাংরা হাসল, 'আরে বাবা, খেয়ে নে। খেতে খেতে সিনেমা দ্যাখ।'

সিনেমা দ্যাখ! ডেভিড দেখল রেখার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সিনেমার পর্দায় নায়িকারা যেমন নেচে যায় শাস্য ঝরিয়ে তেমনি বাকিরা নিজেদের লোভনীয় দেখাতে শরীর নাচাচ্ছে।

বুধুয়া বলল, 'সিনেমাতেও সংসার হয়।' সে হাড় চিবাচ্ছিল।

ডেভিড চাপা গলায় বলল, 'বুড়বক।'

মাংরা বলল, 'যাঁচ্ছলে। তুই বাঁশির কথাটাই বললি?'

ডেভিড বন্ধুদের দিকে তাকাল। পরমানন্দে ওরা খাবার খেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হল এখন এই মুহূর্তে সে যদি এসব ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারত। এই ধাবা, ওই হিরোইনদের ঘর, বন্ধুদের খাবারের প্লেট—সব। মধ্যরাতের রাজপথে সে উদ্‌ভ্রান্ত রাখালের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মেঘবালকের সমুদ্রযাত্রা

সনহনিয়ে হাঁটছিল স্বপ্নেন্দু। রাস্তায় হাঁটলেই তার মনে গান আসে। সে যখন শিশু ছিল তখন হেমন্ত-সন্ধ্যা-শ্যামল যেসব দারুণ গান গেয়ে গেছেন সেগুলো হুড়মুড়িয়ে আসে। যখন শিশু ছিল ভাবতেই দাঁড়িয়ে গেল স্বপ্নেন্দু। গালে হাত বোলাল, আজ সকালে দাড়ি কামানো হয়নি? কি আশ্চর্য! গালে খোঁচা দাড়ি থাকলে স্বপ্ন দেখা যায় না। হয় চকচকে গাল নয় অনেককাল ধরে লালিত দাড়ি যার ঔদ্ধত্য চলে গিয়েছে, হাত বোলালেই মাথা নোয়ায় সেইরকম দাড়ি থাকলে স্বপ্নরা দল বেঁধে চলে আসে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের দাড়ি তৈরি করতে সময় লাগে অনেক এবং তদ্দিন স্বপ্ন ছাড়া বেঁচে থাকা স্বপ্নেন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু এখন মনে হল সে যখন শিশু ছিল তখন কি রকম আচরণ করত? ভাবা যায়? এর কোলে ওর কোলে তার এত বড় শরীরটা ছোট্টটি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কেউ কি তাকে ঘুমাপাড়ানি গান শোনাত? সেটাই তো মানুষকে প্রথম স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে। এখন মধ্যরাত্রে কলকাতার একটি পনেরো ফুট রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বপ্নেন্দু অনায়াসে একটি সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুকে দেখতে পেল। টলটলে পায়ে হাঁটছে। হঠাৎ একটা ট্যাক্সির আলো এবং হর্ন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় স্বপ্নেন্দু সরে দাঁড়াল ফুটপাতে এবং শিশুটি উধাও হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে একলা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্বপ্নেন্দু মাথা দোলাল। সাবাস। ইশ্বরের মতো বড় পরিচালক কেউ নেই। ভদ্রলোক যদি ফিল্ম করতেন। এই যে ট্যাক্সিটাকে ইন করিয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন, তুলনা নেই।

স্বপ্নেন্দু আবার হাঁটতে শুরু করেছিল। আজ একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে তার ছোট্ট ঘর থেকে সে আজ বের হতে চায়নি। সারাটা দিন ইউলিসিস পড়েছে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছে, আবার পড়ার চেষ্টা করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। ঘর থেকে বের হয়নি বলে চা জলখাবার ভাত কিছুই খাওয়া হয়নি। সন্ধের পর বাইরে বেরিয়ে মনে হয়েছিল পৃথিবীটা এখনও সুন্দর। আকাশ কী নীল! ওরকম একটা বই না পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে অনেক অনেক কিছু জানা যায়। ঠাকুরের দোকান থেকে রুটি আলুরদম খেয়ে সে দেশবন্ধু পার্কে ঢুকেছিল। ফুরফুরে হাওয়া বইছিল বলে সে ঘাসের ওপর শরীর বিছিয়ে দিয়ে আকাশ দেখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে জানে না। এরকম স্বপ্নহীন ঘুম অত্যন্ত বিরক্তিকর। তাই দারোয়ান গোছের একটা লোক তাকে তুলে দিতেই সে হাঁটতে শুরু করেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

বাড়িটা পেরিয়ে যাওয়ার পর খেয়াল হল সন্দীপনবাবু এখানে থাকেন। বাংলা নাট্য আন্দোলনের অন্যতম নেতা, পৃথিবীর অনেক নাট্যশাস্ত্র গুলে খাওয়া বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা সন্দীপনবাবুর সঙ্গে তার আলাপ আছে। আকাদেমি গিরিশে ছাড়াও এই বাড়িতে এসে অনেক জ্ঞানের কথা শুনে গেছে সে। আসলে পণ্ডিতজনদের সঙ্গে সময় কাটালে পরিধি জ্ঞানের হু হু করে বেড়ে যায়।

স্বপ্নেন্দু বেল টিপল। প্রথমবার আলতো, পরের বার বেশ জোরে। যেন সমস্ত পাড়া জুড়ে সাইরেন বেজে উঠল। দোতলার জানলায় একটি বিস্মিত মুখ ঘুম জড়ানো গলায় জানতে চাইল কে এসেছে? মুখটি মহিলার। মাঝরাতে ঘুমভাঙা মহিলার মুখ কখনওই সুন্দর হতে পারে না।

'সন্দীপনদা আছেন?'

মহিলার মুখ সরে গেল। প্রায় পঞ্চাশ সেকেন্ড বাদে সন্দীপন এলেন। যে বাচনভঙ্গির জন্যে তিনি বিখ্যাত সেটি এখন উধাও, 'কি ব্যাপার?'

'দরজাটা খুলুন। একটু জরুরি।' ওপরের দিকে মুখ করে বলল স্বপ্নেন্দু।

খানিকবাদেই একতলার দরজা খুলে সন্দীপন দাঁড়ালেন, 'কী হয়েছে? কে—?'

'কে মানে?'

'ও, এত রাত্রে এসেছেন, তাই আশঙ্কা হল—।'

'না, না।' ভেতরে ঢুকে পড়ল স্বপ্নেন্দু। সন্দীপনের সরে জায়গা দেবার তেমন ইচ্ছে ছিল না বোঝা গেল কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করতে পারলেন না। ভেতরে ঢুকে স্বপ্নেন্দু বলল, 'একটু আগে খেয়াল হল আজ সারাদিন স্নান হয়নি। মনে হতেই সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করে উঠল। বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হলে অনেক হাঁটতে হবে। আপনার বাড়িটা সামনে দেখে ভাবলাম একটু স্নান করে যাই। বাথরুমটা কোথায়?'

সন্দীপনের চোয়াল ঝুলে গেল। তিনি কোনও মতে বলতে পারলেন, 'রাত একটার সময় আপনার স্নানের কথা মনে হল?'

স্বপ্নেন্দু দেখল সিঁড়ির মাঝামাঝি ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন রাতের পোশাক পরা যে মহিলা তিনি এর মধ্যেই চুলে চিরুনি বুলিয়ে নিয়েছেন। সন্দীপনের নাটকে ইনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। অন্তত কুড়ি বছরের বড় প্রতিভাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে ইনি গ্রুপ থিয়েটারের অনেকের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনেছেন সকৌতুকে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কি করব বলুন! আগে মনে এলে আপনাকে বিব্রত করতাম না। স্নান করতে আমার বেশি সময় লাগে না। পিসিমা বলতেন পাখির স্নান।'

সন্দীপন বললেন, 'এ বাড়ির বাথরুম দোতলায়। বুঝতেই পারছেন, এত রাত্তিরে, এমনি হাতমুখ ধুয়ে নিলে যদি চলে তাহলে নীচের টয়লেটে বেসিন আছে, ব্যবহার করতে পারেন।'

এই সময় মহিলা বললেন, 'স্নানের আরাম কি হাতমুখ ধুয়ে পাওয়া যায়! আপনি ওপরে আসুন। বেশি সময় তো লাগছে না।'

মহিলা ওপরে উঠতেই স্বপ্নেন্দু তাঁকে অনুসরণ করল। সন্দীপন দরজা বন্ধ করে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তার পেছনে আসছিল। স্বপ্নেন্দু ভাবল, আমরা যখন কোনও বিদেশি

www.boiRboi.blogspot.com

নাটকের অনুবাদ করি তখন এই ব্যাপারটা মাথায় রাখি না। একজন জার্মান মহিলা কখনওই তার নিজস্ব বাথরুমে প্রায় অজানা অতিথিকে নিয়ে যাবে না। কিন্তু একজন বাঙালি মহিলার হৃদয় অনেক বেশি দরাজ।

দোতলায় উঠে হাত প্রসারিত করে যেভাবে মহিলা বাথরুমের দরজা দেখিয়ে দিলেন তাতে রক্তকরবীর তৃপ্তি মিত্রকে মনে পড়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। নন্দিনীবেশে তিনি ঠিক ওই ভঙ্গিতে একটি সংলাপ বলেছেন। সংলাপ কি যেন?

বাথরুমে ঢুকে গেল। বেশ ছিমছাম সুগন্ধী বাথরুম। আরাম করে স্নান করল। গরমকালের মাঝরাতে মাথায় জল পড়ছে ঝরনা হয়ে। কত রকমের শিশি সামনে সাজানো। শ্যাম্পুই সাত রকমের। এসব সন্দীপনদা ব্যবহার করে?

তোয়ালেতে শরীর মুছে জামাপ্যান্ট পরে চুল আঁচড়ে মনে পড়ল, যাঃ, দাড়ি কামানো হয়নি। আবার খোঁজাখুজি শুরু করল। সন্দীপনদার বস্তুগুলো পেয়ে নতুন ব্লেড লাগাল। দাড়ি কেটে মুখ ধুয়ে আবার চিরুনি চালাতে হল চুলে। এই মুহূর্তে কলকাতায় যদি কোনও রাজপুত্র থাকে তাহলে তার নাম স্বপ্নেন্দু রায়।

বাথরুমের দরজা খুলতেই দেখতে পেল ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় যে ভঙ্গিতে দেখে গিয়েছিল তার হেরফের তেমন হয়নি।

বলল, 'কী ভালই না লাগছে। দাড়িটাও কামিয়ে নিলাম। না, ভাববেন না, আমি নতুন ব্লেড ব্যবহার করেছি।'

'এরপর?' মহিলা আলতো প্রশ্নটা করলেন।

'এরপর চা চাইলে আপনার অসুবিধে হতে বাধ্য। মাঝ রাত্রে ঘুম থেকে উঠিয়ে চা চাইতে খুব খারাপ লাগবে আমার। স্নান না করে পারিনি। গায়ে ঘামের গন্ধ থাকলে মনে স্বপ্ন আসতে পারে না, একথা নিশ্চয়ই মানবেন।'

'স্বপ্নেন্দু, এখন আমার শুয়ে পড়া দরকার।' সন্দীপনদা বললেন।

'আরে! আপনি কেন দাঁড়িয়ে আছেন? শুয়ে পড়ুন না।' মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবে জল চাইলে আপনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না?'

'ইটস টু ম্যাচ! তুমি ভেবেছ কি? মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে স্নান করলে দাড়ি কামালে আবার জল চাইছ! রসিকতার একটা সীমা আছে।' বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন সন্দীপনদা।

ইতিমধ্যে জল এসে গেল। স্বপ্নেন্দু চেষ্টা করল তৃপ্তির সঙ্গে জল খেতে। গ্লাস দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা পান খান না?'

'না।' মহিলা হেসে ফেললেন।

'এখন জমিয়ে এক কাপ চা আর পান খেতে যা ভাল লাগত।'

মহিলা সন্দীপনদার দিকে তাকালেন, 'তুমি যাও, শুয়ে পড়ো। এখন আমার চট করে ঘুম আসবে না। এঁকে এক কাপ চা করে দিচ্ছি। আপনি নীচে গিয়ে বসুন, আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।'

সন্দীপনদা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মহিলা তাঁকে চোখ নাচিয়ে নিরস্ত করলেন। সন্দীপনদা সেটা মেনে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই নীচে নামতে লাগল স্বপ্নেন্দু।

শরৎচন্দ্রকে যেসব উচ্চিঙ্গে লেখক গালাগাল দেন তারা এই দৃশ্যটি দেখুন। বঙ্গললনাদের চচ্চড়ি পাকিয়ে খেয়ে নিয়েছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু সিঁড়ির মাঝামাঝি যেতেই নিজের নামটা কানে গেল তার এবং সে পেছন ফিরল। বারান্দায় কেউ নেই কিন্তু শোওয়ার ঘর থেকে সংলাপ ভেসে আসছে চাপা গলায়, 'তুমি বুঝতে পারছ না, এসবই ভান। একদল অসফল লোক এইসব করে নিজেদের আঁতেল বলে প্রমাণ করতে চায়। যেখানে আমার দরজা খোলাই ভুল হয়েছিল সেখানে তুমি চা খাওয়াচ্ছ! রাবিশ!'

মহিলা বললেন, 'আস্তে কথা বলো। তুমি যা বললে তার সবটাই হয়তো ঠিক।'

'হয়তো নয়, নিশ্চয়ই। আজ পর্যন্ত একটা প্রোডাকশন নামাতে পারেনি, না নাটক না ফিল্ম। অথচ যত নাট্য আন্দোলন আর ফিল্ম সোসাইটির মিটিংয়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। কারণ মিনিস্টার ওকে পছন্দ করেন। শূন্য কুঁজো।'

'তাও ঠিক। কিন্তু তুমি একথা ভাবছ না কেন, পশ্চিমবাংলার নাটকের জগতে তোমার একটা আলাদা জায়গা আছে। তুমি মাটি থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের উঠে আসতে বলো। তুমি নাটক করো বুর্জোয়া শ্রেণীব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে। তোমার যে ছবি তৈরি হয়েছে তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার। মাঝ রাত্রে একটা লোক চা চেয়েছিল বলে তুমি বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছ এই খবর চাউর হলে লোকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা না করেই ছি ছি ছি শুরু করবে। প্লিজ, লক্ষ্মীটি, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি চা খাইয়ে বিদায় করে চলে আসছি।'

স্বপ্নেন্দু নেমে এল। সোফায় বসে ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। সত্যি, এরকম বিপাকে সন্দীপনদা পড়বেন জানলে সে কখনওই এ বাড়িতে আসত না। আসলে মানুষ যা বলে, মঞ্চে করে দেখায় তার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের এত পার্থক্য থাকবে কেন? বয়সে অনেক ছোট এক সুন্দরীকে বিয়ে করলেন সন্দীপনদা, মেনে নিতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি। অথচ আকাদেমি নন্দন চত্বরে এ নিয়ে হাসাহাসি হয়েছে কত। তখন তীব্র প্রতিবাদ করেছে স্বপ্নেন্দু। প্রতিভার বয়স হয় না। রবিশংকরের হয়নি, চ্যাপলিনেরও নয়, সন্দীপনদারই বা হবে কেন? তারপরে যখন 'কৃষ্ণচূড়ার রস' নাটকটি নামালেন তখন সবার মুখ বন্ধ। বৃদ্ধ পিতামহ এবং উপ্রস্বভাবা নাতনির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্বামীস্ত্রী। প্রতিটি কাগজ, এমনকী পত্রিকাগুলোও বাধ্য হয়েছিল প্রশংসা করতে।

'আপনার চা।'

স্বপ্নেন্দু দেখল একটা ট্রের ওপর দু'কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা। টেবিলে নামিয়ে রাখতেই স্বপ্নেন্দু বলল, 'বাঃ আপনিও চা খাবেন দেখছি! আমাকে একা একা খেতে হল না!'

উল্টোদিকের সোফায় বসলেন মহিলা। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর বহুল প্রশংসিত বড় লাল টিপটি পরে নিয়েছেন। মুখটাই এখন ওঁর মতো হয়ে গিয়েছে।

চায়ে চুমুক দিল। ভাল। বিস্কুটগুলো রেখে লাভ কি! চিরকালই ম্লান করা মাত্র ওর খুব খিদে পেয়ে যায়। মহিলা ওর খাওয়া দেখছিলেন।

'আপনি আমার কোন নাটক দেখেছেন?'

'সব।' স্বপ্নেন্দু বলল, 'সেসময় আপনি ছোট চরিত্রে অভিনয় করতেন। তাছাড়া আমার

নাটক বলা ঠিক নয়। নাটক পরিচালনা সন্দীপনদার, আপনি তার একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন, এইভাবে বলা যেতে পারে। আবার দেখুন, রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথের নাটক হলেও আমরা শুনেছি লোকে শম্ভু মিত্রের রক্তকরবী বলত। পরিচালক শম্ভু মিত্র, অভিনেতা শম্ভু মিত্র। কিন্তু আমার মনে হয়েছে রক্তকরবী নন্দিনীর নাটক। একটা চরিত্র যখন নাটকের সবক'টা ঘর, ঘরের দরজা জানলার দখল নিয়ে দর্শকের উৎসাহ মুঠোয় নিয়ে নেয় তখন তার নাটক বলতে বাধা কোথায়!'

'বাঃ, আপনি তো ভাল ভাবেন। 'কৃষ্ণচূড়ার রস' দ্যাখেননি?'

'ন। আকাদেমিতে হাউসফুল হচ্ছে, গিরিশেও তাই। সপ্তাহে তিনদিন কল শো পাচ্ছেন আট হাজার টাকার বিনিময়ে, সন্দীপনদার ইতিহাসে এমন ঘটনা তো ঘটেনি। তাই দেখিনি।'

'সেকি? একটা নাটক জনপ্রিয় হয়েছে বলে দেখবেন না?'

'না। বহুকাল তো নাটক করছেন সন্দীপনদা। আপনার যখন পাঁচ সাত বছর বয়স তখন থেকে। কোনও শো-এ পঁচিশ তিরিশ জনের বেশি হয়নি। তা ফট করে এত দিন বাদে ওর নাটক হাজার হাজার মানুষের ভাললাগা খুঁজে পেল কী করে? ওঁর মতো মানুষের পক্ষে মিনার্ভা বা সারকেরিনার নাটক করা সম্ভব নয়। পুলিশ কখনও ভাল চোর হতে পারে না কিন্তু চোরের পক্ষে ভাল পুলিশ হওয়া ঢের সহজ। পাবলিক বলছে একটু রেখে ঢেকে উগ্রপন্থীদের অত্যাচারকে ক্যাশ করে এ নাটকের নায়িকার অনেকটাই দর্শকদের দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন সন্দীপনদা। আর, অত্যাচারের বীভৎস দৃশ্যে সেটা খুবই বাস্তব। আমার মনে হল পৃথিবীতে কত কি ভাল জিনিস চুপচাপ চলে যাচ্ছে সেটা যেমন দেখা হয় না, এটাও তেমনই হোক। কোনও ক্ষতি তো হবে না।'

'ওই নায়িকার ভূমিকা আমি করেছি।'

'অনুমান করছি। কৃষ্ণচূড়া গাছে মানায়, সাঁওতাল মেয়েদের খোঁপাতেও মানাতে পারে। কিন্তু প্রেমের সঙ্গে গোলাপের সংযোগ আদ্যিকাল থেকে। পান হবে?'

'পান?' মহিলার মুখটা আচমকা চুপসে গেল।

'হ্যাঁ। চা খাওয়ার পর একটা পান চিবোলে মাথা খুলে যায়। আপনাদের বাড়িতে বুঝি পান খাওয়ার চল নেই। ঠিক ধরেছি। আজকাল বুদ্ধিজীবীরা পান নস্যি বর্জন করেছেন। খুব স্থূল দেখতে লাগে বলেই বোধহয়। পান খাবেন?'

হেসে ফেললেন মহিলা, 'কোথায় পাব? এ পাড়ার সব দোকান তো বন্ধ।'

'কলকাতা তো শুধু একটা পাড়া নিয়ে নয়, অনেক অনেক পাড়া মিলেজুলে এই কলকাতা। কী ধরনের পান আপনার পছন্দ?'

'দেখুন, পান সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনও ধারণা নেই। বিয়েবাড়িতে যে পান দেয় মুখে দিয়ে দেখেছি বড্ড মিষ্টি, একগাদা মশলা—!'

শেষ করতে দিল না স্বপ্নেন্দু, 'তরকারি তরকারি? তাই তো! না, আমি আপনাকে একটি সুস্বাদু, বাহুল্যবর্জিত চমৎকার পান খাওয়ার কথা বলছি। আপত্তি আছে?'

মহিলার যে মজা লাগছিল, বোঝা গেল তাঁর ঠোঁট দেখে। তিনি মাথা নেড়ে না বললেন। স্বপ্নেন্দু চা শেষ করে ফেলেছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে যাই। আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

www.boiRboi.blogspot.com

যে কোনও সাকসেসফুল পুরুষের পেছনে একজন মহিলা থাকেন। সন্দীপনদার এই যে এখন নাটকপাড়ায় 'গুরুদেব গুরুদেব ইমেজ' এর পেছনে কি ইনি? উঁহু। মাথা নাড়ল স্বপ্নেন্দু। না, এঁকে বিয়ে করার পাঁচ বছর আগে একজন স্কুল শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সন্দীপনদার ডিভোর্স হয়। ভদ্রমহিলা নাটক করতেন না, দেখতে আসতেন মাঝে মাঝে। তা তিনি থাকতেই সন্দীপনদার নাম গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম তিনজনের সঙ্গে উচ্চারিত হত। বাকি দু'জনের একজন অকালে চলে গেছেন। অন্যজন মঞ্চ থেকে সরে গিয়েছেন অনেক কাল। অতএব সন্দীপনদার ধারে কাছে কেউ নেই। কিন্তু থিওরিটা খাটছে না ওঁর ক্ষেত্রে। একজন নয়, ভাগ্যবানেরা একাধিক মহিলার উৎসাহ পান।

কিন্তু স্নান এবং চায়ের ঋণ পান খাইয়ে কিছুটা লাঘব করা যায়। স্বপ্নেন্দু দেখছিল রাস্তার দু'পাশের সমস্ত দোকানও বন্ধ। ফুটপাতে বা দোকানের রকে মানুষ মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। ভাড়ের চায়ের দোকানও বন্ধ। ঠিক এই সময় বাজার রমরম করে চলছে শ্মশানে। নিমতলার সামনের দোকানগুলোর দিনরাত নেই। স্বপ্নেন্দু সেই দিকেই হাঁটা শুরু করল।

আজ নিমতলায় যেন মেলা বসেছে। জনা দশেক মৃতদেহ নিয়ে প্রায় দেড়শো লোক অপেক্ষা করছে। মৃতদেহগুলোকে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে মাটিতে শুইয়ে। এরই মধ্যে আউট অফ টার্নে কেউ আগে ইলেকট্রিক চুল্লিতে যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে অবশ্য শান্তি নেমে আসতে দেখল স্বপ্নেন্দু। সে লক্ষ করল যে সমস্ত মৃতদেহের এখনই চুল্লিতে ঢোকার চান্স নেই তাদের আত্মীয়স্বজনেরা বাইরের দোকানগুলোতে ভিড় করেছে। পুরুষ মৃতদেহগুলো নিঃসঙ্গ কিন্তু নারীর মৃত শরীরের পাশে কেউ না কেউ বসে আছে পাহারায়।

চায়ের দোকানে ঠাসা ভিড়। আলুরদম রুটি মুহূর্তে উড়ে যাচ্ছে। একজন এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'দিশি বিলিতি সব পাবেন বাবু। গঙ্গার ঘাটে চলে যান। ওখানে আমাদের নাইটবার চলছে।'

স্বপ্নেন্দু সিগারেটের দোকানে এল, 'পান দেবেন ভাই?'

'কী পান?'

'মিঠে পাতা, ভাজা সুপুরি চমনবাহার।'

'মিঠে পাতা নেই, বাংলা পাবেন।'

পরপর তিনটে দোকান, কারও কাছে মিঠে পাতা নেই। যারা চরম পানখোর তাঁরা চুনের সঙ্গে বাংলাপাতার ঝাল উপভোগ করেন। কিন্তু বিলাসীদের জন্যে চাই মিঠে পাতা। তৃতীয় দোকানদার বলল, 'সোনাগাছি ছাড়া এখন মিঠে পাতা কোথাও পাবেন না বাবু। শ্মশানে বাংলাপাতা ভাল কাটে।'

সোনাগাছি এখান থেকে কত দূরে? বড়জোর মিনিট বারো। সন্দীপনদার স্ত্রীকে আজ পান খাওয়াবে কথা দিয়ে এসেছে সে। পান না খাওয়ালে কিঞ্চিৎ ঋণ থেকে যাবে। মহাভারতে আছে সূর্যাস্তের মধ্যে না হত্যা করতে পারলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে। তার ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের আগে মিঠে পান চাই। এই সময় খুব শান্ত একটা মিছিল শ্মশানের দিকে এগিয়ে এল। চুল্লির সামনের চাতালে জায়গা নেই বলে শ্মশানযাত্রীরা মৃতদেহ নিয়ে

দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়। লোকগুলো হইচই করছে না দেখে স্বপ্নেন্দু এগিয়ে গেল, 'কে মারা গিয়েছেন ভাই?'

একজন বললেন, 'কবি সর্বদমন পাকড়াশি।'

সর্বদমন পাকড়াশি? কবি? স্বপ্নেন্দু হকচকিয়ে গেল। এই নামের কোনও কবির কবিতা সে কোথাও দ্যাখেনি। তাছাড়া নামটা শুনলেই মনে হয় ছদ্মনাম। ওই নামে কবিতা লিখে, অভিনয় করে কেউ কখনও বিখ্যাত হতে পারে না। অথচ এই মৃত মানুষটি কবিতা লিখতেন। যিনি কবিতা লেখেন তিনি কবি। জীবনানন্দ দাশ যাই বলে যান না কেন লোকটা তার স্ত্রীর কাছে কবি, আত্মীয়বন্ধুদের কাছেও। লক্ষ লক্ষ বাঙালি এভাবে নীরবে কাব্যসাধনা করে চলেছে যা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তবু একজন কবির মৃতদেহ শ্মশানে এলে মন খারাপ হয়ই। 'কেউ কেউ কবির' দলে না পড়লেও।

সোনাগাছিতেও সন্ধে হয়! এখন রাত সাড়ে তিনটে। যে ক'টা দোকান সারারাত ব্যবসা করেছে তারা এখন ঝাঁপ দেবার জন্যে তোড়জোড় করছে। এখন ট্যাক্সিওয়ালা আর পুলিশের ব্যস্ততা চারপাশে। উল্টোদিক দিয়ে তাকে আসতে দেখে একজন পুলিশ পথ আটকাল, 'অ্যাই! কী চাই?'

'পান। মিঠে পাতার পান।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে।'

'একদম না। সিরিয়াসলি বলছি।'

'কোত্থেকে আসছ?'

'নিমতলা শ্মশান থেকে।'

'যাঃ বাবা। শ্মশান থেকে সোনাগাছি।' হা হা করে হাসল লোকটা, 'তা একই ব্যাপার। শোনো, তুমি ওই গলিতে ঢুকে যাও এক দৌড়ে। ওর ভেতরে একটা পানের দোকান আছে। সেখানে থেকে পান কিনে সোজা এদিকে এসো।'

'কেন?'

'তোমাকে ধরব আমি।'

'তার জন্যে গলিতে ঢুকতে হবে কেন? এখনই ধরো।'

'না, সেন্ট্রাল এভিন্যুর ওপর কাউকে ধরা নিষেধ আছে। পরশু একজনকে ধরেছিলাম। মাল দিল না বলে থানায় নিয়ে গেলাম। বড়বাবু আমাকে পারলে সাসপেন্ড করে দেয়। লোকটা নাকি সাংবাদিক। শালা, চেহারা দেখে তো চেনা যায় না। তুমি কী করো?'

স্বপ্নেন্দু মিষ্টি হাসল, 'সেদিনের কেসটা আর একটু বলো তো!'

লোকটার মুখ চুপসে গেল আচমকা, 'বুঝতে পেরেছি স্যার। আগে বলবেন তো! আসলে আপনাদের চেহারা দেখে তো কিছুতেই চেনা যায় না। অন্যায় মাপ করবেন। এই কথা বলার ঢংটা তো পাল্টাতে পারি না! আপনার মিঠে পাতা পান সত্যি চাই না ফলস্ দিলেন!'

'সত্যি চাই।'

'আসুন আমার সঙ্গে। নইলে অন্য কোনও গাধা ফস করে আপনাকে ধরে বেকায়দায় পড়বে। বাজারদর কি হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে বুঝতেই পারছেন স্যার।'

www.boiRboi.blogspot.com

লোকটা তাকে নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকল।

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'রিপোর্টার কোন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল?'

'ওই তিনতলা হলুদ বাড়ি স্যার। আপনি আমার নাম লিখবেন না তো?'

'আপনি সাহায্য করলে কিছুতেই নয়।'

পুলিশটা হাসল, 'ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু এখন তো ঘরখালির টাইম। সব শুয়ে পড়েছে মালটাল খেয়ে, নইলে—! এই শান্টু! শান্টু!'

একটি রোগা লুঙ্গিপরা লোক সুড়ুৎ করে এগিয়ে এল, 'জি!'

'তোর তিনতলার মালকিন ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'মাল খেয়ে আউট হয়ে গেছে বারোটার সময়। মাসি আগুন হয়ে গেছে। দু-দুটো রইস পার্টি ফিরে গেছে। কাল খুব ঝামেলা করবে মাসি।'

লুঙ্গিপরা লোকটা খিকখিক করে হাসতে লাগল।

পুলিশটা বলল, 'কী হবে স্যার! মাল খেয়ে আউট হওয়া মেয়েছেলেকে দেখতে আপনার একটুও ভাল লাগবে না।'

স্বপ্নেন্দু চারপাশে তাকাল। আলোগুলো যেন হলুদ হয়ে গিয়েছে। বাড়িগুলোর ছায়ায় কিছু কিছু মূর্তি চোরের মতো চলাফেরা করছে। পুলিশ এবং ট্যাক্সিওয়ালারা তাদের দেখতে পেয়ে খুব খুশি। লুঙ্গিপরা লোকটি বলল, 'এই ভোরবেলায় কাউকে পাবেন না বাবু।' তবে আমার সঙ্গে যদি আসেন তাহলে ব্যবস্থা করতে পারি।'

পুলিশ চোখ পাকাল, 'আই চোপ!'

লোকটি বলল, 'মাইরি বলছি, ফাংশন করতে গিয়েছিল। একটু আগে ফিরেছে। সঙ্গে কোনও পার্টি নেই। রোজার গান যা গায় না। এখন দু'পেগ মাল খাচ্ছে, তারপর ঘুমাবে। যাবেন তো চলুন।'

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'পানের দোকান কোথায়?'

পুলিশ তৎপর হল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

দোকানটা বড় নয়। তবু রাতের এমন সময়েও দুজন খদ্দের ছিল। পুলিশ দেখে তারা সুড়ুৎ করে হাওয়া হয়ে গেল। পানওয়ালা বলল, 'বলুন, কি সেবা করতে পারি?'

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'মিঠে পাতা আছে?'

'আছে। খানদানী আর জনতা দুটোই পাবেন।'

পুলিশ ধমকাল, 'এই সমঝে কথা বল।'

পানওয়ালা বলল, 'আমি অন্যায় কিছু বলিনি ভাই। দিশি মিঠে পানকে বলা হয় জনতা পান। আর খোদ বেনারসের মিঠে পাতা হল খানদানী।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'খানদানী তিনটে পান সাজো। এলাচ, ভাজা সুপুরি আর চমনবাহার। জর্দা চাই না। তিনটে পান তিনটে প্যাকেটে আলাদা করে একটা ঠোঙায় ভরে দাও।'

পানওয়ালা দ্রুতহাতে আদেশ পালন করতেই স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কত?'

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হাঁ হাঁ করে উঠল, 'না না। আপনি দাম দেবেন কি! অ্যাই আমার অ্যাকাউন্টে রাখ। আপনি দাম দিলে আমি লজ্জায় মরে যাব।'

হতভম্ব স্বপ্নেন্দু প্যাকেট নিয়ে হাঁটা শুরু করলে পুলিশটি সঙ্গ নিল, 'বড্ড অসময়ে

এলেন স্যার, আপনার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না।'

'ঠিক আছে। আপনি আপনার কাজে যান।'

'খেপেছেন। আপনাকে গ্রে স্ট্রিট পার করে দিয়ে আসি। নইলে আর কোনও পুলিশ আমার মতো ভুল করে বসবে। আপনি তাহলে আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখছেন না! তাই তো। আসলে এসময়টায় আমাদের যা টু-পাইস হয়। আপনি যদি লেখেন গরিবের পেটে হাত পড়বে।' পুলিশটি পরমপিতার মতো স্বপ্নেন্দুকে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

ফিরতি পথে দ্রুত হাঁটছিল স্বপ্নেন্দু। এখনও অন্ধকার বাড়িগুলোর খাঁজে খাঁজে। রাস্তার আলো আরও বর্ণহীন। কিন্তু দু-একজন মানুষ ইতিমধ্যেই বিছানা ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। সন্দীপনবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছে খুশি মনে বেলের বোতাম টিপল সে। শব্দটা যেন গ্যাঁক গ্যাঁক করে গলি কাঁপিয়ে বেজে উঠল। স্বপ্নেন্দু ওপরের জানলার দিকে তাকাল। না, কোনও মুখ উঁকি মারছে না। সে দ্বিতীয়বার একটু সময় নিয়ে বোতামে চাপ দিল। নিজের কানেই বড্ড কুৎসিত শোনাল আওয়াজ। তার মনে হচ্ছিল এর আগের বার যখন এসে বেল টিপেছিল তখন এত বিশ্রী শব্দ হয়নি। খানিকটা সময়ের তফাতে বেলের আওয়াজ বদলে যায় নাকি! পৃথিবীতে কত কি বিস্ময়জনক ব্যাপার প্রতিমুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আশপাশের দুটো বাড়ির দোতলার জানলায় খুলে গেছে এর মধ্যে। সেখানে উঁকিঝুঁকি মারছে কিছু বিস্মিত মুখ। এবার ওপরে জানলার সন্দীপনকে দেখা গেল। যেন গভীর কুয়ো থেকে কোনও মতে নিজেকে তুলে নিয়ে এসেছেন, 'কে? কে?'

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'ওঃ। ইটস টু মাচ। আবার কি চাই?'

'আমার নয়, ম্যাডাম বললেন পান খাবেন, পান এনেছি।'

'পান?'

'হ্যাঁ সন্দীপনদা। উঃ, কি ভুগিয়েছে আমায়। নিমতলায় এখন বাংলা পান ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। ম্যাডামের তো বিয়েবাড়ি ছাড়া পান খাওয়া অভ্যেস নেই তাই অনেক খুঁজে খুঁজে সোনাগাছি থেকে পান নিয়ে এলাম।'

'সোনাগাছি থেকে পান?' সন্দীপনদার গলা ফ্যাসফ্যাসে শোনাল।

'একেবারে খানদানী পান। বর্ণ ইন বেনারস। আমি অবশ্য কোনওদিন বেনারসে যাইনি। ছেলেবেলায় পিসিমা যাকে কাশী বলতেন এখন সেটা ঠিক বেনারস নয়, তাই না? যাক, ম্যাডামকে বলুন, পান নিয়ে যেতে।' কথা বলতে বলতে স্বপ্নেন্দু দেখল, পাশের বাড়ির দরজা খুলে গেল। একজন খেঁকুড়ে চেহারার প্রৌঢ় পিচুটি চোখে বললেন, 'ভোররাতে পান, তাও আবার সোনাগাছির?'

'হ্যাঁ দাদু। সন্দীপনদা যদি না খান তাহলে একটা আপনাকে দিতে পারি। তিনটের বেশি তো আনিনি।' স্বপ্নেন্দু হাসল।

সন্দীপনদা বললেন, 'স্বপ্নেন্দু তুমি কি ইচ্ছে করে এসব করছ?'

'কিসব সন্দীপনদা?'

'রাতদুপুরে লোকের বাড়িতে এসে জ্বালাতন করতে খুব মজা লাগছে? তুমি ভেবেছ

www.boiRboi.blogspot.com

এইসব আর্টিফিসিয়াল বোহেমানিজম দেখলে আমি হাততালি দেব?'

'আমি আপনার কথা বুঝতেই পারছি না। ম্যাডাম বললেন পান আনলে উনি খাবেন, তাই কত কষ্ট করে পান নিয়ে এসেছি।'

'উনি এখন ঘুমাচ্ছেন।'

'যাচ্চলে। মানুষ কেন এত ঘুমায় বলুন তো? এই'তো ক'টা বছরের জন্যে পৃথিবীতে আসা, তার ওয়ান থার্ড যদি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয় তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি? হ্যাঁ, যখন ঘুম দু'চোখে হামলে পড়বে তখন বাধ্য হয়ে কিছুটা সময় ঘুমানো যেতে পারে। যাক গে, ঘুম থেকে ওঠার পর না হয় ম্যাডামকে পানটা দেবেন। এখন অনুগ্রহ করে দরজা খুলে এটা নিয়ে নিন, আমি বিদায় হই।' স্বপ্নেন্দু বলল।

মিনিটখানেক বাদে দরজাটা খুলল। ঠোঙা থেকে দুটো প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল স্বপ্নেন্দু, 'এ দুটো আপনাদের জন্যে। নিন, ধরুন।'

সন্দীপন বাধ্য হলেন নিতে। নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে!'

'হ্যাঁ। দাম দিতে হবে না। কারণ পুলিশের ধমক খেয়ে পানওয়ালা আমার কাছেও দাম নেয়নি। আচ্ছা, চলি।' যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই পৌঢ়কে দেখতে পেল সে, 'সরি দাদু। নো এক্সট্রা পান।' বলে তৃতীয় প্যাকেট খুলে ওটাকে মুখে চালান করে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

এখন রীতিমতো ভোর। সন্দীপনদার মুখটা মনে করে খারাপ লাগছিল ওর। অনেক কাল আগে ট্রেসিস টাইগার নাটকটার ভাবান্তর বাংলায় করেছিলেন সন্দীপনদা। একটি ছেলের বুকে বাঘ বাস করে। উল্টোপাল্টা দেখলে সেই বাঘ হালুম করে লাফিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু ছেলেটি এত সামান্য যে সে কিছুই করতে পারে না আবার বাঘটাকে সামাল দিতে হিমশিম খায়। ওই নাটকটি করে সন্দীপনদা খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন। অথচ আজ এমন মুখ করেছিলেন যেন রক্তকরবীর রাজা। জালের আড়ালে থেকে শিউরে উঠেছেন পাছে তাঁর দুর্গে আঁচড় কাটে সে। সন্দীপনদা যদি রাজা তবে ম্যাডাম নন্দিনী। নন্দিনী দেখতে কিরকম সে প্রশ্ন শুধু কীটজাতীয় প্রাণী করতে পারে। নন্দিনী পৃথিবীর সমস্ত আলোমাখা এক নবীন স্নিগ্ধতা। আর যা স্নিগ্ধ তার চেয়ে সুন্দর আর কি হতে পারে? অতএব ম্যাডাম অবশ্যই সুন্দরী। সুন্দরীদের চোখে ঘুম কেন আসে? পৃথিবীর সব সুন্দরীদের উচিত দিন রাত এবং রাত দিন জেগে থাকা। ঘুম মানেই নিস্তেজ, অসহায়তার কাছে আত্মসমর্পণ, ঘুম মানেই চোখের বোলে পিচুটি।

দোতলা বাড়িটির নীচে যে সিগারেটের দোকান সেটি ইতিমধ্যে ঝাঁপ খুলেছে। পাশের সদর দরজা বন্ধ। স্বপ্নেন্দুর পকেটে দুটো চাবি সবসময় থাকে। একটি তার ঘরের অন্যটি এই দরজার। হঠাৎ তার খেয়াল হল গতকাল সে একটাও সিগারেট খায়নি। দোকানটার সামনে যেতেই লোকটা হাসল, 'নমস্কার বাবু। কী দেব? ক্লাসিক না উইলস? কাল এক কার্টুন ডানহিল পেয়েছি, টাটকা। নেবেন?'

'দাও!'

লোকটা দু'প্যাকেট ডানহিল আর একটা দেশলাই এগিয়ে দিয়ে খাতা বের করল, 'একটা সই দিয়ে যান। এখনও বউনি হয়নি তাই পরে আমি লিখে রাখব।' অবহেলায়

সাদা পাতায় সই করে দরজা খুলে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল সে। নিজের ঘরের দরজা খুলে কিরকম বোঁটকা গন্ধ পেল স্বপ্নেন্দু। এই রকম গন্ধ বাতাসে ভাসলে কেউ ভাল স্বপ্ন দেখতে পারে না। সে জানলা খুলে দিতেই সকালের টাটকা বাতাস ঘরে ঢুকল। আধপোড়া ধূপের কাঠি জ্বেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে জামাপ্যান্ট খুলতেই ইউলিসিস বইটা নজরে এল। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ বিগড়ে গেল। পরম যত্নে বইটাকে সরিয়ে গীতবিতানের তলায় চাপা দিয়ে রাখল স্বপ্নেন্দু। এখন তাকে সিরিয়াসলি কিছু ভাবনা ভাবতে হবে। মহামান্য তথ্যমন্ত্রী তাকে সকাল এগারোটার সময় পাঁচ মিনিটের জন্যে সময় দিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত প্রতিভাবান মানুষকে হয় রাজানুগ্রহ নয় কোনও ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পেতে হয়েছে। এখন যিনি তথ্যমন্ত্রী তাঁকে একসময় কামু সার্তে থেকে শুরু করে ডিসিকা কুরুশুয়া বুঝিয়েছে সে। সেসময় চায়ের দোকানে যারা আড্ডা দিতে আসত তাদের পড়াশুনা করার চেষ্টা ছিল। সেই সময় এখনকার তথ্যমন্ত্রী উত্তেজিত হয়ে জেমস জয়েসের ইউলিসিসের সন্ধান দিয়েছিলেন। সে-সময় পকেটে টাকা ছিল না। বন্ধুদের কাছ থেকেও বইটা পাওয়া যায়নি। বড় লাইব্রেরিতে যাওয়ার অভ্যেসও তৈরি হয়নি। ফলে একটু একটু করে পড়ার ইচ্ছেটা মরে গিয়েছিল। গতকাল কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে আচমকা পেয়ে গেল বইটি।

তথ্যমন্ত্রীর কি এসব মনে আছে? যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বপ্নেন্দুদা ইউলিসিস নিশ্চয়ই এখনও পড়েননি?' তাহলে জব্বর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। আশ্চর্য! সারা জীবন যে চলচ্চিত্র এবং নাটক নিয়ে পড়াশুনা করে কাটাল তাকে ইউলিসিস নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে?

স্নান সেরে একটু ভদ্র পোশাক পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে ঠাকুরের দোকানে গিয়ে রুটি আলুরদম খেল। খাওয়ার পর ঠাকুর তাকে একটু আলাদা ডেকে নিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে এত পর ভাবেন কেন বলুন তো? এই যে রোজ রোজ পয়সা দিয়ে খাচ্ছেন এটা আমার খুব খারাপ লাগে। আজ থেকে আমি খাতা করছি আপনি সই করে দেবেন। ওই শালা সিগারেটওয়ালাই আপনাকে সেবা করবে এটা হয় না।'

স্বপ্নেন্দু প্রতিবাদ করল, 'কিন্তু ও আমাকে তাগাদা দেয় না। মাঝে মাঝে শোধ করে দিই কিছু টাকা, ও তাই মেনে নেয়।'

'আপনাকে আমি তাগাদা দেব বলে ভেবেছেন নাকি? ছি ছি! ওর সঙ্গে যে ব্যবস্থা আমার সঙ্গেও তাই রইল। নিন, সই করে দিন। আজ তিনটে রুটি আর আলুরদম। কাল ঝিঙেপোস্ত খাওয়াব বাবু। খেয়ে দেখবেন।' ঠাকুর বলল।

স্বপ্নেন্দু মনে হল পৃথিবীটা হঠাৎ কিরকম ভাল হয়ে গেছে। যারা মানুষ সম্পর্কে খারাপ কথা বলে এবং লেখে, মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা অথবা শয়তানি খুঁজে পায় তাদের জন্য দুঃখিত হওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই। সিগারেটওয়ালা অথবা ঠাকুরের মতো মানুষ এখনও পৃথিবীতে রয়েছে, সন্দীপনদা যেমন আছেন তেমনি ম্যাডামও রয়েছেন যিনি মধ্যরাত্রে স্নানের অনুমতি দেন, সহাস্যে চা পরিবেশন করেন। এইসব মানুষই তার বিষয় হওয়া উচিত। শ্যামবাজারের ট্রামডিপো থেকে ট্রামে উঠে জানলার পাশে বসার জায়গা

www.boiRboi.blogspot.com

পেয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবনা শুরু করল স্বপ্নেন্দু। ট্রামটা যখন বিবাদী বাগে ঢুকছে তখন হুড়মুড়িয়ে যাত্রীরা নেমে যাচ্ছিল। স্বপেন্দু চোখ খুলে দেখল কন্ডাক্টার দূরে চুপটি করে বসে আছেন। সে এগিয়ে গিয়ে সবিনয়ে বলল, 'আপনি অনুগ্রহ করে আমার ভাড়াটা নেবেন?'

লোকটি খুব বিরক্ত হলেন, 'এতক্ষণ দেননি কেন?'

'আমি অন্য কিছু ভাবছিলাম, খেয়াল ছিল না।'

'দিন।'

ভাড়া মিটিয়ে ট্রাম থেকে নামল স্বপ্নেন্দু। কন্ডাক্টারের ব্যবহার তার মোটেই খারাপ লাগল না। আট ঘণ্টা ধরে একই পথে শ'য়ে শ'য়ে যাত্রীর সঙ্গে যাঁকে এক কথা বলতে হয় তাঁর ধৈর্যচ্যুতি তো ঘটতেই পারে।

পুলিশ বলল, 'তথ্যমন্ত্রী রাইটার্সে আসেননি।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'আপনার সম্ভবত ভুল হচ্ছে ভাই। উনি আমাকে এই সময় আসতে বলেছিলেন। কাউকে কথা দিয়ে বিব্রত করার মানুষ উনি নন।'

'মনে হচ্ছে আপনি ওঁকে ভলে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই। ওঁর মধ্যে সততা এবং পড়াশুনা করার ইচ্ছে বরাবরই ছিল। আপনি আর একবার দেখুন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে এসে গেছেন উনি।'

'আরে এলে তো এই পথ দিয়েই যাবেন। এটা ভি আই পি এনক্লোজার।'

'কিন্তু এটাই কি ওঁর অফিসে যাওয়ার একমাত্র পথ?'

'না। ওপাশে চার্চের দিক দিয়ে সাধারণ কর্মচারী আর পাবলিকের জন্যে যে গেট রয়েছে সেদিক দিয়ে উঠেও মন্ত্রিমহলে ঢোকা যায়। কিন্তু কোনও মন্ত্রী ওই পথ ব্যবহার করেন না।'

'কেন?'

'নিরাপত্তার কারণে। তা ছাড়া সাধারণ কর্মচারীদের সঙ্গে এক লিফটে মন্ত্রীর পক্ষে আসাযাওয়া করাও শোভন নয়, তাই।'

লোকটার কথা শুনে স্বপ্নেন্দু এমন ভাবে তাকাল যে এমন আজব কথা সে এর আগে কখনও শোনেনি। ঠিক সেই সময় একটা গাড়ি সিঁড়ির গায়ে এসে দাঁড়াতেই রক্ষীরা দরজা খুলে দিল। তথ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে বেরিয়ে হন হন করে হেঁটে লিফটে উঠে গেলেন। লিফট ওপরে চলে গেল। আর ওঁর এখান দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিটি পুলিশ সোজা হয়ে স্যালুট করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

অফিসার বললেন, 'দেখলেন তো, স্যার এই এলেন। কী নাম যেন আপনার?'

স্বপ্নেন্দু নাম বলল। ভদ্রলোক একটা লিস্টে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'মুশকিলে ফেললেন। আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এগারোটায়। এগারোটা পাঁচে একজন অধ্যাপক ঢুকবেন। ভদ্রলোক আধঘণ্টা আগে থেকে বসে আছেন এখানে। এখন এগারোটা দশ। উনি কি আর আপনার সঙ্গে দেখা করবেন?'

'আমার বিশ্বাস, করবেন।'

'উনি যে আপনাকে চেনেন তা তো মনে হল না।' অফিসার একটা স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ওই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যান।'

www.boiRboi.blogspot.com

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

দশ মিনিট বাদে তথ্যমন্ত্রী ডেকে পাঠালেন।

'আসুন স্বপ্নেন্দু, কী খবর বলুন?'

'আমি একটা আবেদন করেছিলাম—!'

'ও। আপনার সেই স্বপ্নের ছবি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখন আমরা ছবি তৈরির ব্যাপারে কোনও অনুদান দিচ্ছি না। এমনিতে প্রচুর টাকা আটকে আছে। নতুন কিছু করা সম্ভব নয়।'

'আশ্চর্য!' স্বপ্নেন্দু না বলে পারল না।

'কেন?' তথ্যমন্ত্রী হাসিমুখে তাকালেন।

'আমি কি ধরে নেব এই সরকার শিল্পসংস্কৃতির ব্যাপারে আগ্রহী নয়? সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনও পরীক্ষা নিরীক্ষা অসম্ভব জেনেও এই সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?' বেশ জোরের সঙ্গে বলল স্বপ্নেদু।

তথ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, 'আপনার বিষয় কি?'

'ভালমানুষ মন্দমানুষ।'

'এটা তো হিন্দি সিনেমার সাবজেক্ট।'

স্বপ্নেন্দু উত্তেজিত হল, মাননীয় মন্ত্রীমশাই, আমাকে যাঁরা দীর্ঘকাল জানেন তাঁরা কখনই তথাকথিত ব্যবসায়িক ছবি আমার কাছে আশা করেন না। আমার ভাবনাচিন্তা ওসব থেকে লক্ষ মাইল দূরে। আর মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর জানা উচিত হিন্দি ভাষায় এখন এমন সব ছবি তৈরি হচ্ছে যার মান নিঃসন্দেহে অনেক ওপরে। আমার বিষয় ভালমানুষ মন্দমানুষ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে একইসঙ্গে এই দুজন বেঁচে থাকে। আমার অভিযোগ হবে ভালমানুষটিকে খুঁচিয়ে বের করা। মানুষের ধর্ম হল অন্যকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করা। একজন ভয়ঙ্কর হলে আর একজন বেশি ভয়ঙ্কর হতে চায়, একজন কোনও ভাল কাজ করলে আর একজন আর একটু বেশি ভাল হওয়ার চেষ্টা করে। তাই আমার ছবি দেখলে জনসাধারণের মানসিক উন্নতি হতে বাধ্য যা দেশের উপকারে আসবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন তাঁরা আর ছবি প্রোমেট করবেন না। এত বড় দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নেওয়া কি উচিত হয়েছে? ছাত্রাবস্থা থেকে আমরা বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। মাননীয় মন্ত্রীর অতীত ওই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। অথচ এখন, এখানে এসে জানলাম, আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা জনসাধারণের জন্যে যে প্রবেশপথ এই বাড়িতে ঢোকার জন্যে আছে তা ব্যবহার করেন না। কারণ তাঁদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এবং জনসাধারণের থেকে আলাদা হবার মর্যাদা থাকে না। ঘটনাটা আমাকে দুঃখিত করেছে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্যেই শিল্পসংস্কৃতি সম্পর্কে আপনারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

তথ্যমন্ত্রী মুচকি হাসলেন, 'বাঃ! চমৎকার। কিন্তু আপনাকে টাকা দিলে আমাকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে আপনার কোনও ইতিহাস নেই। ফিল্ম সোসাইটির কিছু পত্রিকায় বিদেশি পরিচালকের ছবি নিয়ে কয়েকটা লেখা আপনি লিখেছেন। কলকাতার বিখ্যাত চিত্র এবং নাট্য পরিচালকের বাড়িতে আপনার

যাওয়া আসা আছে, এটা যোগ্যতার নিরিখ হতে পারে না।'

'একথা সত্যজিৎ রায়কেও শুনতে হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর আগে।'

এবার তথ্যমন্ত্রী হেসে ফেললেন, 'আপনি ঠিক আগের মতো আছেন। ঠিক আছে। আমি নিয়ম ভাঙব। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'বলুন।'

'আপনাকে পুরো চিত্রনাট্য লিখে জমা দিতে হবে।'

'তার মানে আমার পরীক্ষা নেওয়া হবে?'

'সেটাই উচিত কিন্তু ওসব কিছু করা হবে না। আমি শুধু দেখতে চাই আপনি পুরো চিত্রনাট্য লিখেছেন। ওটা পেলেই বাজেট নিয়ে বসব।'

'এই মত পরিবর্তনের জন্যে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

'তাহলে আর দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারেন চিত্রনাট্য নিয়ে চলে আসুন।' তথ্যমন্ত্রী অন্য একটি ফাইল টেনে নিলেন।

নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একজন অফিসার বললেন, 'আপনি কি ওঁকে ছবি করতে টাকা দেবেন স্যার?'

'কেন?' তথ্যমন্ত্রী বিরক্ত হলেন।

'ওই যে চিত্রনাট্য নিয়ে এলেই টাকা দেবেন বললেন।'

'হুঁ। কারণ ওঁর পক্ষে কোনওদিন একটি ছবির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য লেখা সম্ভব হবে না। হয়তো আগামিকালই অন্য চিন্তা ওঁকে পেয়ে বসবে, আজকেরটা বাতিল করে দেবেন। এ নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই।'

'কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে চিত্রনাট্য লিখিয়ে আনতে তো পারেন।'

'না পারেন না।' তথ্যমন্ত্রী বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'আমি ওঁকে দীর্ঘকাল ধরে চিনি। ওঁর একমাত্র সম্বল হল আত্মসম্মান।'

মনমেজাজ বেশ ভাল হয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে দুটো হাতের মুদ্রায় ক্যামেরার আদল এনে সে ডালহৌসি স্কোয়ারটাকে ধরতে চাইল বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে। এইসব বাড়িগুলোর বেশিরভাগ ব্রিটিশদের তৈরি। সেদিন ব্রিটিশ কাউন্সিলে একটি পত্রিকায় লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারের ছবি দেখেছিল। স্কোয়ারের চারপাশে বাড়িগুলোর সঙ্গে এদের বেশ মিল আছে। যদি পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ জিতে যেতেন, যদি ক্লাইভকে বেধড়ক মেরে মোহনলালরা সমুদ্রে ফেলে দিত, যদি মীরজাফররা বিশ্বাসঘাতকতা না করত তাহলে কী হত? এই বাড়িগুলো তৈরি হত না। জিপিও, রাইটার্স বিল্ডিং, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে থাকত না। ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যেত অনেক অনেক বছর আগে। অসম বাংলা বিহার মিলে একটা রাষ্ট্র হত। পাকিস্তান শব্দটা যেহেতু কেউ জানতে পারত না তাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রয়োজন হত না। আমরা সবাই সিরাজের বংশধরদের অধীনে হয়তো থাকতাম অথবা থাকতাম না। সেক্সপীয়ার শেলী বায়রণ কীটস পড়া দূরে থাক নামই জানতে পারতাম না। তবে যেহেতু চীনে মার্ক্সবাদ ঢুকেছিল তাই এদেশে কম্যুনিস্ট পার্টির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। মাথাটা ধরে

গেল স্বপ্নেন্দুর। আড়াইশো বছর আগে ব্রিটিশরা এদেশ দখল করেছিল। ওদের ওপর আমাদের বিপ্লবীদের রাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রদীপটি নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল ওরা। যার আলোকে আমাদের গোটা উনবিংশ শতাব্দী আলোকিত। সিরাজের বংশধররা যা দিতে পারত না ব্রিটিশরা তা এদেশের মানুষকে দিয়ে গেছে। ওই কে বলে না, সব কিছুর একটা ভাল দিক আছে। অত্যন্ত খারাপ থেকেও মঙ্গলময় ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ইতিহাসে যারা বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত তারা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে আমরা হয়তো এখনও একশো বছর পিছিয়ে থাকতাম।

হাতের মুদ্রার কল্পিত ক্যামেরায় জিপিও-র বাড়িটাকে ধরল স্বপ্নেন্দু। আহা, কী নির্মাণ! স্বাধীনতার পর এই ধরনের আর একটি বাড়িও তৈরি হয়নি। আচ্ছা, একটা তথ্যচিত্র তৈরি করলে কিরকম হয়! এখনও ব্রিটিশদের তৈরি যেসব বাড়ি অথবা সেতু কিংবা স্মৃতিস্তম্ভ পশ্চিমবাংলার বুকে ছড়িয়ে আছে যার শিল্প-লাবণ্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না তাদের নিয়ে তথ্যচিত্র! হ্যাঁ, অনেকে বলবে এটা করে ব্রিটিশদের চাটুকারিতা করা হবে। কিন্তু যা সত্যি তা বললে চাটুকারিতা করা হবে কেন? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে তো ভেঙে ফেলা হয়নি, তাকে আলো দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে পর্যটকদের দেখানো হয়। সেটা চাটুকারিতা নয়? তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললে হত!

'দাদা, কী দেখছেন?'

হাত নামিয়ে স্বপ্নেন্দু দেখল দুজন মাঝবয়সী লোক তার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছেন সে কী দেখছে। স্বপ্নেন্দু বিড়বিড় করল, 'ব্রিটিশ!'

'ব্রিটিশ? তারা তো সাতচল্লিশ সালে চলে গিয়েছে।'

'অত সহজে কি চলে যাওয়া যায়? ওই যে জিপিও-টা দেখছেন, ওটা ব্রিটিশদের তৈরি। অতএব ওই বাড়িতে ওদের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে।' স্বপ্নেন্দু হাসল।

দ্বিতীয়জন হাসল, 'ঠিক বলেছেন দাদা। এই যে তোমার নাম হারাধন মিটার, মিটার কখনও বাঙালির টাইটেল হয়? তোমার মধ্যে ব্রিটিশরা বেঁচে আছে।' লোকটা খুক খুক করে হাসল।

'আমার মধ্যে ব্রিটিশ!' প্রথমজন বেশ ঘাবড়ে গেল।

এইসব কথার মধ্যে তৃতীয় লোকটি জুটে গেল। ওরা আলোচনা করতে লাগল কি কি জিনিসের মধ্যে ব্রিটিশরা রয়েছে। খবরের কাগজ, রেসকোর্স, ট্রাম, সিনেমা থেকে শুরু করে লিস্টটা এত বেড়ে যাচ্ছিল, সেইসঙ্গে লোকের সংখ্যাও, স্বপ্নেন্দুর মনে হল তথ্যচিত্রটা বানানোর কোনও মানে হয় না। সবই যখন ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে তখন দু-চারটে বাড়ি বা ব্রিজ দেখিয়ে লাভ কি! বরং একজন বঙ্গসন্তানের ছবি তুলে নীচে ক্যাপশন লিখে দিলেই হল, ইনি ব্রিটিশদের সন্তান, ভারতবর্ষে বাস করেন।

ভিড়টাকে পেছনে রেখে সে একটা খালি বাসে উঠে পড়ল। সিট খালি পেতেই বসে ভাবতে লাগল, চিত্রনাট্য লিখতে হবে, 'ভালমানুষ মন্দমানুষ।'

ভবানীপুরের পূর্ণ সিনেমার উল্টোদিকে সামান্য হাঁটলেই ডানদিকের গলিতে পৌঁছে যাওয়া যায়। এই রাস্তাটা এখন প্রায় পৃথিবী বিখ্যাত। প্রতিটি দিন সিনেমা-দেখিয়ে দেশগুলো থেকে প্রচুর চিঠি ম্যাগাজিন পিওন বয়ে দিয়ে যায় একটি বাড়ির বিশেষ

www.boiRboi.blogspot.com

লেটারবক্সে। সাদা চামড়ার গুণী মানুষদের দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে পাড়ার বাসিন্দারা। ওই বাড়ির একজন বিশিষ্ট মানুষকে নিয়ে তাঁরা খুব গর্ববোধ করেন। এখন বয়স হলেও চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর কোনও ক্লান্তি নেই। দোতলায় উঠে তাঁর বন্ধ দরজার গায়ে লাগানো বোতাম টিপল স্বপ্নেন্দু। টিপে স্মার্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল।

একটু বাদেই ভদ্রলোক দরজা খুললেন। চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'ও তুমি! কী ব্যাপার? এসো, ভেতরে এসো।'

স্বপ্নেন্দু ঢুকলে দরজা বন্ধ করে তিনি নিজের গদিমোড়া চেয়ারে গিয়ে বসলেন, 'অনেকদিন দেখা নেই, খুব ভাবছিলে তুমি?'

স্বপ্নেন্দু উল্টোদিকের চেয়ারে বসে চিবুকে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, 'হ্যাঁ। একটা চিত্রনাট্য নিয়ে খুব ভাবছি। আসলে টানা গল্প আমি বলতে চাই না। ইন ফ্যাক্ট টানা গল্প বলার রেওয়াজ শুরু হয়েছে এই সেদিন। গুহাচিত্রগুলোতে দেখবেন মানুষ কত কম ছবি এঁকে কত বেশি কথা বলেছে। সেই বলাটা আবার দর্শকরা শুনে নিয়েছে যে যার মতন করে। ফ্যান্টাস্টিক। আরব্য রজনী অনেকে স্থূল, কিন্তু রোজ রাত্রে যে গল্প শুরু হয়েছে খুব কম ক্ষেত্রে তা পরের দিন কনটিনিউ করা হয়েছে। এসব খুব সিরিয়াস ব্যাপার।' কথাগুলো বলে শরীরটাকে ঈষৎ বাঁকালো স্বপ্নেন্দু।

'তা তো বটেই।' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

'আপনাকে একটা ভাল খবর দিতে এলাম।'

'কিরকম?'

'ছবি করছি।'

'তাই! গুড। ভেরি গুড।'

'পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবির জন্যে টাকা খরচ করতে রাজি ছিল না, ভাবতে পারেন? আজ রাইটার্সে গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত তথ্যমন্ত্রী রাজি হয়েছেন।'

'বাঃ। তবে তো কোনও চিন্তাই নেই।'

'কি যে বলেন? চিত্রনাট্য না জমা দিলে টাকা দেবে না। বার্লিন আর কান ফেস্টিভ্যালে এন্ট্রি নিতে হলে ছবি শেষ করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু আমার মাথায় চিত্রনাট্যটা টুকরো টুকরো করে পাক খাচ্ছে, পুরো শেপ্ নিচ্ছে না। এটাই হয়েছে মুশকিল।' গোমড়া মুখে বলল স্বপ্নেন্দু।

'লিখে ফ্যালো। যা আসছে তাই লেখো? লেগে পড়ো।'

'মুশকিল হল, আমি ওই সিস্টেমটার বিরোধী। চিত্রনাট্য একবার কাগজে কলমে লিখে ফেললে সেটাকেই ফলো করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। চেষ্টা করলেও আপনি মেজর চেঞ্জ করতে পারবেন না। আপনার চিত্রনাট্য তো আমি দেখেছি। ছবি এঁকে ডায়ালগ বসিয়ে এমন করে রাখেন যে ফ্লোরে আপনাকে যে জানে সে-ও পরিচালনা করতে পারবে ওই চিত্রনাট্য অনুযায়ী। এটা কেয়ার নয়। প্রতি মুহূর্তে মেঘ শেপ নিচ্ছে আর ভাঙছে, সমুদ্র ঢেউ তুলেছে আবার ছিটকে যাচ্ছে। মানুষের থটপ্রসেসও তাই। অসীমের মতো। সীমার মধ্যে বাঁধলে কিরকম সাজানো মনে হয়। আচ্ছা, আপনার নিজের মধ্যে ছবিকে মাঝে মাঝে সাজানো মনে হয় না?' পরম বিশ্বাসে স্বপ্নেন্দু তাকাল ভদ্রলোকের দিকে।

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু ওরা তো চিত্রনাট্য না পেলে টাকা দেবে না বললে। টাকা না পেলে ছবি হবে কি করে?'

'ওইটেই তো মুশকিল। আমি এখন যা ভেবে নিয়ে চিত্রনাট্য লিখলাম, ঠিক শুটিঙের সময় মনে হতে পারে এর উল্টোটা করলে আরও ভাল হবে। তখন? কিন্তু উপায় নেই, লিখতেই হবে। ওই রকম বাঁধাধরা গত-এ বেঁচে থাকতে একদম ভাল লাগে না, জানেন! আবার যে সাবজেক্টটা এখন ভাবছি, কাল সকালে যদি মনে হয় ওটা ঠিক অ্যাপিল্ করছে না তখন কি করব?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'এটা একটা কঠিন সমস্যা। যাক গে, অন্য কথা বলো। কফি হাউসের খবর কি? ওখানকার বোদ্ধারা কে কেমন ভাবছে?'

'ভাবছে তো সবাই কিন্তু, যাক গে, চলি।'

'আরে, এই তো এলে! তুমি সেই আমেরিকান কাগজটাকে চিঠি লিখেছ?'

'হ্যাঁ। আমি লিখে দিয়েছি আপনার ওপর লেখার অথরিটি ভারতবর্ষে আমি ছাড়া কারও নেই। কথাটা সত্যি কি না তা আপনার কাছ থেকে কনফার্ম করে নিতে বলেছি। ও হ্যাঁ, একটা চিঠি লিখে দিন তো, এই ঠিকানায়', পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিল স্বপ্নেন্দু, 'এই ফরাসি প্রকাশকরা আপনার ওপর দু-দুটো বই ছেপেছে। কপি দরকার। আপনাকে নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে কিন্তু সেগুলো আমি নেব না।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'তুমি ফরাসি ভাষা জানো?'

'ও আমি ম্যানেজ করে নেব।'

ভদ্রলোক নিজের প্যাডে দুটো লাইন লিখে দিলেন ইংরেজিতে। শ্রীমান স্বপ্নেন্দুকে বই পাঠালে তিনি খুশি হবেন। সে তাঁর ওপর লেখার কথা ভাবছে।

কাগজটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়িয়ে স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন কিছু ভাবছেন?'

'বয়স হচ্ছে হে। চট করে কি ভাবনা মাথায় আসে!' উনি হেসে উঠলেন।

স্বপ্নেন্দু বেরিয়ে গেলে পরিচালক দরজা বন্ধ করলেন। তাঁকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন, 'কী ব্যাপার বল তো?'

'কিসের কি ব্যাপার?'

'তুমি এই ছেলেটাকে এত প্রশ্রয় দাও কেন?'

নিজের চেয়ারে বসে পরিচালক বললেন, 'আমার কাছে যারা আসে তারা শুধু প্রশংসাই করে যায়। আমি যা বলি তাতেই সায় দেয়। এর মাথায় ওসব নেই। ও যা ভাবে তাই বলে। শুনে মাঝে মাঝে আমিই ঘাবড়ে যাই।'

'কিন্তু একমাত্র ওকেই তুমি তোমার ওপর লেখার অধিকাব দিয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে কি?'

'ও সমস্ত পৃথিবীর যেখানে আমার ওপর কিছু লেখা হয়েছে তাই উদ্যোগী হয়ে সংগ্রহ করছে। বেশ কয়েক হাজার টাকার বই পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে।'

'ওরকম উদ্ভট যে ভাবে সে কি লিখবে?'

'সেই জন্যেই তো ওকে দায়িত্ব দিয়েছি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তার মানে?'

'দু'লাইন লিখেই ওর মনে হবে ঠিক হল না। অথবা কথাগুলো কেউ আগেই লিখে ফেলেছে, আবার শুরু করা দরকার। কোনওদিনও অর্ধেকটাও শেষ করতে পারবে না ও। অতএব লেখাটা জীবনেও শেষ হবে না। সেই জন্যেই দায়িত্ব দিয়েছি ওকে। কারণ ওর লেখা কখনও কোনও কাগজে ছাপার সুযোগ পাবে না। চা দাও।' পরিচালক আবার বই টেনে নিলেন।

সাতদিন ঘর থেকে নামমাত্র বের হল স্বপ্নেন্দু। চা আর দুবেলা খাওয়া ছাড়া বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কোনও যোগাযোগ রাখল না সে। এখন তার ধ্যানজ্ঞান হল চিত্রনাট্য লেখা। কিভাবে চিত্রনাট্য লিখতে হয় সেইসব প্রাথমিক শিক্ষা বহু বছর আগেই হয়ে গেছে তার। বিখ্যাত চিত্র নির্মাতাদের ছাপা চিত্রনাট্য আর ফিল্ম সোসাইটিগুলোর দেখানো বিদেশি ছবিগুলোর দৌলতে ও বিষয়ে তার কোন ঘাটতি নেই। সে কেবলই নিজেকে বলে যাচ্ছিল, ওঠো স্বপ্নেন্দু, জাগো। এই তোমার সামনে অপূর্ব সুযোগ। বাঙালি বাঙালি না করে এমন একটা ছবি তৈরি করো যা মানুষের ভিত্ কাঁপিয়ে দেবে। যে ছবি বোঝার জন্যে বাংলা ভাষা জানার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু পাতার পর পাতা গোল্লা পাকিয়ে ঘরের মেঝেতে ছুড়ে ফেলা তার কাজ একটুও এগোচ্ছিল না। ভালমানুষের মুখ কার মতো হবে? যীশুর মতো, বুদ্ধের মতো চৈতন্যদেবের মতো নাকি রামকৃষ্ণের মতো? সে মনস্থির করতে পারছিল না। ওইসব মুখ তো মহামানুষের, মানুষের নয়। একজন সাধারণ মানুষ, সে অলস অথবা পরিশ্রমী যে কোনও একটা হতে পারে মনমেজাজ অনুযায়ী অভিব্যক্তির হেরফেরে চরিত্র বদলে যায়। শিক্ষা মুখে পালিশ আনে এই মাত্র। কিন্তু লোভ অথবা অন্যান্য বৃত্তিগুলোকে দমন করার কায়দা যেহেতু মানুষ শিখে ফেলেছে তাই অভিব্যক্তিকেও নিয়ন্ত্রণে আনতে সে সমর্থ। অতএব মন্দমানুষও ভালমানুষ সেজে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। দারুণ বিপাকে পড়ল স্বপ্নেন্দু।

এই বাড়িটি স্বপ্নেন্দুর পূর্বপুরুষ বানিয়েছিলেন। তাঁরা এখন অতীত। স্বপ্নেন্দুর ভাই, অথবা বোন নেই। এমনকী তার মায়ের বাপের বাড়ির চেহারাও একই রকম। তার মা একমাত্র মেয়ে। মায়ের বাবা মা পূর্ববাংলা থেকে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছিলেন ছিন্নমূল হয়ে। এদেশে ঠিকমতো বসতে না বসতেই তাঁদের আয়ু শেষ হয়ে যায়। যেহেতু ভাড়া বাড়িতে ছিলেন তাই কোনও সম্পত্তি রেখে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর স্বপ্নেন্দুর বাবা মায়ের মাকে এবাড়িতে এনে রেখেছিলেন। কৈশোর পর্যন্ত সেই বৃদ্ধাকে স্বপ্নেন্দু দেখেছে। স্বপ্নেন্দুর বাবা মারা যান ওর সতেরো বছর বয়সে। ভদ্রলোক কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন পোস্ট অফিসে আর এই বড় বাড়িটির অনেকাংশ ভাড়া দিয়েছিলেন। তিনি নাকি আইনজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু কিছু বই ছাড়া তার কোনও প্রমাণ স্বপ্নেন্দু পায়নি। সেকালের কলকাতায় গরিব আইনজ্ঞ খুব কম দেখা যেত। স্বপ্নেন্দুর বাবা তাঁদের একজন। ষাট থেকে একশো টাকা ভাড়ায় যে পাঁচ ঘর ভাড়াটে এই বাড়িতে বাস করে তারা নিয়মিত ভাড়া দিয়ে যাচ্ছে। মা জীবিত থাকাকালীন ওই টাকায় দিব্যি চলে যেত বলে পড়াশুনা, আলোচনা আর দেখার জগতে স্বপ্নেন্দু আরামসে থাকতে পেরেছিল। প্রথমে

নাটক পরে চলচ্চিত্র তার প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। অতিরিক্ত পড়াশুনা তাকে এমন আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল যে প্রকৃত জ্ঞানীগুণী মহলে সে অবলীলায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারত। তাঁর মতে দু'তিনজনের বাইরে কেউ নাটক প্রযোজনা করতে পারেন না আর চলচ্চিত্রকার হিসেবে সে একজনকেই প্রবল শ্রদ্ধা করত। এই ব্যাপারটা অনেককেই বিস্মিত করতে পারত। ওরকম ব্যক্তিত্ববান চলচ্চিত্র পরিচালক যাঁকে সমস্ত বিশ্ব শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি দিয়েছে তাঁর কাছে পৌঁছে নিজের মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা অর্জন করল কী করে? যেহেতু কথাবলা ছাড়া স্বপ্নেন্দুর কোনও সৃষ্টি নেই তাই তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার লোকের অভাব শহরে ছিল না। অবশ্য এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তার ছিল না।

এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে স্বপ্নেন্দুকে যে খুব বিচলিত করছে বলা চলে না। সিগারেট ছাড়া তার কোনও নেশা নেই। মাঝেমধ্যে মদ খেয়ে সে দেখেছে। মদ্যপান করলে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা লোপ পায়। ভাবনাচিন্তা করা যায় না। অতএব মদ সম্পর্কে কোনও আকর্ষণ তার তৈরি হয়নি। ছাত্রাবস্থায় সে গাঁজা খাওয়ার কথা খুব ভাবত। গাঁজার নেশায় মানুষ নাকি অদ্ভুত সব কল্পনা করতে পারে। সাধুসন্ন্যাসীরা যখন ওই দ্রব্য সেবন করেন তখন গাঁজা খাওয়াতে কোনও অন্যায় থাকতে পারে না। সতেরো বছর বয়সেই মাকে ওই ইচ্ছার কথা জানায়। ভদ্রমহিলা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'সেকি? তুই গেঁজেল হবি?'

গেঁজেল শব্দটা কানে খট্ করে লেগেছিল। তাদের পাড়ার দু'জন প্রসিদ্ধ গেঁজেল ছিল। দু'জনের শরীর শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে গিয়েছিল, গালদুটো চিপসে গিয়ে হনু বেরিয়েছিল। তাদের চোখ সবসময় টকটকে থাকত। দু'জনেই একটা দোকানে বসে বিড়ি বাঁধত। স্বপ্নেন্দু বেশ কয়েকদিন ধরে লক্ষ করেছে ওরা পুতুলের মত বিড়ি বেঁধে যায়। হাতদুটো নড়াচড়া করছে যন্ত্রের মতো, শরীর স্থির। একদিন এক গেঁজেলকে একা পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, গাঁজা খাওয়ার পর আপনি স্বপ্ন দ্যাখেন?' লোকটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল। আগ্রহী হয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী ধরনের স্বপ্ন?' লোকটা ফিক্ করে হেসে বলেছিল, 'আমি বেশ লম্বা হয়ে শুয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছি। লোকজন কাঁধে করে মালা পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু রাস্তাটা ফুরোচ্ছে না।'

গাঁজা সম্পর্কে আগ্রহ সেদিনই চলে গিয়েছিল। তার অনেক পরে স্বপ্নেন্দু জানতে পারল এল এস ডি নামে একটা ট্যাবলেট আছে যা খেলে দারুণ দারুণ স্বপ্ন দেখা যায়। সে-সময় ড্রাগবিরোধী আন্দোলন তেমনভাবে শুরু হয়নি। ড্রাগের এমন বাহারি মেনু তখন তৈরি হয়নি। এল এস ডি খেয়ে ইউরোপ আমেরিকার নব্য প্রজন্ম বোহেমিয়ান হয়ে যাচ্ছে বলে একটা ধারণা চাউর হয়েছিল। কলকাতায় যেসব হিপিদের দেখা যেত তাদের কাছে নাকি এল এস ডি থাকত। ব্যাপারটা স্বপ্নেন্দুকে এত আগ্রহী করল যে সে এল এস ডি সংগ্রহে তৎপর হয়ে উঠল। যেসব আড্ডায় সে যেত সেখানে কথাটা পেড়ে লক্ষ করল কেউ হদিস জানে না। বাংলা মদের ঠেক জানা যত সহজ ঠিক তত কঠিন হয়ে দাঁড়াল এল এস ডি-র সন্ধান। খবরের কাগজে লেখা হয়েছিল খিদিরপুরের পুলিশ একটি চক্র ভেঙে দিয়েছে যারা শুকনো নেশা করত। খবরটা পড়ে স্বপ্নেন্দু ক-দিন খিদিরপুর অঞ্চলে ঘোরাফেরা করল। নেশার সন্ধানে আসা উটকো লোককে নেশাগ্রস্তরা পুলিশের লোক

www.boiRboi.blogspot.com

বলে মনে করে। অনেক নাজেহাল করার পর একজন তাকে নিয়ে গেল খিদিরপুর ব্রিজের নীচে যেখানে সবরকমের নেশার জোগান আছে। গাঁজা আফিঙ চণ্ডু থেকে চোলাই মদের জন্যে যারা ওখানে যায় তাদের কাছে এল এস ডি-র কোনও প্রয়োজন হয় না। স্বপ্নেন্দু হতাশ হল। এই কলকাতা শহরে ওই বস্তুটি রয়েছে অথচ সে তার হদিস পাচ্ছে না, অদ্ভুত যন্ত্রণায় সে ভুগছিল।

এক দুপুরবেলায় গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে বইয়ের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে সে সিনেমা বিষয়ক একটি ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল। তখন বেশ গরম। রাস্তায় লোকজন কম। স্বপ্নেন্দুর স্নান-খাওয়া হয়নি। তা নিয়ে দুশ্চিন্তাও ছিল না। হঠাৎ সে শুনল সবুজ হাতকাটা গেঞ্জি আর ময়লা পাজামা এবং হাওয়াই চটি পরা একটা হিপি গোছের লোক জিজ্ঞাসা করছে, 'সাদার স্ট্রিট, সাদার স্ট্রিট?'

লোকটা শহরে নতুন বুঝে সে কি ভাবে যেতে হবে বলতে গিয়ে মত পাল্টাল। এই হিপিটা এল এস ডি-র খবরাখবর রাখতে পারে। সে হেসে বলল, 'কাম উইদ মি।'

লোকটির একমুখ লালচে দাড়ি, কাঁধে একটা ত্রিপলের ব্যাগ, পাশে হাঁটতে লাগল। স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, কবে এসেছ কলকাতায়?'

'কাল সন্ধেবেলায়। এখান থেকে বেশি দূরে হবে না, তাই না?'

'না। কাছেই। তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'সানফ্রানসিসকো।'

'আমার নাম স্বপ্নেন্দু।'

'আমার এড। কলকাতা বেশ ভাল শহর।'

'ধন্যবাদ। আমি শুনেছি সানফ্রানসিসকো নাকি খুব সুন্দর শহর।' স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমি যদি কোনওদিন সিনেমা করতে পারি তাহলে একবার তোমাদের শহরে যাব।'

'ওখানে যাওয়ার জন্যে সিনেমা করতে হবে কেন?'

'সিনেমার পরিচালকদের তো নেমন্তন্ন করে নিয়ে যায়। এখনি যাওয়ার টাকা কোথায় পাব? আমরা তো তোমাদের মতো বড়লোক নই।'

এড হাসল, 'বড়লোক হলে দেখবে সব আছে সুখ নেই।'

লিন্ডসে স্ট্রিট হয়ে গ্লোবের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা ফাস্টফুডের দোকান থেকে তিন প্যাকেট খাবার চাইল এড। লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল, 'আঠারো টাকা লাগবে। আছে তো?'

এড আর পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা বের করল তা এক করলে চৌদ্দ টাকা হয়। এড একটু অসহায় ভঙ্গিতে ভাবতে লাগল কি করবে। স্বপ্নেন্দু পকেট থেকে আরও দশ টাকা বের করে এগিয়ে দিল, 'চার প্যাকেট দিয়ে দাও।'

এড বলল, 'চার প্যাকেট নিয়ে কি হবে?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'এক প্যাকেট আমার জন্যে। আমারও খিদে লেগেছে।'

এড বলল, 'ধন্যবাদ। তুমি আমার কাছে চার টাকা পাবে।'

সদর স্ট্রিটে পড়ে এড চিনতে পারল। বাঁ দিকে খানিকটা যাওয়ার পর ডান দিকের গলিতে ঢুকে পড়ল সে। দু'পাশের বাড়িগুলো বেশ পুরনো, স্যাঁতসেতে। এখানে কোনও

বাঙালি বাস করে না। কয়েকটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বাচ্চা গলিতে ক্রিকেট খেলছে চিৎকার করে। একটা নোনা ধরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এড বলল, 'দোতলায় আমরা আছি। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে খেতে চাও তাহলে ভাল হয়, টাকাটা দিয়ে দিতে পারি।'

বাড়ির ভেতর ঢুকে বেশ হতবাক হয়ে গিয়েছিল স্বপ্নেন্দু। মাঝারি সাইজের ঘর ঠিক কতগুলো আছে বোঝা মুশকিল কিন্তু প্রতিটি ঘরে বিদেশিনীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সদর দরজার বাঁ দিকে ছোট্ট অফিসঘরের সামনে নো ভ্যাকান্সি বোর্ড ঝুলছে। একটি বিশালদেহী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অফিসে বসে আছে। দোতলার একটি বন্ধ দরজায় নক্ করল এড। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দাঁড়াল একটি লম্বা মেয়ে যার পরনে খাটো প্যান্ট আর ব্রাউজ। এরকম পোশাকের মিলন এই প্রথম দেখল স্বপ্নেন্দু। মেয়েটি বেশ রাগত গলায় অদ্ভুত উচ্চারণে যে ইংরেজি বলল তার কিছুটা বুঝল স্বপ্নেন্দু। এত দেরি করে ফিরেছে এড যে ওরা দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। ঘরের ভেতর দুটো তক্তপোশে বিছানা পাতা। তার একটিতে যে মেয়েটি বসে আছে সে বয়সে বেশ ছোট। তার পরনে লুঙ্গি আর সাদা গেঞ্জি যা ক'দিন কাচা হয়নি।

এড হাতের প্যাকেট দেখিয়ে বলল, 'আমি রাস্তাটা একটু গুলিয়ে ফেলেছিলাম। ইনি না থাকলে আরও দেরি হত। তোমাদের জন্যে লাঞ্চ এনেছি।'

বড় মেয়েটি বেশ রেগে ছিল। একই ভঙ্গিতে বলল, 'আমরা যেন তোমার জন্যে বসে আছি। হ্যাম আর রুটি কিনে এনেছি, সঙ্গে বিয়ার। তা একে সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন?'

এড বলল, 'ওর নাম, কি নাম যেন?' মনে করতে না পেরে সে স্বপ্নেন্দুকেই জিজ্ঞাসা করল। স্বপ্নেন্দুর এখন বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। তাকে দেখে মেয়েটি যে বিরক্ত তা খোলাখুলি প্রকাশ করেছে। এরপর তার থাকা উচিত নয়। ওর মনের কথা আন্দাজ করে এড বলল, 'টিনার কথায় কিছু মনে কোরো না, রেগে গেলে ও রাবিশ কথা বলে। নামটা বলো!'

স্বপ্নেন্দু নিজের নাম বলে ইংরেজিতে তার মানে বুঝিয়ে দিল।

এবার খাটে বসা বাচ্চা মেয়েটা বলে উঠল, 'ওয়েলকাম মিস্টার ড্রিম।' সঙ্গে সঙ্গে টিনা বলল, 'ও বলল স্বপ্নের চাঁদ, স্বপ্ন নয়।'

এড বলল, 'ঠিক আছে, চাঁদ বলা যাক। চাঁদ আমার কাছে চারটে টাকা পায়। এগুলো কিনতে কম পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ওর খিদে পেয়ে গেছে। এসো শুরু করা যাক।'

টিনা একটু শান্ত হয়ে প্যাকেট খুলল। দুটো খাটের মাঝখানের মেঝেতে ওরা বসে পড়তেই স্বপ্নেন্দু একপাশে জায়গা করে নিল। খেতে খেতে এড বলল, 'তোমরা জেনে খুশি হবে চাঁদ ভবিষ্যতে সিনেমার পরিচালক হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়েটি চোখ বড় করল খাবার মুখে নিয়ে। গিলে ফেলে বলল, 'তাই? ওঃ। আমাকে তুমি নায়িকা করবে? কিন্তু জামাকাপড় খুলতে পারব না, আগেই বলে দিলাম।'

টিনা ধমকাল, 'এই লিজা। চুপ।'

খেতে খেতে স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি সবাই সানফ্রানসিসকো থেকে এসেছ?'

লিজা বলল, 'না। আমি আসছি বাফেলো থেকে আর টিনা পিটাসবার্গ থেকে। হিথরো

www.boiRboi.blogspot.com

এয়ারপোর্টে আমাদের আলাপ হয়। শি ইজ সো নাইস!' বলে বাঁ হাতটা টিনার বুকে বুলিয়ে দিল। টিনা আদরে হাসি হাসল।

এড বলল, 'আসলে ওদের একজন কুলি কাম বডিগার্ড দরকার ছিল। আর সেই সময় আমিও হিথরোতে নেমেছিলাম। দেখে শুনে ওরা আমাকে পাকড়াও করল।'

টিনা বলল, 'ব্যস, আমরা তিনজনের একটা দল হয়ে গেলাম।'

লিজা বলল, 'তুমি মোটেই আমাদের কুলি নও। আমাদের মাল আমরাই বই। বডিগার্ডের প্রয়োজন নেই, থাকলে একা একা বাড়ি থেকে বের হতাম না। পুরুষ মানুষের প্রয়োজন যে জন্যে তাও তোমার কাছে আমরা চাইনি। আমি আর টিনা খুব ভাল বন্ধু হয়ে গিয়েছি, ওসব প্রয়োজন দরকার পড়ে না। তবে তুমি লোকটা ভাল, তাই সঙ্গে আছ।'

টিনা চোখ পাকাল, 'লি-জা?'

লিজা ভালমানুষের মুখ করল, 'কি?'

টিনা বলল, 'তুমি এমন করে বললে যেন এডের সঙ্গে ভাজা মাছ উল্টে খাওনি! যখন বলছ, পুরোটা বলো।'

লিজা হাসল, 'সে তো ও বেচারার মুখ দেখে যখন কষ্ট হয় তখন। ওয়েল, স্বীকার করছি, আমি বাই।'

খাবার খেয়ে একই বোতল থেকে বিয়ার খেল ওরা। বিয়ার খুব তেতো লাগে স্বপ্নেন্দুর। এর আগে একবার কোন একটা পিকনিকে গিয়ে এক ঢোঁক খেয়েছিল সে। কিন্তু খাবার খাওয়ার পর এত জল তেষ্টা পেয়েছিল যে সে টিনার বাড়ানো বোতল নিতে দ্বিধা করল না। তিতকুটে তরল পদার্থ দু ঢোঁক গলায় চালান করে সে যেন কিছুটা আরাম পেল।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ওদের দিকে এগিয়ে ধরতেই মেয়েরা মাথা নাড়ল। লিজা বলল, 'নো স্মোকিং প্লিজ।'

এড বলল, 'আমরা বেনারসে চরস খাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। খুব বর্বর ব্যাপার। নেশা যদি আলতো আরামে না করা যায় তাহলে মজা কোথায়?' সে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা একটা ব্যাগের তালা খুলতে লাগল।

টিনা জিজ্ঞাসা করল, 'কী করছ?'

এড বলল, 'চাঁদকে টাকা দিতে হবে।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'সরি। এই যে তোমরা এতক্ষণ একসঙ্গে খেলে, গল্প করলে, আমি তোমাদের বন্ধু হিসেবে নিয়েছি। এরপর যদি সামান্য চার টাকা শোধ করতে চাও তাহলে আমি খুব অপমানিত বোধ করব।'

টিনা হাত নাড়ল, 'ও ঠিক বলেছে। চলে এসো। চাঁদ, তুমি এখন কি করবে? কোথাও যাওয়ার আছে? কোনও কাজ?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'না। আমি একটু ভাবব।'

'ভাববে? মানে?'

'ওয়েল, আমি স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করি। ঘুমিয়ে পড়লে তো স্বপ্ন দেখবই এমন কোনও স্থিরতা নেই। গত এক সপ্তাহে ঘুমিয়ে আমি একটাও স্বপ্ন দেখিনি। তাই জেগে জেগে দেখার চেষ্টা করি।'

'কি রকম?' টিনার আগ্রহ বাড়ছিল।

'আমি একটা ছোট বৃত্ত কল্পনা করে নিই। বৃত্তের বাইরে পৃথিবীটা অন্ধকার। সেখানে কিছুই দেখা যায় না। বৃত্তের ভেতরে ছোট্ট জায়গাটা একটা রাস্তার ওপর যদি ফেলে রাখি তাহলে সেই জায়গা দিয়ে যেসব মানুষ হেঁটে যায় তাদের দেখার চেষ্টা করি। এক একটা মানুষ এক একরকম। ভাল করে দেখার আগেই সে বৃত্তের বাইরে চলে যায়। সবাই নয়, এক একজন মনে থেকে যায়। যে থাকে তাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করি।' স্বপ্নেন্দু হাসল।

টিনা বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক। তুমি বিবাহিত?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'না!'

টিনা বলল, 'তাহলে আমাদের দলে ঢুকে পড়ো। এখান থেকে আমরা নেপালে যাব। তারপর ব্যাঙ্কক। ধরো একমাস। তারপর আমরা যে যার শহরে ফিরে যাব। তুমি থাকলে মনে হয় বেশ মজা হবে।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'গেলে ভাল হত। কিন্তু আমার অত টাকা নেই। তাছাড়া পাশপোর্ট করানো হয়নি। ওটার যে প্রয়োজন হবে ভাবিওনি।'

এড বলল, 'নেশা করে স্বপ্ন দেখতে পারো না?'

'নেশা করলে নিজের ওপর কন্ট্রোল থাকে না, স্বপ্ন দেখব কি করে। তবে শুনেছি এল এস ডি খেলে নাকি ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখা যায়।'

টিনা এডের দিকে তাকাল, 'লেটস ট্রাই।'

এড বলল, 'কোথায় পাব? ও জিনিস তো দোকানে বিক্রি হওয়ার কথা নয়।'

লিজা বলল, 'আমি একটা চেষ্টা করতে পারি।'

টিনা বলল, 'কি রকম?'

লিজা উঠে পড়ল, 'তুমি আমার সঙ্গে চল। টিনা উঠল। লিজা একটা চামড়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে টিনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এড বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে মানালি আর হরিদ্বারে যাব। কিন্তু এরা এত নেপাল নেপাল করছে, যে এবার যাওয়া হবে না। ট্রেনে অনেক সময় লাগে?'

'যাওয়া আসা প্রায় পাঁচ দিন।'

'মাই গড।'

'তুমি সানফ্রানসিসকোতে কী করো?'

'আমার বাবার একটা ডিপার্টমেন্টাল শপ আছে। বিশাল ব্যাপার। হাঁপিয়ে উঠলেই আমি পালিয়ে যাই। গত বছর গিয়েছিলাম আফ্রিকায়। একাই। তুমি একটা পাশপোর্ট যোগাড় করিয়ে কোনও রকমে টিকিট কেটে চলে এসো আমার ওখানে।'

'গিয়ে কি হবে? তুমি তো প্রায়ই পালাবে।'

'তা অবশ্য।' পকেট থেকে একটা কাগজ কলম বের করে ফসফস করে লিখে এগিয়ে দিল এড, 'তবু রাখো। আমার ঠিকানা।'

মেয়েরা ফিরে এল হাসিমুখে। জানা গেল ওরা ম্যানেজ করেছে। দুটো ফরাসি মেয়ে নাকি কালই ম্যানেজারকে ম্যানেজ করেছে। দুটো ফরাসি মেয়ে নাকি কালই ম্যানেজারকে থাকার পয়সা না দিয়ে এল এস ডি দিয়ে গিয়েছিল। আটটা ট্যাবলেট চারশো টাকায়

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়েছে লোকটা। আবার বলেছে যদি পুলিশ ওদের ধরে তাহলে ঘুণাক্ষরে যেন না বলে কোত্থেকে ওরা পেয়েছে। বলতে বলতে লিজা হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'লোকটা বারগেইন করার সময় যেভাবে টিনার থাই-এর দিকে তাকাচ্ছিল তাতে আমি ভাবলাম বিনা পয়সায় দিয়ে দেবে।'

ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হল। যদিও দিনের আলো ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে সেই অন্ধকারকে ছায়া ছায়া করে দিয়েছিল। দরজা বন্ধ করে টিনা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি কেউ জানো কিভাবে এটা খেতে হয়? লোকটা বলল লজেন্সের মতো চুষলেই চলবে।'

লিজা বলল, 'যা বলেছে তাই করা যাক।'

টিনা প্রত্যেককে একটা করে দিল। স্বপ্নেন্দু দেখল বেশ বড়সড় ট্যাবলেট, সাদাটে। প্রত্যেকে ওটা মুখে পুরে দিয়ে স্বাদ অনুভব করার চেষ্টা করল। টিনা বলল, 'স্বাদহীন।' লিজা বলল, 'ওটাই তো একধরনের স্বাদ।'

এড বলল, 'আমি এখনও কিছু ফিল করছি না। একটা গান গাওয়া যাক।'

এড গান ধরল। মেয়ে দুটো হাততালি দিয়ে বসে বসেই দুলতে লাগল। স্বপ্নেন্দু এটুকু খেয়াল করতে পেরেছিল, এডের গলা জড়িয়ে যাচ্ছে। লিজা অদ্ভুত গলায় চিৎকার করে উঠল, 'এই, আমার যেন কিছু হচ্ছে।'

টিনা বলল, 'শাট আপ।' ওরও স্বর জড়ানো।

স্বপ্নেন্দুর মনে হচ্ছিল শরীরটা কিরকম গুলিয়ে উঠল।

একটা হালকা নীল আলো আকাশ থেকে নেমে আসছে এঁকেবেঁকে। স্বপ্নেন্দু লাফিয়ে সেই আলো ছুঁতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছিল না সে। স্বপ্নেন্দু আর একটু লাফাল। তার শরীরটা এখন শূন্যে। আরব্যরজনীর সেই জাদু কার্পেট ছাড়াই সে বেশ শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারছে। মহাকাশচারীরা এইভাবেই মাধ্যাকর্ষণের বাইরে ভেসে বেড়ায়। ওই নীল আলোটাকে ধরতে পারলেই সে স্বপ্ন দেখতে পারবে। কি স্বপ্ন দেখা যায়? এমন একটা স্বপ্ন যা মানুষ কখনও দ্যাখেনি। দেখে নিয়ে যদি চিত্রনাট্য লিখে ফেলতে পারে তাহলে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে দেখবে। বাঃ, নেশাটা তো দিব্যি, সে যা ভাবছে তাই হচ্ছে। তার বোধবুদ্ধিকে অবশ করে দিচ্ছে না।

'হাই চাঁদ। চোখ খোলো।' এডের গলা কানে এল।

'হয়তো ওরটা জেনুইন। তাই স্বপ্ন দেখেছে ও।' টিনার গলা।

এড বলল, 'হতেই পারে না। লোকটা তোমাদের বোকা বানিয়েছে। এল সি ডি-র নাম করে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট দিয়েছে।'

সংলাপগুলো পরিষ্কার শুনতে পেল স্বপ্নেন্দু। সে ধীরে ধীরে চোখ খুলল। তিনটে মুখ তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে।

লিজা বলল, 'তুমি কি ফিল করছ চাঁদ? আমাকে দেখতে পাচ্ছ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল স্বপ্নেন্দু। এখন কোথাও সেই নীল আলো নেই। সে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে না। এই ঘরের মেঝের ওপর বাবু হয়েই আগের মতো আছে। তাহলে এতক্ষণ সে নেহাতই কল্পনা করে যাচ্ছিল? এল সি ডি-র বদলে অন্য কিছু খেয়েছে সে?

টিনা উঠল, 'প্রতিবাদ করা উচিত। লোকটা দিনের আলোয় আমাদের ঠকাল এটা

মেনে নেওয়া যায় না।'

লিজা বলল, 'ছেড়ে দাও, বিদেশে এসে ঝামেলায় পড়ার কি দরকার?'

টিনা বলল, 'আমাদের বোকা ভেবে লোকটা হাসবে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। চাঁদ, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? তোমার দেশের লোক আমাদের ঠকাচ্ছে, তোমারও প্রতিবাদ করা উচিত।'

অকস্মাৎ খুব রেগে গেল স্বপ্নেন্দু। সেদিনের আগে এবং পরে সে কখনও রেগে যায়নি। টিনার সঙ্গে নীচে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন লোকটা?'

টিনা দেখিয়ে দিল অফিসঘরে বসা লোকটিকে। তারপর এগিয়ে গিয়ে লোকটির সামনে বাকি চারটে ট্যাবলেট রাখল। স্বপ্নেন্দু হিসহিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'মিথ্যে কথা বলে এদের ঠকিয়েছেন কেন?'

'ঠকিয়েছি? আমি? আপনারা ভুল করছেন।'

'আপনি এল এস ডি বলে চারশো টাকা নিয়ে এইরকম আটটা ট্যাবলেট দেননি? বিদেশি পেয়ে আপনি ঠকিয়ে পার পাবেন বলে ভেবেছেন?'

'আস্তে কথা বলুন স্যার। কেউ পুলিশের কানে তুলে দিলে আপনারা বিপদে পড়বেন, আমিও ফেঁসে যাব। হ্যাঁ, বলুন, কি অন্যায় হয়েছে?'

'এগুলো এল এস ডি নয়।' টিনা বলল।

'সেকি? দেখুন, কাকে বিশ্বাস করব। গতকাল আপনার মতো বিদেশি ওই জিনিস আমাকে দিয়ে গেল টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে বলে। আমি বিশ্বাস করে নিলাম। এল এস ডি জানার পর ওগুলো ঠিক কি না খেয়ে দেখার সাহস আমার হয়নি। ছি ছি ছি!। বিশ্বাস করুন আমি ওদের কথামতো আপনাকে দিয়েছিলাম ম্যাডাম। ঠিক আছে, আপনি দুশো টাকা ফেরত নিয়ে যান।'

লোকটি ড্রয়ার খুলে দুটো একশো টাকার নোট কাউন্টারে রেখে ট্যাবলেট চারটে নিয়ে নিল, 'কী যুগ পড়েছে। ছি ছি ছি।'

লোকটা দুশো টাকা ফেরত দিতেই স্বপ্নেন্দুর সব রাগ ফুরিয়ে গিয়েছিল। টিনা বলল, 'কিন্তু টাকা চাই না, আসল জিনিস চাই।'

'বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, আমার কাছে আর ও জিনিস নেই। তবে—।'

'তবে?' টিনা জিজ্ঞাসা করল।

'শুকনো নেশা চলবে? মানালি থেকে একজন নিয়ে এসে আমাকে দিয়েছে। দুটো টান দিলেই মেজাজ হয়ে যাবে। রিয়েল ইন্ডিয়ান ড্রাগ।'

'কী জিনিস?' টিনা জিজ্ঞাসা করল।

'রিফাইন্ড গাঁজা। পুলিশ জানলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনারা খেয়ে টাকা দেবেন।' লোকটা চট করে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর একটা ছোট্ট প্যাকেট এনে টিনার হাতে দিয়ে বলল, 'দিনটাকে উপভোগ করুন।'

টিনা দুশো টাকা আর প্যাকেটটা তুলে ওপরে চলে এল। সঙ্গে আসার সময় স্বপ্নেন্দুর মনে পড়ছিল সেই বিড়িবাঁধা গেঁজেলটার কথা। গাঁজা খেলেই নিজের শবযাত্রার দৃশ্য দেখতে হবে। এদের নিষেধ করতে গিয়েও থেমে গেল। নেশা করবে বলে এরা খেপে

www.boiRboi.blogspot.com

উঠেছে।

ঘরে ঢুকে ওরা দেখল লিজা এডের কোলে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। টিনা নীচে যা ঘটেছিল বলতেই লিজা লাফ দিয়ে উঠে বসল। ওরা দরজা বন্ধ করতে যেতেই স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমি যদি চলে যাই তাহলে তোমরা কিছু মনে করবে কি? মানে, আমি গাঁজা খেতে চাই না।'

'হোয়াই?' এড জিজ্ঞাসা করল।

'ওটা বোধহয় আমার ভাল লাগবে না।'

'তুমি এর আগে খেয়েছ?'

'না। তবে শুনেছি।'

টিনা বলল, 'আউ, কাম অন, আমাদের সঙ্গে খেলে হয়তো অন্যরকম লাগবে। হয়তো শ্রেষ্ঠ স্বপ্নটা আজই দেখতে পাবে।'

ওরা প্যাকেট খুলল। দুটো ছোট্ট কলকে আর গাঁজা বেশ পেশাদারি ভঙ্গিতে প্যাক করা। এড বলল, 'সানফ্রানসিসকোতে আমি শুনেছি মানালিতে দারুণ গাঁজা পাওয়া যায়। বেনারসে আমি দেখেছি কি করে ওটা খেতে হয়।'

এড কলকেতে গাঁজা পুরে দেশলাই জ্বেলে ধরাবার চেষ্টা করল। ঘরে বেশ কটু গন্ধ পাক খাচ্ছে। দু'হাতে কলকে ধরে সে টানতে লাগল। ভক্‌ভক্‌ করে ধোঁয়া বের হল অনেকটা। এড বলল, 'আঃ।'

সঙ্গে সঙ্গে টিনা ওর হাত থেকে কলকে কেড়ে নিয়ে বেশ শব্দ করে টানতে লাগল। টেনে কাশতে লাগল কিন্তু কলকে ছাড়ল না। তিনবার টানার পর লিজা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কলকের দখল নিল। স্বপ্নেন্দু দেখতে লাগল। কাশি, কলকে টানার আওয়াজ, ধোঁয়া এখন এই ঘরে পাক খাচ্ছে। লিজার হাতে আগুন নিভে আসছিল বলে এড সেটা কেড়ে নিয়ে আবার গাঁজা পুরে কলকেটাকে সচল করল। এখন তিনজনের কারও স্বপ্নেন্দুর কথা খেয়ালে নেই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিনজনই কথা বলা বন্ধ করল। প্রত্যেকের চোখ ঢুলুঢুলু। এখন আর আগের মতো জোর করে কলকের দখল নিচ্ছে না কেউ। মৃদু টান দিয়েই হাতবদল করছে। লিজা প্রথমে টেকুর তুলল। তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল এডের পায়ের ওপর। এডের মাথাটা পেছন দিকে হেলে খাটের ওপর জায়গা করে নিল। কলকে হাতে নিয়ে জড়ানো গলায় টিনা লিজার গালে খোঁচা মারতে লাগল, 'লিজা, মাই ডার্লিং, আমার কাছে এসো। এড তোমার কেউ নয়। আমিই সব।' ওর হাত থেকে কলকে পড়ে যাচ্ছে দেখে স্বপ্নেন্দু সেটাকে ধরে মাটিতে শুইয়ে রাখল। টিনা হাই তুলে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

এখনও সেই বিকেলটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনটে শরীর বিবশ হয়ে পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। মাঝেমাঝে এর হাত নড়ে উঠেছে, ওর পা। ঠোঁট মোচড়াচ্ছে কেউ। ওরা কি স্বপ্ন দেখেছিল? উত্তরটা আজ পর্যন্ত জানা হল না। কারণ কিছুক্ষণ বসার পর তার মনে হয়েছিল এরা যদি মরে যায়? চোলাই মদে বিষ থাকায় মানুষ মারা যায় বলে কাগজে খবর বের হয়, ভেজাল গাঁজায় তো সেই একই ঘটনা ঘটতে পারে। ভেজাল যদি না-ও হয়, গাঁজার টানে অনেকেই হার্টফেল করতে পারে। এদের কেউ একজন যদি

মারা যায় তাহলে পুলিশ তাকে ধরবেই। এই ঘরে সে একা সুস্থ হয়ে বসে আছে আর তিনজন বিদেশি ছেলেমেয়ে মরে গিয়েছে, পুলিশকে সে কী বোঝাবে? সে যদি সত্যি কথা বলে কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। তিনটে হিপি ছেলেমেয়ে তাদের ডেরায় অচেনা লোককে এনে গাঁজা খেয়ে মরে গেছে, কাগজে খবর বের হলে তাকে বাকি জীবন জেলে কাটাতে হতে পারে, এমন কি ফাঁসিও। স্বপ্নেন্দু উঠল। এখনও টিনার মুখ মনে পড়ে। তার পায়ের কাছে নিঃসাড়ে পড়েছিল।

দরজা খুলে, সেটাকে ভেজিয়ে বাইরে বের হতেই ওপাশের একটি ঘর থেকে চিৎকার ভেসে এল। একটি শ্বেতাঙ্গিনী চিৎকার করছে। সেই অবস্থায় একজন মধ্যবয়সী ভারতীয় হিপির বুকের জামা মুঠোয় ধরে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে বাইরে টেনে নিয়ে এল মেয়েটি। কৌতূহল হলেও দাঁড়াবার সাহস পেল না স্বপ্নেন্দু। নীচে নামতে গিয়ে দেখল ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠে আসছে গোলমাল থামাতে। স্বপ্নেন্দুকে লক্ষ করল না লোকটা। বাইরে বেরিয়ে এসে জোরে জোরে হেঁটেছিল সে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে পার্ক স্ট্রিটে চলে এসে বাসে উঠেছিল। যদি কেউ তাকে অনুসরণ করে এই ভয়ে সে বালিগঞ্জের বাসে উঠে বসেছিল। সেখান থেকে হাওড়া। তারপর সন্ধের অন্ধকারে একা একা হেঁটে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিল কেউ তার পেছনে নেই। শ্যামবাজারের বাড়িতে এসে নিজেকে ফিরে পেতে সেই রাত্রে অন্তত আধঘণ্টা সময় লেগেছিল।

পরের দিন সবকটা কাগজ খুঁটিয়ে দেখেছিল স্বপ্নেন্দু। তিন বিদেশি ছেলেমেয়ের মৃত্যুর খবর কোথাও ছাপা হয়নি। সেটা জানার পর সে একটু সুস্থ হয়েছিল। বেলা বাড়ার পর মনে হয়েছিল একবার গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে আসে। টিনার ব্যবহার তার ভাল লেগেছিল, এডকেও মন্দ মনে হয়নি। এডের লিখে দেওয়া ঠিকানা সে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল অনেক কাল। ইচ্ছে হলেও কিরকম একটা সঙ্কোচ প্রবল হওয়ায় যেতে পারেনি সে। কিন্তু ক্রমশ ওই তিনজন, বাড়িটা, বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া বিদেশি বিদেশিনীরা তার চোখের সামনে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। কলকাতার সদর স্ট্রিটের একটি বাড়ির প্রতিটি ঘরের বিদেশি বাসিন্দারা একটা আন্তর্জাতিক চেহারা নিয়ে নিল। তখন মনে হত এদের নিয়ে, ওই বাড়িটিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র রেখে দারুণ ছবি বানানো যায়। কিন্তু মুশকিল হল, মনে হওয়া কোনও ভাবনাকে দীর্ঘকাল মন ধরে রাখতে চায় না। সামান্য সময় যেতে না যেতেই ফাঁকফোকর বেরিয়ে পড়তে শুরু করে।

এই যেমন, 'ভালমানুষ মন্দমানুষ' ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে সে যা ভাবছে গত সাত দিন ধরে তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে রাত ফুরোলেই। স্বপ্নেন্দু বেশ কাতর হয়ে পড়েছিল। সাত দিন বাদে সে আবার বাইরে বের হল। এই সাত দিন সে দাড়ি কামায়নি, কোনওদিন স্নান করেছে, কোনওদিন করেনি। বাড়ির সামনে সেলুনে গেল সে দাঁড়ি কামাতে। রেডিওতে এফ এম বাজছে। সে দেখল চেয়ারগুলো খালি আছে। স্বপ্নেন্দু বলল, 'একটু দাড়ি কামাতে হবে ভাই।'

সেলুনের মালিক যতীন এ পাড়ারই বাসিন্দা। স্বপ্নেন্দুকে দেখে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে এসো এসো দাদা। ক'দিন ধরে তোমার কথা ভাবছিলাম।'

'কেন?' স্বপ্নেন্দুর কপালে ভাঁজ পড়ল।

www.boiRboi.blogspot.com

'তুমি মাঝে মাঝে দাড়ি কামাতে আসো, রোজ কামাও না আমাদের কাছে, নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় করেছি। যদি করে থাকি, মাপ করে দাও দাদা।'

'না, না অন্যায় কেন করবেন! নিয়ম করে কাটা হয় না—।'

'কেন? এ ঠিক নয়। তোমার সঙ্গে কত বড় বড় মানুষের আলাপ আছে বলে শুনেছি, তোমার গালে দাড়ি থাকলে এ পাড়ার বদনাম হয়ে যাবে।' যতীন হাসল, 'এসো, এই চেয়ারে বসো। আমিই কামিয়ে দিচ্ছি।' বরফে গাল ভিজিয়ে, ভাল সাবান গালে বুলিয়ে পরম যত্নে দাড়ি কামিয়ে দিয়ে আফটার শেভ লোশন গালে বুলিয়ে দিল যতীন। এগুলো অন্যান্য বার করা হয় না বলে সঙ্কুচিত স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিতে হবে।'

এক হাত জিভ বের করে যতীন, 'ছি ছি। তোমার কাছে টাকা নেব কি?'

'বাঃ। এটা তো ব্যবসা, টাকা নেবেন না কেন?'

'তাহলে কথা দিতে হবে রোজ আসবে দাদা!'

'দেখি!'

'তুমি কি পয়সার জন্যে ভাবছ দাদা? ছি ছি। যতীন অত চামার নয়। তোমার যবে ইচ্ছে তবে দিও। ঠিক আছে, এই খাতায় না হয় লিখে রাখা যাবে। হাতে মাল এলে শোধ কোরো। কোনও তাড়াহুড়ো নেই।' যতীন একটা খাতা দেখাল।

'না, না, ধার বাড়ানো ঠিক নয়।'

'আরে। একে ধার বলছ কেন? আমার টাকা তোমার কাছে থাকছে। তাহলে ওই কথা থাকল। রোজ আসতে হবে, দরকার মনে হলে দু'বেলা কামাতে পার। এই তোরা তো দাদাকে চিনিস, আমি না থাকলেও যত্ন করে কামিয়ে দিবি। আচ্ছা—।'

রাস্তায় পা দিয়ে স্বপ্নেন্দু ঈশ্বরের কাছে আরও কৃতজ্ঞ হল। পৃথিবীতে ভালমানুষের সংখ্যা হু হু বেড়ে যাচ্ছে। আর এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার ছবির থিমটা কত জরুরি হয়ে উঠেছে।

ফড়েপুকুরের মোড়ে যে চায়ের দোকানটা রয়েছে সেখানে খুব সিরিয়াস আলোচনা হয়। স্বপ্নেন্দু সেখানে পা রাখামাত্র একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে, স্বপ্নদা এসে গিয়েছে। কোথায় থাকো গো?'

রেস্টুরেন্টের মালিক বলল, 'কি মশাই একেবারে যে বেপাত্তা। আপনার বাড়িতে টুঁ মারব ভাবছিলাম। আটাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা।'

'এত?' স্বপ্নেন্দু মিনমিনে গলায় বলল।

'চেক করুন। সব লেখা আছে। খাওয়ার সময় মনে থাকে না কেন?' সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নেন্দুর মনে হল এই লোকটাকে কি মন্দমানুষ বলা যায়? পাওনা টাকা যে চায় সে কি মন্দমানুষ হবে? সবাই যদি ধার রেখে শোধ না করে তাহলে এই লোকটার ব্যবসা উঠে যাবে, না খেয়ে মরবে। সমস্যা হয়ে গেল।

পকেটে তিরিশটা টাকা ছিল। তা থেকে কুড়িটা বের করে কাউন্টারে রেখে স্বপ্নেন্দু বলল, 'এখন এটা রাখুন।'

যে ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠেছিল স্বপ্নেন্দুকে দেখে সে এবার অর্ডার দিল, 'এই, পাঁচটা ডাবল হাফ, স্বপ্নদার অ্যাকাউন্টে।'

স্বপ্নেন্দু ওদের টেবিলে গিয়ে বসতেই লক্ষ করল শুদ্ধদেব সেন গম্ভীর মুখে পায়চারি খাচ্ছেন। শুদ্ধদেবের একটি নাটকের দল আছে। গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম সারির দল। নিজের চারপাশে সবসময় একটা গম্ভীর গম্ভীর বাতাবরণ তৈরি করে রাখেন।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নাকি রাইটার্সে গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'কি ব্যাপার?'

'এই একটু গেলাম।'

শুদ্ধদেব বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি বাংলা ভাষায় কথা বলেন?'

'মানে?'

'এই একটু গেলাম কী কোনও প্রশ্নের জবাব হয়?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কেউ তার স্টাইলে কথা যদি বলে তাতে আপনার আপত্তি হচ্ছে কেন? এক ছকে চললে ভাষার অবস্থা মরা নদীর মতো হয়ে যাবে।'

'দারুণ বললে স্বপ্নদা। তুমি শুদ্ধদার নতুন নাটক দেখেছ?'

'মূল নাটকটা পড়া আছে।' স্বপ্নেন্দু অন্যদিকে তাকাল।

ছেলেটি প্রতিবাদ করল, 'মূল নাটক মানে? বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে নাটক শুদ্ধদেব সেন।'

শুদ্ধদেব বললেন, 'এক্সকিউজ মি! এভাবে আর কতদিন চালাবেন? মলাট দেখে সমালোচনা করা, কল্পিত একটা ধারণা চাউর করে বিদগ্ধ সাজা—!'

চা এসে গিয়েছিল। শুদ্ধদেবের সামনে কাপ এগিয়ে দিয়ে স্বপ্নেন্দু বলল, 'খান। স্পেনের একজন নাট্যকার বছর দশেক আগে যে নাটক লিখেছিলেন তার সমালোচনা ছাপা হয়েছিল লন্ডনের 'প্রসেনিয়াম' কাগজে। সমালোচনার সময় গল্পটাও বলে দিয়েছিলেন সমালোচক। সমস্যাটা আমাদের দেশে কখনই তীব্র হয়নি। পরিবারের একজন হিজড়ে হয়ে জন্মেছে এবং তার মা সেটাকে আড়াল করে রেখেছেন। এমনকী ভাইবোনরাও জানত না। সে বড় হয়ে একটা মেয়ের প্রেমে পড়ল।'

ছেলেটি বলে উঠল, 'আই বাপ, নাটকটা তো এইরকমই।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'হতে পারে। বিখ্যাত মানুষদের চিন্তাভাবনায় অনেক সময় মিল দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে হয়তো।'

শুদ্ধদেবের মুখ লাল হয়ে গেল, 'স্বপেন্দু, আপনি যা বলছেন তা সত্যি হতে পারে কিন্তু এই নাটক আমার অভিজ্ঞতা থেকে লেখা।'

ছেলেটি বলল, 'সন্দীপনবাবুও নাকি বিদেশি নাটক থেকে থিম মেরে নিজের নাটক বলে চালান। ওর পরের নাটকটা কি জানেন? স্বামী তার যুবতী স্ত্রীকে খুশি করতে পারছেন না বলে নতুন নতুন ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন যাতে স্ত্রী তাকে ছেড়ে না যায়। বুঝুন! এটা বাঙালির নাটক?'

শুদ্ধদেব হাসলেন, 'হয়তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে করছেন।'

স্বপ্নেন্দুর ভাল লাগল না। চা শেষ করে সে বেরিয়ে এল। এখন তার অনেক কাজ। ছবি তুলতে গেলে একটা ইউনিটের দরকার হয়। সেই ইউনিটের লোকজন যদি

www.boiRboi.blogspot.com

ডেডিকেটেড এবং কুশলী না হয় তাহলে একজন পরিচালকের পক্ষে ভাল ছবি করা অসম্ভব। দুজন সহকারী পরিচালক এবং একজন আন্তর্জাতিক মানের ক্যামেরাম্যান দরকার। এ ব্যাপারে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে কথা বললে সে সাহায্য পেতে পারে। ওঁর টিম তো দারুণ। কিন্তু ওঁদের নিলে লোকে বলবে ওঁরাই কাজটা করে দিয়েছেন, বাঙালির তো কথা বলার স্বাধীনতা অনেক। অতএব ওঁদের না নেওয়াই ভাল। শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে সে রুমালের একটা কোণ চিবোতে লাগল। এটা মুদ্রাদোষ হলেও তাকে ভাবতে বেশ সাহায্য করে।

শুদ্ধদেব বললেন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে নাটক লিখেছেন। এই বক্তব্যকে এখন পর্যন্ত কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি। সন্দীপনদাও নাকি নিজের অভিজ্ঞতাকে নাটক লেখার ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছেন। এ কথা ঠিক অভিজ্ঞতা থাকলে বিষয়টি অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে, অনেক ডিটেলসে কাজ করা যায়।

'স্বপ্নেন্দু না?'

মহিলা কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বপ্নেন্দু জবাব দিল, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আহা, কি উত্তর। এখানে দাঁড়িয়ে কেন?' রত্নাবলী এগিয়ে এল।

তোমার খবর বলো। কেমন আছ?'

'চলে যাচ্ছে। তুমি?'

'একইরকম।'

'ছবিটবি কি করেছ? কাগজে অবশ্য দেখিনি।'

'করতে যাচ্ছি। খুব শিগ্‌গির।'

'সত্যি। বাঃ, ভাল খবর। করলে আমাকে একটা সুযোগ দিও।'

স্বপ্নেন্দু তাকাল। রত্নবলী তার সঙ্গে একসময় পড়ত। স্বাস্থ্য ভাল থাকলেও চুল বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। মুখে লড়াই করার ছাপ। তার মনে পড়ল একসময় রত্নাবলী নাটক করত। বেস্ট অ্যাকট্রেস হয়েছিল কলেজে। সে কতদিন আগের কথা।

'কি দেখছ? বুড়ি হয়ে গিয়েছি? তোমার কাছে নায়িকার রোল চাইছি নাকি। ভাল ক্যারেক্টার থাকলে করতে পারি।'

'সৎ চরিত্র?'

'না। সৎ অসৎ না, ভাল কাজ করার সুযোগের কথা বলছি। আমি তো এখন অফিসক্লাবে নাটক করি। রোজ দুটো করে রিহার্সাল।'

'তাই নাকি?'

'উপায় নেই ভাই। মা আর বাবা আমার ওপর। পেট চালাতে তো হবে। কেউ তো চাকরি দিল না। মাসে ছটা শো থাকলে তিন সাড়ে তিন আসে।'

'কি কি নাটক করো?'

'আগে দুই পুরুষ, কালিন্দী হত। সব পার্ট মুখস্থ ছিল, একদিন রিহার্সাল দিলেই হয়ে যেত। এখন সাজানো বাগান, কেনারাম বেচারাম হচ্ছে। আমাদের এখন অনেক নাটকের সংলাপ মুখস্থ করে রাখতে হয়।'

'কোথায় থাকো? আগের বাড়িতেই?'

'না। ও বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দাদা ওর শেয়ার নিয়ে বউ ছেলের সঙ্গে দিব্যি আছে আলিপুরে। আমরা আছি শ্যামপুকুর লেনে। ছাদের ওপর দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে আছি।' রুমালে মুখ মুছল রত্নাবলী, 'বিয়ে করেছ?'

'দূর।' একটু বেঁকে দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু।

'ভাল করেছ। নইলে আর একটা মেয়ের বিপদ বাড়ত। রাগ কোরো না, ঠাট্টা করলাম। আমার জীবনে তো ওটাই সত্যি। প্রেম করে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিয়ের ছ'বছরের মধ্যে তার প্রেম ফুরিয়ে গেল। বাধ্য করল ডিভোর্স দিতে। চলি ভাই, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। শ্যামপুকুর লেনে কয়লার দোকানের ওপর বাড়ি। মনে রেখো কিন্তু।' রত্নাবলী চলে গেল।

মেঘে ঢাকা তারা ছবির নীতার কথা মনে এল। রত্নাবলীকে কি ভালমানুষ বলা যায়? এত পরিশ্রম করে বাবা মাকে দেখাশোনা করছে। কিন্তু ওর স্বামীর মনে প্রেম কমে গিয়েছিল কেন? এই কমে যাওয়ার সময় কি রত্নাবলী সাহায্য করেছিল? এসব কিছুই জানা নেই। যা জানি না তা ভেবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত না। যেটুকু জানি তার বিচারে সিদ্ধান্তে আসা দরকার। স্বপ্নেন্দু আবার তাকাল। না, রত্নাবলীকে চেনা যাচ্ছে না। এই পাঁচ মাথার মোড়ে বড্ড মানুষের ভিড়।

স্বপ্নেন্দুর সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় ছিল, আড্ডাও মারত তারা। কিন্তু কারও সঙ্গে যাকে বলে গভীর বন্ধুত্ব তা কখনও গড়ে ওঠেনি। হয়তো ওর কথা বলার ধরন, অতিরিক্ত ভাবনা করা মেয়েদের পছন্দ হত না বলে একটি বিশেষ সীমার পর কেউ এগোত না। এ সব অনেক আগের ব্যাপার। কলেজে রত্নাবলী খুব আকর্ষণীয় মেয়ে ছিল। ছেলেরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে ধন্য মনে করত নিজেদের। লম্বা চুল আর বড় টিপের জন্য ওকে বেশ রোমান্টিক দেখাত। মাত্র কয়েক বছরে ওর চেহারা কি রকম বদলে গেল।

স্বপ্নেন্দুর হঠাৎ, এখন, মনে হল সে রত্নাবলীর জন্যে কোন আকর্ষণ বোধ করত না কেন? শুধু রত্নাবলী কেন, কোনও সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ার জন্যে সে কেন উদগ্রীব ছিল না? তারপরেই খেয়াল হল, ঘনিষ্ঠ মেয়ে বন্ধু দূরের কথা, কোনও ছেলের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়নি আজ পর্যন্ত। এখন এই কলকাতা শহরে তার কোনও বন্ধু নেই। ভাবামাত্র নিজেকে খুব একা মনে হতে লাগল। পৃথিবীর সমস্ত প্রতিভাবান মানুষরাই নিঃসঙ্গ। না হলে তাঁরা সৃষ্টি করতে পারত না। নিজেকে বোঝাল সে। হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করল স্বপ্নেন্দু। পাতাল রেলে চেপে সোজা টালিগঞ্জ যেতে হবে। বাজেট করতে হলে অনেক তথ্য দরকার। সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে।

পাতাল রেলের টিকিট কেটে নীচে নামতেই আর এক চমক। প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাডাম এবং একজন সুদর্শন যুবক। এইরকম যুবকের সঙ্গে কথা না বলতেই বোধহয় জীবনানন্দ দাশ অনুরোধ করেছিলেন। সন্দীপনদা ধারে কাছে নেই।

তাকে দেখামাত্র ম্যাডাম হেসে বললেন, 'বাহ্। আপনার দেখা পেলাম। সেদিন পান এনে দিয়েছিলেন বলে অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি খেয়েছিলেন?' গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল স্বপ্নেন্দু।

'সুযোগ পাইনি। সন্দীপনদা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলেন।'

'সেকি?'

www.boiRboi.blogspot.com

'উনি সোনাগাছি থেকে কেনা পান বাড়িতে ঢোকাতে চাননি।' হাসলেন ম্যাডাম, 'তুমি একে চেনো বিক্রম?'

যুবক এতক্ষণ তাকিয়েছিল। এবার এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যে হ্যাঁ অথবা না কোনওটাই স্পষ্ট হল না, 'সোনাগাছি থেকে পান কেনা মানে?'

'ওটা দারুণ রোমান্টিক ব্যাপার। তুমি বুঝবে না। কোথায় চললেন?'

'এই একটু টালিগঞ্জ।' হাসল স্বপ্নেন্দু, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

'খুব জরুরি?'

'একটু। আপনার বাড়িতে যাব ভেবেছিলাম।'

'যাবেন না। সন্দীপনদা আপনার ওপর খুব খেপে গেছে।'

'আপনিও সন্দীপনদা বলেন?'

'কি করব। বিয়ের আগে ওই নামেই ডাকতাম যে। এই বিক্রম, তুমি তো এসপ্ল্যানেডে নামবে, ট্রেন আসছে, ততক্ষণ আমি ওর সঙ্গে একটু আলাদা করে কথা বলে নিচ্ছি, কেমন?' ম্যাডাম বলতে না বলতেই প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ট্রেন ঢুকল।

ছেলেটি কিছু বলার আগেই ম্যাডাম ওপাশের দরজা লক্ষ করে ছুটল, 'চলে আসুন, এদিকে ফাঁকা আছে।'

কোণের বেঞ্চি ফাঁকা ছিল। ম্যাডামের পাশে বসতে বসতে স্বপ্নেন্দু লক্ষ করল ছেলেটি এই কামরায় ওঠেনি। সে বলল, 'ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ম্যাডাম? আমার নাম জানেন না? ম্যাডাম আবার কি? আমাকে জয়ী বলে ডাকবেন। এবার বলুন, কি বলতে চাইছিলেন।'

জয়ী জিজ্ঞাসা করামাত্র ট্রেন চলতে শুরু করল। গুহার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বীভৎস শব্দাবলি ছুড়তে লাগল চারপাশে। সে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সন্দীপনদাকে আপনার কেমন মনে হয়? ভালমানুষ না মন্দমানুষ?'

জয়ী অবাক হয়ে তাকালেন। 'ঠিক বুঝলাম না।'

স্বপ্নেন্দু আর একটু জোরে প্রশ্ন করল। উল্টোদিকের বেঞ্চিতে বসা দুটো লোক সকৌতুকে ওর দিকে তাকাল। জয়ী জানতে চাইলেন, 'কেন?'

'আমি একটা ছবি করছি, তাতে—।'

'ছবি? ফিল্ম?'

'হ্যাঁ।'

'সন্দীপনদার ওপরে ছবি করছেন?'

'না, মানে।' শব্দ কমে এল পরের স্টেশন চলে আসায়।

গলা নামিয়ে জয়ী বললেন, 'আপনি যে অন্যের পরিবারের কুৎসার সন্ধান করেন সে-রাত্রে আমার মনে হয়নি।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়াল, 'বিশ্বাস করুন এর মধ্যে কুৎসা আছে আমি জানি না।'

'জানেন না?'

'আজ্ঞে না।'

'কেউ আপনাকে আমাদের কথা বলেনি?'

'না। আসলে আমার কোনও বন্ধু নেই যে এসব গল্প শোনাবে।'

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। জয়ী মুক্তোর মতো দাঁতের তলায় ঠোঁট রাখলেন তাঁকে একটু অন্যমনস্ক দেখল স্বপ্নেন্দু। জয়ী মুখ ঘোরাল, 'আপনি সত্যি আমাদের সম্পর্কে কিছু জানেন না একথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

'আপনাকে মঞ্চে দেখেছি আর সেদিন বাড়িতে দেখলাম। আপনার সম্পর্কে আমি কি করে জানব? আজ আমাদের চায়ের দোকানের মালিক টাকার জন্যে তাগাদা দিল। ও ভাল কি মন্দ তা এতদিন দেখেও আমি বুঝিনি।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝেছেন।'

'বিশ্বাস করুন আমি ফিল্ম ছাড়া সব কিছু কম বুঝি।'

'তাহলে সেরাত্রে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন কেন? সভ্যমানুষ কখনও ওই রাত্রে বাড়িতে গিয়ে স্নান করে?'

'বিশ্বাস করুন আমার সত্যি স্নান পেয়েছিল?'

'স্নান পেয়েছিল?' হেসে ফেললেন জয়ী, কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'সন্দীপনদারও ধারণা আপনি জেনেশুনে মজা দেখতে গিয়েছিলেন।'

'আশ্চর্য। আমি তো কোনও মজা দেখতে পাইনি।'

'আপনার ছবির সাবজেক্ট সন্দীপনদা?'

'না, তা ঠিক নয়, ভালমানুষ মন্দমানুষ, এই হল বিষয়।'

'সন্দীপনদাকে নিয়ে ছবি করুন না।'

'উনি কিরকম মানুষ তা না জানলে কি করে করব?'

ইতিমধ্যে চারটে স্টেশন পেরিয়ে গেছে ট্রেন। কামরায় ভিড় বেড়েছে। চাঁদনিচক আসতেই জয়ী বললেন, 'চটপট নেমে পড়ুন। আসুন।'

গাড়ি থামতেই ভিড় ঠেলে জয়ী নেমে পড়লেন। গেট বন্ধ হওয়ার আগে কোনওমতে নামতে পারল স্বপ্নেন্দু। সে দেখল জয়ী কোনওদিকে না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। ট্রেনটা যখন চলতে আরম্ভ করল তখন জয়ী থামলেন। চট করে পেছনের দিকটা দেখলেন। স্বপ্নেন্দু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো ওই ভদ্রলোককে বলেছিলেন এসপ্ল্যানেডে নামবেন।'

'আপনি ভুল শুনেছেন। আমি বলেছিলাম, তুমি তো এসপ্ল্যানেডে নামবে আমি ততক্ষণ ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাদা কথা বলে নিচ্ছি। আমি নামব তো বলিনি। আর ও যদি সেটাই বুঝে থাকে তা হলে কি আমি পরে সিদ্ধান্ত বদলাতে পারি না?' জয়ী বেশ জোরের সঙ্গে বলল।

'ওকে জানিয়ে নামলে ভাল হত।'

'না হত না। তাহলে চিটেগুড়ের মতো ও পেছনে লেগে থাকত। কেন? আপনার কি আমার সঙ্গে নেমে আফসোস হচ্ছে?'

'মোটেই না। আপনি সবসময় অন্য মানে করেন নাকি?'

জয়ীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে উঠে এল স্বপ্নেন্দু। চারপাশে একবার তাকিয়ে জয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুপুরের খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

www.boiRboi.blogspot.com

'না। মানে ওই আর কি!'

"এই বাক্যটার কোনও অর্থ বোধগম্য হল না। আপনার ছবির প্রোডিউসার কে? ২ টাকা?'

'প্রোডিউসার পশ্চিমবঙ্গ সরকার, টাকা জনসাধারণের।'

'সর্বনাশ!'

'মানে?'

'এই ভাষায় কথা বললে পাবলিক বুঝবে? আমার আজ খাওয়া হয়নি। চলুন একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি।' জয়ী এগোলেন।

বেশ উঁচুমানের একটা রেস্টুরেন্টের দোতলার ছায়া ছায়া পরিবেশে জয়ী ওঁকে নিয়ে বসলেন। ঠাণ্ডা মেশিন চলছে। স্বপ্নেন্দু তাকিয়ে দেখল চারপাশের মানুষজন খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। এদের দেখে সুখী মানুষ বলে মনে হল। ভালমানুষ মাত্রই সুখী হবে এমন কোন নিয়ম নেই, মন্দমানুষরাও সুখী হতে পারে। আচ্ছা, বিষয়টার একটু পরিবর্তন করলে কিরকম হয়? ভালমানুষ মন্দমানুষের বদলে সুখীমানুষ দুঃখীমানুষ। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মন প্রতিবাদের ফণা তুলল। মানুষকে দেখাতে গেলে প্যানপ্যানানি আনতেই হবে। টালিগঞ্জ যেটা এতদিন ধরে বাঙালি দর্শককে সাপ্লাই করে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত পরিচালকের কথা মনে এল। ভরতের মতো সারাজীবন ওঁর জুতো মাথায় করে রাখতে সে রাজি। সন্ধ্যারানি মার্কা চোখের জল ওঁর ছবিতে কোনও চরিত্র ফেলেনি। অথচ প্রথম ছবিতে বুকের পাঁজরে পাঁজরে কান্নার ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলেছিল।

'আপনাকে আমার জানা দরকার।' জয়ী বললেন। স্বপ্নেন্দু চমকে সামনে তাকালেন। তার মনে হল জয়ী বেশ সুন্দর।

'আপনি যখন অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবেন তখন এভাবে রুমাল চিবোন?'

'না, মানে, হয়তো হয়ে যায়।'

'ওঃ, এই বাংলা বলবেন না, প্লিজ। শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা বলার আগে আপনাকে জানা দরকার। কোথায় যাচ্ছেন?'

'শ্যামবাজারের ডাফ স্ট্রিটে।'

'নিজেদের বাড়ি না ভাড়ায় আছেন?'

'বাবার বাড়ি।'

'কে কে আছেন?'

'কেউ নেই।'

'কেউ নেই মানে?'

'বাবা ছেলেবেলায় আর মা একটু বড় হয়ে মারা গিয়েছেন।'

'বিয়ে করেননি?'

'দূর। আপনি পাগল।'

'আমি পাগল? কেন?'

'নইলে এই প্রশ্ন আমাকে করতেন না!'

'তাহলে একাই থাকেন? নিজে রেঁধে খান?'

'নাঃ। সময় কোথায়? ঠাকুরের দোকান যখন আছে—!'

'বুঝলাম। ক'টা প্রেম করেছেন এখন পর্যন্ত?'

'এ মাইরি, আপনার স্টকে অন্য কথা নেই?'

'আপনি মাইরি বললেন ভ্রু তুললেন জয়ী।

'সরি। ভাল করে পড়াশুনো করতে পারছি না তো প্রেম করব। সময় কোথায়? তারপর প্রেম করতে হলে একটা সঙ্গিনী দরকার। চারুলতা দেখেছেন। ঠিক ওরকম মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলে কি হত জানি না, তবে চারুদের তো বিয়ে হয়ে যায় আগেই। আর ভূপতি লোকটা তো ভিলেন নয়। অর্থাৎ মন্দমানুষ নয়। ভালমানুষ। যদি চারুলতা আমার জীবনে আসত তাহলে আমার অবস্থা অমলের মতো হত। ভূপতিকে আমি কষ্ট দিতে পারতাম না।' স্বপ্নেন্দু জোরের সঙ্গে বলল।

খাতা নিয়ে কোটপরা স্টুয়ার্ড টেবিলে আসতেই জয়ী অর্ডার দিলেন তাঁর ইচ্ছে মতন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'নষ্টনীড়টা নিশ্চয়ই পড়েননি?'

'তিনবার। তবে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন কোনটা বেটার লেখা তাহলে আমি বলব চারুলতা।'

'লেখা?' জয়ী অবাক হয়ে গেলেন।

'বাঃ। সেলুলয়েডে লেখাই তো ফিল্ম।'

'তার মানে চারুলতার মতো কোনও মেয়েকে পেলে আপনি প্রেম করতেন?'

'এই বুঝলেন? আপনি যে এমন টিউবলাইট কে জানত!'

'টিউবলাইট? আমি? কি যা তা বলছেন?'

'দেরিতে জ্বলেন। চারুলতাকে দেখলে কি হত জানি না তবে ভূপতিদের কষ্ট দিতে চাই না বলে আমি প্রেমের ব্যাপারে একটুও আগ্রহী নই। আপনি তো আমাকে অনেক প্রশ্ন করে চলেছেন, এবার আমি আপনাকে কয়েকটা করি?'

'উঁহু! আজকের দিনটা আমার। আপনি শুধু উত্তর দেবেন।' হাসলেন জয়ী, 'সন্দীপনদাকে আপনার ভূপতি বলে মনে হচ্ছে না? চারুর থেকে ভূপতি তো বয়সে বড় ছিল!'

'ওইটেই বুঝতে পারছি না। ভূপতি ভালমানুষ ছিলেন। সন্দীপনদা—!'

'আমার থেকে কুড়ি বছরের বড় একটা লোককে ভালবেসে যখন বিয়ে করেছিলাম তখন নিশ্চয়ই তিনি মন্দমানুষ ছিলেন না!'

'হয়তো। সেসময় হয়তো ছিলেন না। থাকলেও আপনি হয়তো টের পাননি। অথবা পরে হয়েছেন। খুব গোলমেলে ব্যাপার। ভাবলেই মাথা ঝিমঝিম করে!'

'ভাবছেন কেন?'

'এসে যায় ভাবনাগুলো। কি করব!'

'কেন আসে?'

স্বপ্নেন্দু তাকাল, 'সেই রাতে আপনাদের ওখানে স্নান করার পর থেকেই এটা আসছে। হয়তো তারপরে আপনি চা না খাওয়ালে আসত না।'

'তার মানে আমার ব্যবহার আপনার ভাল লেগেছিল?'

www.boiRboi.blogspot.com

'সে তো ঠিকই!'

'আমাকে নিশ্চয়ই চারুলতা বলে মনে হয়নি আপনার?'

স্বপ্নেন্দু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আপনার নাম তো জয়ী!'

'গুড। চারুলতার সাহস ছিল না। অথবা চারুলতা ভূপতিকেও একটু একটু ভালবাসত বলে বেরুতে পারেনি। কিংবা অমলেরও মেরুদণ্ড ছিল না। কিন্তু আমাকে সেরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। যাকে আমার ভাল লেগেছে তার জন্যে আমি নরক পর্যন্ত যেতে রাজি আছি। সন্দীপনদাকে বিয়ে করার সময় কেউ কেউ ওই কথা বলেছিল। কিন্তু তারা জানে না, যত দিন আমার মন চাইবে তত দিন ওই ইচ্ছেটা মরবে না। আমাদের পরের নাটকের বিষয় আপনি জানেন?'

স্বপ্নেন্দু চোখ নামাল, 'না, মানে—, ঠিক!'

'এ কথাগুলোর মানে কি? জানা থাকা সত্ত্বেও আপনি স্পষ্ট বলছেন না। কিন্তু আপনার স্বভাবে তো এটা বেমানান।'

'চায়ের দোকানে একজন কিছু বলছিল। আমি কান দিইনি।'

এইসময় খাবারের প্লেট এল। সেগুলো সাজিয়ে পরিবেশন শেষ হলে জয়ী বললেন, 'নিন আরম্ভ করুন। নাটকটা আমিই লিখেছি।'

'আপনি?'

'কেন? আমি চেষ্টা করতে পারি না? মোহিতবাবু বা মনোজবাবুর মতো হয়তো হবে না তবু আমার মতো তো হবে।'

'আপনার রিহার্সাল আরম্ভ করেছেন?'

'হ্যাঁ। সন্দীপনদাই ঠিকঠাক করে পরিচালনা করছেন।'

'আপনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন?'

'না। এ নাটকে আমি অভিনয় করছি না। সন্দীপনদা এতে খুশি ননং তবে সবাইকে খুশি করার দায় তো আমার নেই।'

'আপনি সন্দীপনদাকে দুঃখ দিতে চান?'

'কেউ যদি দুঃখ পেতে চায় তো কিছু করার নেই। ভালবাসা যখন মরে যায় তখন ওইসব অনুভূতি কাজ করে না। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে একসঙ্গে আছি কেন? সেটাও ওই সন্দীপনদার অনুরোধ এড়াতে পারছি না বলে। এখন আমাকে ধরে রাখতে তিনি অপার স্বাধীনতা দিয়েছেন। দলের ছেলেদের কেউ কেউ প্রেম নিবেদন করলে চোখ বন্ধ করে থাকছেন। আমার ভালর জন্যে ওঁর তথাকথিত ভাইদের এসকর্ট হতে বলছেন। ওই যেমন একজনকে দেখলেন।'

'মুশকিল!' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্বপ্নেন্দু।

'খান। আমার জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।'

খাওয়া শেষ হলে জয়ী বললেন, 'আমি একটা ফ্ল্যাট খুঁজছি।'

'ফ্ল্যাট?'

'হ্যাঁ। মাবাবার কাছে সব মেয়ে ফিরে যায়। গেলে আমাকে কথা গিলতে হবে। আপনার সন্ধানে কিছু আছে?'

'না, মানে, আমি—।'

'আবার ওই ভাষা?'

'আমি খোঁজ করব। আচ্ছা, সন্দীপনদার প্রতি যে ভালবাসা ছিল সেটা শেষ হয়ে গেল কেন? উনি কি এখন মন্দমানুষ?'

হেসে উঠলেন জয়ী, 'আপনি একেবারে ছেলেমানুষ। ভালবাসা সেই চারাগাছ যাকে প্রতিদিন জল দিতে হয়, পরিচর্যা করতে হয়। যখন কেউ ভাবে আমি পেয়ে গেছি, ও তো আমারই, আর কোথায় যাবে, তখন অযত্নের ধুলো জমতে থাকে। সেই জমা ধুলো থেকে একদিন আঁধি তৈরি হয়ে যায়। আপনি আমার কথা কিছু বুঝতে পারলেন?'

'দারুণ ব্যাপার!' মাথা নাড়ল স্বপ্নেন্দু।

'আপনি বেশ আছেন।' বিল মিটিয়ে দিল জয়ী। দিয়ে বলল, 'আপনি কথা বলতে চাইলেন, আমি বিক্রমকে আলাদা হতে বললাম, ট্রেন থেকে নেমে এলাম, রেস্টুরেন্টে ঢুকে লাঞ্চ খেলাম, এসব তো আগে থেকে ঠিক ছিল না। এর কোনও ঘটনা ঘটার আগে মনে আসেনি। হঠাৎ আপনাকে এতখানি গুরুত্ব দিলাম কেন বলুন তো?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু পরিচিত কেউ দেখলে বলবে আপনার সঙ্গে প্রেম করছি।'

'মারুন গুলি। উঠবেন?'

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'বাড়িতে।'

'সেকি? কাজে বেরিয়েছিলেন, বাড়ি ফিরে যাবেন কেন?'

'একটু একা একা ভাবব!'

'কী ভাববেন? আমি কতটা খারাপ?'

'আপনাকে নিয়ে একটা চিত্রনাট্য লেখা যায় কিনা!'

'মেরেছে!' চোখ বড় করলেন জয়ী, 'তার জন্যে এ পরিশ্রম করতে হবে কেন? আমার নাটক থেকেই তো স্ক্রিপ্ট করতে পারেন।'

'নাটক থেকে?'

'হ্যাঁ, ওতেই আমাকে পাবেন।'

'দূর! ওই নাটকে নিশ্চয়ই আপনি নিজেকে যা ভাবেন তাই লিখেছেন। কিন্তু আমার চিত্রনাট্যে আপনাকে নিয়ে আমি যেমন ভাবছি তাই লিখব।'

'কিন্তু ঘটনাগুলো—।'

'ঘটনাগুলোকে এক হতে হবে এমন কোনও মানে নেই।'

'তাহলে আপনার চিত্রনাট্যে আমি কোথায় রইলাম?'

'ঘর ছেড়ে কেউ বেরিয়ে গেলে যেমন তার গন্ধ বাতাসে ভাসে, ফেলে যাওয়া পোশাকে যেমন তার স্পর্শ থাকে অথবা আধপড়া বইয়ে যেমন তার রুচি থাকে, তেমনি আপনি থাকবেন। অনুভবে বোঝা যাবে।'

'না।' মাথা নাড়লেন জয়ী, 'আমি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে থাকতে চাই।'

'মুশকিল। খুব মুশকিল।'

www.boiRboi.blogspot.com

'আপনি যখন মারা যাবেন তখন কোথায় থাকবেন আপনি? কোথাও না। অথচ যদি তখন এই রেস্টুরেন্টে আসি তখন আপনার কথা মনে পড়বে আমার। অমনি আপনি আমার কাছে বেঁচে উঠবেন। শরীর টরীর কিছু না, বুঝলেন!'

'না। বুঝলাম না। আপনি কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন?'

'না। মানে, ঠিক—।'

'সোনাগাছি থেকে পান কিনে এনেছেন শেষ রাতে, ওখানে নিশ্চয়ই যাওয়া আসা আছে?'

'দূর। সেরাতে প্রথমবার গিয়েছিলাম।'

'কী বলতে চাইছেন? মেয়েদের শরীর আপনি জানেন না?'

'জানব না কেন? ফরাসি আর ইতালিয়ান ছবিতে প্রচুর দেখেছি। একটা সুইডিশ ছবিতে পর্নোগ্রাফির চূড়ান্ত ছিল। কয়েক মুহূর্ত, তারপর ব্যাপারগুলো খুব বোকা বোকা মনে হয়।'

ওরা দু'জন বেরিয়ে এল। ঘড়ি দেখলেন জয়ী। তারপর বললেন, 'আপনার সঙ্গে আবার কথা বলার ইচ্ছে থাকল। এরকম কথাবার্তা কাউকে বলতে শুনিনি।'

'আপনার সঙ্গে তো দেখা হচ্ছেই।' স্বপ্নেন্দু বলল।

'দেখা হচ্ছেই?'

'হ্যাঁ। আমার ছবিতে আপনি তো অভিনয় করছেন!'

'সেকি? কখন ঠিক হল?'

'ওই তো, একটু আগে।'

'বাঃ, আমিই জানলাম না আর আপনি ঠিক করে নিলেন?' হেসে উঠলেন জয়ী, 'বেশ মজার মানুষ আপনি। চলুন আপনার বাড়িতে যাই।'

'আমার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। আজ কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। রোজ তো নিয়ম মেনে ঠিকঠাক কাজ করে যাই। আজ আপনার মতো হওয়ার চেষ্টা করি।'

'আপনি সঙ্গে থাকলে আমি কিছুই ভাবতে পারব না।'

'রোজই তো ভাবেন। আজ না হয় একটু বেনিয়ম করুন।'

শ্যামবাজার স্টেশনে নেমে মণীন্দ্র কলেজের সামনে চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উঠে এল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ওখানে গিয়ে আপনি কি করবেন বলুন তো?'

'ভেবে দেখিনি। গিয়ে ভাবব।' জয়ী হাসলেন।

বাড়ির সামনে যখন ওরা পৌঁছলো তখন ভরদুপুর। কড়া রোদ বলে রাস্তাঘাট ফাঁকা। সদর দরজা খোলা। স্বপ্নেন্দুকে দেখে সিগারেটওয়ালা ব্যস্ত হল, 'আপনাব সঙ্গে খুব জরুরি কথা ছিল বাবু।'

'কী কথা?' স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা জয়ীকে দেখল। তারপর বলল, 'এভাবে বলা যাবে না। কিন্তু আজই কথাটা বলা দরকার। আপনি যদি বলেন তো ঘরে যেতে পারি।'

'ঠিক আছে।' স্বপ্নেন্দু এগোল।

সিড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে জয়ী বললেন, 'এই বাড়ি আপনার?'

'হ্যাঁ। ওই আর কি!'

'হ্যাঁ বলতে কনফিডেন্স পান না কেন বলুন তো?'

স্বপ্নেন্দু হাসল। ইতিমধ্যে দোতলায় ছোটাছুটি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নেন্দুর আসাযাওয়ার সময় কেউ খেয়াল করে না কিন্তু তার সঙ্গে একজন সুন্দরী এসেছে এটা যেন এ বাড়ির ভাড়াটেদের বিশ্বাস হচ্ছে না। ভিড় করে ওরা দেখছিল।

জয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা কারা?'

'ভাড়াটে।'

'এভাবে দেখছে কেন? আপনার কাছে কোনও মহিলা আসেন না?'

'না। মানে, আমি—।'

'ওঃ, না শব্দটাও স্পষ্ট বলতে পারেন না?'

তালা খুলে ভেতরে ঢুকল স্বপ্নেন্দু, পেছনে জয়ী। বিছানাটাকে বড্ড এলোমেলো এবং ময়লা বলে মনে হল আজ স্বপ্নেন্দুর। সে ঝটপট চেয়ারটা খালি করে বলল, 'বসুন। ঘরটা খুব অগোছালো হয়ে আছে।'

'এটা খুব কৃতিত্বের কথা নয়। যে মানুষ নিজের ঘর গুছিয়ে রাখতে পারে না সে কি করে একটা ফিল্ম ঠিকঠাক গুছিয়ে করবে?'

'দুটো কি এক কথা হল?'

'বেসিক্যালি এক। ওটা কি বই?' চেয়ারে বসে জয়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

'ইউলিসিস।'

'আপনি এসব পড়েন নাকি?'

'না, মানে, ওহ আর কি!'

চোখ রাঙালেন জয়ী। বোকা বোকা হাসল স্বপ্নেন্দু। বইটার পাতা ওল্টালেন জয়ী। তারপর দেওয়ালের দিকে তাকালেন। দীর্ঘকাল রং না করা দেওয়ালের র‍্যাকে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বই ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে। জয়ী উঠে কাছে গিয়ে দেখতে দেখতে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের নাম করে বললেন, 'এতো দেখছি ওঁর ওপর লেখা সব বিদেশি বই। এসব কোথায় পেলেন?'

'আমাকে পাঠিয়েছে প্রকাশকরা।'

'আপনাকে? কেন?'

'ওঁর ওপর একটা লেখা লেখার কথা আছে—। মানে, উনি শুধু আমাকেই লেখার অনুমতি দিয়েছেন। তাই পৃথিবীর অন্য সবাই ওঁকে নিয়ে কি ভাবছে তা জানার দরকার বলে—।' স্বপ্নেন্দু চোখ বন্ধ করল, 'খুব কঠিন কাজ।'

'আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন, মানে?'

'প্রমাণ টুমান দেখাতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু ওঁর অনুমতিপত্র আমার কাছে আছে।'

'বাব্বা। এসব বই এখানে পাওয়া যায়?'

www.boiRboi.blogspot.com

'না।' স্বপ্নেন্দু বলল, 'সব বই পাওয়া যায় না।'

'অনেক দাম?'

'হুঁ। একজন সব বই-এর জন্যে চার হাজার টাকা দাম দিয়েছে। মূল বই-এর দাম অনেক গুণ হবে। ভাবছি বিক্রি করে দেব।'

'বিক্রি করে দেবেন?'

'হুঁ। সব পড়ে দেখলাম। আমি ওঁর কাজ নিয়ে যা ভেবেছি এরা তার ধার দিয়েও যায়নি। সব ভাসা ভাসা। হয় প্রশংসা নয় নিন্দে নয় জলে না নেমে মাছ ধরার চেষ্টা। এসব বই রাখার আর কোনও মানে হয় না।'

'আপনি তো বিনাপয়সায় পেয়েছিলেন!'

'হ্যাঁ। কিন্তু পড়েছি, পড়ার তো পরিশ্রম আছে।'

জয়ী ঘুরে দাঁড়ালেন, 'ওই দরজাটা?'

'আমার বাথরুম বলুন টয়লেট বলুন—।'

'একদম একা থাকেন?'

'হুঁ।'

'জ্বর এলে বা খুব শরীর খারাপ হলে কি করেন?'

'দূর! ওসব আমার হয় না।'

জয়ী হেসে উঠলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি একটু রেস্ট নেব। বিছানাটা একটু ভদ্র করে দেবেন?'

'রেস্ট নেবেন? আমার বিছানায়?'

'হ্যাঁ, একটু, এই আর কি!' স্বপ্নেন্দুর বলার ধরন নকল করলেন জয়ী।

অগত্যা যেটুকু পারে সেটুকুই করল স্বপ্নেন্দু। বালিশের কভার বেশ ময়লা হয়ে গেছে বলে ওটাকে খুলে ফেলল। একটা পরিষ্কার তোয়ালে ভাঁজ করে বালিশটার চাপাল। নির্দ্বিধায় বিছানায় শুয়ে পড়লেন জয়ী। শুয়ে বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়লে রাত নটার আগে ডাকবেন না।'

'আপনি ঘুমাবেন?'

'আপনার আপত্তি আছে?'

'না। ঠিক আছে। তাহলে আমি—।'

'ওই চেয়ারে বসে পাহারা দেবেন। এখানে একা থাকলে আমার ঘুম আসবে না।' জয়ী দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুলেন।

নায়িকা নারীর শরীরের রেখা স্বপ্নেন্দুর মাথায় নবীন ভাবনা নিয়ে এল। এরকম সুনসান দুপুরে নোনাধরা বিরাট বাড়ির দোতলায় নতুন এসে যে মেয়ে অবলীলায় বলতে পারে আপনার খাটে রেস্ট নেব তাকে নিয়ে এই সময়ের ছবি করা যায়। এই পৃথিবীর সমস্ত সংকীর্ণতা, কৌতূহল অথবা অনুদারতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে পড়তে পারে তাকে হাজার সেলাম। চিত্রনাট্যের শুরুটাই যদি এইরকম হয়? প্রবল উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল স্বপ্নেন্দু। একবার মনে হল বেরিয়ে গিয়ে কোনও এস টি ডি বুথ থেকে ভবানীপুরে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীর কোনও ছবির পরিচালক

এই রকম সোজা মেয়েকে নিয়ে এর আগে ছবি করেছেন কি না?

এই সময় দরজার কড়া নড়ল। স্বপ্নেন্দুর ভাবনাটা থমকে গেলেও সে চেয়ার ছাড়ার তৎপরতা দেখাতে পারল না। এবার দরজাটা অর্ধেক খুলে গেল। স্বপ্নেন্দু দেখল সিগারেটওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে।

'কী চাই?'

লোকটা দু প্যাকেট ডানহিল এগিয়ে ধরল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে-দুটো ধরল স্বপ্নেন্দু, 'এত দামি সিগারেট আর খাব না। এই শেষবার।'

'ঠিক আছে।' লোকটা বিছানায় শুয়ে থাকা জয়ীকে দেখল। জয়ীর পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দুর এই প্রথম মনে হল জয়ীর নিতম্ব বড্ড বেশি প্রকট হয়ে আছে যা এই লোকটার দেখা উচিত নয়। কিন্তু সে তো চেষ্টা করলেও ওটিকে নিষ্প্রভ করতে পারে না।

'কি কথা বলবে?'

'ইয়ে বাবু, আমার টাকাগুলো দিয়ে দিন।' লোকটা খাট থেকে চোখ না সরিয়ে বলল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল ওর মুখের চেহারা কিরকম বদলে গেছে।

'কিসের টাকা?'

'এই যে সিগারেটের দাম। এত বছর ধরে খেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমি কোনওদিন কিছু বলিনি। আজ যা কানে এল তারপর না বলে পারছি না। আমি গরিব মানুষ। টাকাটা মার গেলে আমি মরে যাব।'

'আঃ। টাকা মার যাবে কে বলেছে!'

'যাবেই বাবু।'

'ঠিক আছে, কত টাকা পাও। আমি এই বই বিক্রি করে চার হাজার পাব, তা থেকে তোমার সিগারেটের দাম শোধ করে দেব।'

'সে কি বাবু?' লোকটা চোখ বড় করল, 'চার হাজারে কি হবে?'

'তার মানে? কত টাকা তুমি পাও আমার কাছে?'

লোকটা তার অন্য হাতে ধরা মোটা খাতা বের করল, 'এখানে গত বছরের হিসেব লেখা আছে। এর আগে আরও দুটো খাতা আছে। প্রতিদিন যা নিয়েছেন তা লিখে আপনাকে সই করিয়ে নিয়েছি। নিয়েছি না?'

'তা নিয়েছ।'

'আপনি আজ পর্যন্ত দিয়েছেন পাঁচশো তিরিশ টাকা। আর সিগারেট খেয়েছেন সাতানব্বুই হাজার টাকা। সত্তর পয়সা বাদ দিলাম।'

'সাতানব্বুই হাজার?' পায়ের তলার মেঝে নরম হয়ে গেল যেন।

'হ্যাঁ বাবু। আপনি হিসেব চেক করে নিন।'

'কিন্তু ভাই, অত টাকা এখন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তোমাকে কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। এই ধরো বছর খানেক, তারপর সব শোধ করে দেব।'

'না বাবু, আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।'

'এতদিন পারলে আর এই কটা দিন—আমি কি পালিয়ে যাব?'

'তা যাবেন না। কিন্তু ভাগ বসাবার লোক বেড়ে যাবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'মানে বুঝলাম না।'

'খাবারের দোকানের ঠাকুর আর সেলুনওয়ালা আপনার নামে খাতা খুলেছে। আপনি পাঁচ টাকার খাবেন আর ওরা সই করিয়ে নিয়ে লিখে রাখবে একশো টাকা। আপনি জিন্দেগিতে শোধ করতে পারবেন?'

'সেকি?' আঁতকে উঠল স্বপ্নেন্দু, 'আমার মনে হয়েছিল ওরা ভালমানুষ!'

'আপনি একটু উদাস প্রকৃতির মানুষ তো! বাবু আমার টাকাটা দিন!'

'কিন্তু কোত্থেকে দেব বলো?'

'আমি একটা উপায় বলব?'

'বলো।'

'এই বাড়িতে অনেক ভাড়াটে। ভাড়াও কম। আর বাড়িটার বেশ বয়স হয়ে গেছে। ভাড়াটে সমেত বিক্রি করতে চাইলে দাম পাবেন না। তাই টাকা না দিতে পারলে বাড়িটাই আমাকে লিখে দিন।'

'এ বাড়ি তোমাকে লিখে দেব?'

'হ্যাঁ। আমি আরও কিছু টাকা দিচ্ছি। ওই তিন হাজার দিলে পুরো এক লাখ হয়ে যাবে। এ বাড়ি থেকেও তো আপনার কোনও লাভ হচ্ছে না মাঝখান থেকে ঋণমুক্ত হয়ে যাবেন। আর হ্যাঁ, কেউ খাতা খুলতে চাইলে রাজি হবেন না।'

'বলছ?'

'হ্যাঁ বাবু। এটাই সবচেয়ে ভাল রাস্তা। আমি উকিলবাবুকে বলে রেখেছি। তিনি কাগজপত্র তৈরি করে আজ রাত্রেই দিয়ে দেবেন। আপনি সই করে দিলেই আমি তিন হাজার নগদ টাকা দিয়ে দেব। বাবু, ইনি কে?' সিগারেটওয়ালা ইশারা করল।

স্বপ্নেন্দু উত্তর দেবার আগেই জয়ী উঠে বসলেন, 'আপনারা এত কথা বলছেন না যে ঘুম এল না। ডানহিলের প্যাকেট দেখছি। একটা দিন তো।'

'আপনি সিগারেট খান?'

'একমাত্র আপনারই খাওয়ার অধিকার আছে একথা কোথায় লেখা আছে?'

'না, মানে—। নিন।' প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দিল স্বপ্নেন্দু। প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করে ধরালেন জয়ী, 'আপনি দেখছি বেশ বড়লোক!'

'না না, ও দিত বলে—।' স্বপ্নেন্দু থেমে গেল।

'সাতানব্বুই হাজার টাকার সিগারেট খাইয়েছেন?' সিগারেটওয়ালার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন জয়ী ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

'হ্যাঁ দিদি।'

'টাকাটা পেলে খাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে লিখে দেবেন?'

'উনি টাকা দিতে পারবেন না, বললেন তো, সে ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।'

'ধরুন, উনি টাকাটা দিয়ে দিলেন।'

'তাহলে আর কি করা যাবে! নিয়ে নেব।'

'কিন্তু তার আগে আপনার হিসেব চেক করা দরকার।'

'একদম ভুল পাবেন না দিদি। সব ঠিক আছে। তবে যখন টাকা দেবেন তখন চেক

করে নেওয়াই ভাল। এটা দেখুন, আমি বাকিগুলো আনছি।' খাতাটা খাটের ওপর রেখে লোকটা বেরিয়ে গেল।

স্বপ্নেন্দু প্রতিবাদ করল, 'আপনি জানেন না আমার পক্ষে ওই টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'টাকা না দিলে ও আপনার বাড়ি নিয়ে নেবে।'

'দূর। এই পুরোন বাড়ি রেখে কি হবে?'

'কিছু হবে না?'

'না।'

'তাহলে চুপ করে বসে থাকুন।' জয়ী হাসলেন, 'এক কাপ চা পাওয়া যেতে পারে? আমি রোজ এসময় চা খাই।'

'চা? নিয়ে আসতে হয়।'

'একটু ম্যানেজ করুন না। দাঁড়ান।' জয়ী দরজার গিয়ে দাঁড়ালেন। খানিকটা দূরে ভাড়াটে মেয়ে এবং কিছু পুরুষ দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। জয়ী বললেন, 'আপনারা কেউ আমাকে এক কাপ চা খাওয়াবেন? এ ঘরে তো চায়ের কোনও অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই, তাই—।'

সঙ্গে সঙ্গে ছটোপুটি আরম্ভ হয়ে গেল। কে চা করবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেলে জয়ী খাটে এসে বসলেন, 'আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে গেল।'

স্বপ্নেন্দুর কানে কথাগুলো পৌঁছলো না। সে বিড়বিড় করল, 'আমি এই লোকগুলোকে একটুও বুঝতে পারিনি। ওদের ভালমানুষ ভেবেছিলাম? কি মুশকিল? তাহলে ছবি করব কি করে?'

এইসময় সিগারেটওয়ালা দুটো মোটা খাতা নিয়ে ফিরে এল। গত পনেরো বছর ধরে স্বপ্নেন্দু যত সিগারেট খেয়েছে তার হিসেব লেখা রয়েছে ওই তিন খাতায়। জয়ী পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ দেখার পর বললেন, 'ডাবল ফাইভ ফাইভের দাম এক এক পাতায় এক এক রকম দেখছি যে!'

'ওটা যেমন দামে পাই তেমন দামে বিক্রি করি।'

স্বপ্নেন্দু প্রতিবাদ করল, 'আমি ডাবল ফাইভ ফাইভ খাইনি। ওটা খেতে একটু ভাল লাগে না আমার। তুমি ভুল লিখেছ।'

'আপনি না খেলে আমি লিখব কেন বাবু। তলায় আপনার সই আছে।'

'সই কি আমি দেখে করতাম?'

'বাঃ। এখন উল্টোপাল্টা বললে কি চলে?' লোকটা হাসল।

'আপনি যে এত দিন ধরে বিদেশি সিগারেট বিক্রি করছেন, আপনার নিশ্চয়ই লাইসেন্স আছে। ওটা একটু দেখান।' জয়ী বললেন।

'লাইসেন্স? কি যে বলেন? এগুলো টানা মাল! সবাই বিক্রি করে বলে আমিও করি। লাইসেন্স কোথায় পাব?'

'লাইসেন্স ছাড়া বিক্রি করলে আপনার জেল হতে পারে। আপনি তো উকিলকে দিয়ে কাগজপত্র করাচ্ছেন। এই খাতা নিয়ে আগে থানায় চলুন। সেখানে ফয়সালা হবে আপনি

www.boiRboi.blogspot.com

কত পাবেন। সেই মতো আপনাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।'

'থানার বড়বাবুও জানেন আমি এখন ডাহিল বিক্রি করি।'

'বড়বাবুর যিনি বড়বাবু তিনি জানলে দেখবেন আপনার থানার বড়বাবু কিছুই জানেন না। চলুন তাহলে!' জয়ী তিনটে খাতা হাতে নিলেন।

'এ আবার কি ঝামেলায় পড়লাম। আপনি গরিবের গলায় পা দিচ্ছেন দিদি। উনি যে বাকিতে সিগারেট খেতেন এটা তো ঠিক?'

'ঠিক। কিন্তু টাকার অঙ্ক পঞ্চাশ হাজারের বেশি হবে না। তাও আমি অনেক বাড়িয়ে বললাম। ভেবে দেখুন, কি করবেন?'

লোকটা পিটপিট করে তাকাল, 'বেশ। এখন আপনি যা বলবেন তাই আমাকে মানতে হবে।'

'বাঃ। গুড। আপনি তো এই বাবুর ভাড়াটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'একমাসের মধ্যে দোকান ছেড়ে দিতে হবে।'

'সেকি? কেন? আমি রেগুলার ভাড়া দিই।'

'রসিদ দেখান।'

'না, মানে, খাতায় দেখুন, লেখা আছে।'

'যদি ছেড়ে না যান তাহলে এই খাতা পুলিশের কাছে যাবে আর একটা পয়সাও আপনি পাবেন না।'

'একদম মরে যাব দিদি। দেশে ছেলে বউ না খেয়ে মরবে।'

'কত ভাড়া দেন?'

'আশি টাকা।'

'এ মাস থেকে পাঁচশো দিতে পারবেন?'

'পাঁচশো? কোন আইনে—?'

'আইন দেখালে থানায় যাব।'

'না, দেখাচ্ছি না। কিন্তু অত বিক্রি হয় না দিদি। একটু কম করুন। তিনশো। তিনশো করেই দেব।'

'চারশো। খাতাগুলো আমার কাছে থাকল। কাল এই বাবুর কাছে এসে টাকা নিয়ে যাবেন। পঞ্চাশ হাজার। যান।' জয়ী হাত নাড়লেন।

লোকটা বেরিয়ে যেতেই জয়ী স্বপ্নেন্দুর দিকে তাকালেন। স্বপ্নেন্দু পাথরের মতো বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। জয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে আপনার কিরকম মানুষ বলে মনে হচ্ছে?'

স্বপ্নেন্দু কথা না বলে মাথা নেড়ে বলল জানে না।

'আপনার এত উপকার করলাম যখন তখন তো আমার ভালমানুষ হওয়ার কথা। আপনাকে এখন আমি একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার বেয়ারার চেক দিয়ে যাচ্ছি। কাল সকালে ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাশ করে আনবেন। আমি বারোটা নাগাদ আসব। আমার সামনে ওই লোকটাকে পেমেন্ট করবেন। ঠিক আছে?' জয়ী বললেন।

'আপনি খামোকা আমার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন কেন? আমি কবে শোধ করতে পারব তা নিজেই জানি না!'

'সেটা আগামী কাল বলব। আচ্ছা, আজ চলি!' জয়ী বলামাত্র দরজার শব্দ হল। স্বপ্নেন্দু উঠে এগিয়ে গিয়ে দেখল এক ভাড়াটের স্ত্রী দু'কাপ চা আর থিন অ্যারারুট বিস্কুট ট্রেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে ট্রে নিতেই মহিলা ফিরে গেলেন। স্বপ্নেন্দু টেবিলে ট্রে রেখে কাপ আর বিস্কুট এগিয়ে ধরল, 'চা খান।'

চায়ের কাপ নিয়ে একটা চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করলেন জয়ী, 'খেয়ে দেখুন তো, পেঁয়াজের গন্ধ পান কিনা!'

স্বপ্নেন্দু চুমুক দিল, 'হ্যাঁ, একটু।'

'থাক।' কাপ ট্রেতে রেখে জয়ী ব্যাগ খুলে একটু ভাবলেন, 'থাক, আপনাকে কষ্ট দেব না। আমিই ব্যাঙ্ক ঘুরে আসব। আমি এখন চলি, আপনি এখন ভালমানুষ মন্দমানুষের স্ক্রিপ্ট লিখুন।'

'না। ওই ছবি আমি করছি না।'

'সেকি?'

'অন্য একটা ভাবনা মাথায় এসেছে। জয়ী, আপনি খুব ভাল।'

'ধন্যবাদ।' জয়ী চলে গেলেন।

বিকেলবেলায় কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়েছিল স্বপ্নেন্দু। বইগুলো বিক্রি করে নগদ সাড়ে তিন হাজার পেয়েছে সে। যা দাম বলেছিল তা থেকে পাঁচশো কম দিল লোকটা। এ থেকে অন্তত তিন হাজার জয়ীকে দিয়ে বাকি সাতচল্লিশ হাজার। এই সময় সে নিজের নামটা শুনতে পেল। চিৎকার করে কেউ তাকে ডাকছে। চারপাশে তাকাল স্বপ্নেন্দু। এক পেট ভিড় নিয়ে যে বাসটা বেরিয়ে গেল তার ফুটবোর্ড থেকে লাফিয়ে নেমে হাত নাড়তে লাগল মহানাম।

মহানামকে দেখে একটু বেঁকে দাঁড়াল স্বপেন্দু। এককালে কফিহাউসের দরজা খুলত মহানাম, রাত্রে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকত। ওটাই ওর সারাদিনের ঠিকানা। বন্ধুবান্ধবরা এলে ও শুধু প্লেট পকৌড়া খেতে চাইত। সারাদিনে তিন প্লেট জুটে গেলে ওর লাঞ্চ-জলখাবারের প্রয়োজন মিটে যেত। মহানামের কবিতার হাত মন্দ নয়, আঁকার হাত বেশ ভাল। কিন্তু ওর এক দুঃসম্পর্কের দাদা কবি এবং আঁকিয়ে হিসেব বিখ্যাত বলে ও নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে।

কাছে এসে মহানাম বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হয়েছে। একটু আমার সঙ্গে আসবে? এই ঠনঠনের সামনে!'

'কি ব্যাপার?' স্বপ্নেন্দু সন্দিগ্ধ হল।

'আজ আমার বিয়ে।' মহানাম উদাস গলায় বলল।

'সেকি? বিয়ে? তোমার?' বেশ অবাক হয়ে মহানামকে দেখল স্বপ্নেন্দু। পরনে প্রতিদিনের মতো ময়লা পাঞ্জাবি আর পাজামা। কাঁধে ঝোলা।

'ওভাবে দেখার কি হল? হৃদয়ে প্রেম এলে মানুষ তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। তুমি আমার

www.boiRboi.blogspot.com

একটু উপকার করতে পারবে তো এসো।' মহানাম বলল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

মহানাম আগে আগে হাঁটছিল। ওর নাম যখন প্রথম সে শুনেছিল তখন ভেবেছিল মহানাম বৌদ্ধ। কিন্তু পরে জেনেছিল নামকরণ করার সময় ওর ঠাকুর্দা বলেছিলেন, 'ওর নাম রাখা হোক মহানাম, এর চেয়ে বড় নাম হয় না।' সেই মহানাম বিয়ে করছে। ওর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক কালই তেমনভাবে নেই। কখনও এর কখনও ওর বাড়িতে বাস করে। পার্কসার্কাস কবরখানার দারোয়ানের ঘরে ছিল অনেকদিন। সেই মহানাম বিয়ে করছে। ওর বউ কে? কি করে? স্বপ্নেন্দু মনে করতে পারল, ওর হাতের লেখা এবং লেখার ভাষা পড়ে অন্নদাশংকর রায় একবার প্রশংসা করেছিলেন। একসময় লিটল ম্যাগাজিনগুলো ওকে দিয়ে মলাট আঁকিয়ে নিত বিনাপয়সায়। মহানাম কি এখন কাজকর্ম করছে?

একটা লন্ড্রির মধ্যে ঢুকে গেল মহানাম। ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিল স্বপ্নেন্দু। সে ভাবছিল, মহানাম কি তার ছবির চরিত্র হতে পারে? মহানাম তাকে ডাকতেই সে দেখল ময়লা পাঞ্জাবি খুলে ফেলে ধোপদুরস্ত নতুন কাচা পাঞ্জাবি পরছে মহানাম। পাঞ্জাবির ঝুল হাঁটু পর্যন্ত বলে পাজামা পাল্টাতেও অসুবিধে হল না। চুলে হাত বুলিয়ে মহানাম জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখাচ্ছে এখন?'

'ভাল।' সত্যি ভাল লাগছিল স্বপ্নেন্দুর।

মহানাম দোকানদারকে বলল, 'এ দুটো কাচিয়ে রাখবেন। কত হয়েছে? বারো টাকা? এই স্বপ্নেন্দু, টাকাটা দিয়ে দাও তো!'

স্বপ্নেন্দু হতভম্ব হয়ে তাকাল।

মহানাম বলল, 'একটু ভদ্রস্থ না হয়ে বিয়ে করতে যাওয়া যায়? তুমিই বলো।'

অগত্যা টাকাটা দিতে হল স্বপ্নেন্দুকে। বাইরে বেরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'পকেটে টাকা না রেখে বিয়ে করতে যাচ্ছ?'

'কি করব? চন্দ্রা এমন করে ধরল। আজই সই করতে হবে। দাঁড়াও।' একটা ছোট স্টেশনারির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মহানাম জিজ্ঞাসা করল, 'সবচেয়ে সস্তার ব্লেড কি আছে? যা আছে দিয়ে দিন।'

দোকানদার একটা ব্লেড দিয়ে বলল, 'কুড়ি পয়সা।'

মহানাম স্বপ্নেন্দুকে ইশারা করল। অতএব কুড়িটা পয়লা দিতে হল। ব্লেড নিয়ে সামান্য হেঁটে একটু নির্জন জায়গায় চলে এসে মহানাম মোড়ক ছাড়িয়ে বলল, 'ধরো, একটা লম্বা সোজা রেখা ওপর থেকে নেমেছে, তার দুই ইঞ্চি পাশে ওই রেখার ওয়ান ফোর্থ একটা সরলরেখা সমান্তরালভাবে নেমেছে। দুটো রেখার প্রান্ত দেশ এক লেভেলে থাকবে। বুঝতে পারলে?'

'কি হবে?'

ব্লেডটা স্বপ্নেন্দুর হাতে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মহানাম, 'পাঞ্জাবির পিঠের মাঝখানে ব্লেডটা দিয়ে কেটে ওই রেখা দুটো আঁকো।'

'সেকি?' আঁতকে উঠল স্বপ্নেন্দু, 'নতুন পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ফেলবে?'

'ছিঁড়ছি কে বলল? ডিজাইন করছি। শ্যামলা পিঠের ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা পাঞ্জাবিতে ডিজাইনটা দারুণ লাগবে। যা বলছি তাই করো। হেল্প মি!'

অগত্যা পাঞ্জাবির পিঠে দুটো রেখা কাটল স্বপ্নেন্দু। তাকে সতর্ক থাকতে হচ্ছিল যেন মহানামের পিঠ কেটে না যায়। দৃশ্যটাকে অদ্ভুত লাগল। যে কেউ বুঝতে পারবে পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে যায়নি, ইচ্ছে করে কাটা হয়েছে। ব্লেডটাকে ভেঙে ফেলে দিয়ে মহানাম বলল, 'শোনো, খালি হাতে বিয়ে করতে যেতে খুব খারাপ লাগছে। আর আমার বিয়ে বলে তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগছে, গেলে উপহারও দিতে। তাই গোটা দশেক টাকা দাও, এক গোছা লাল গোলাপ কিনে নিয়ে যাই।'

স্বপ্নেন্দুর পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের হল না। খুচরো নেই। যা আছে সবই সদ্য পাওয়া একশো টাকার নোট। তারই একটা মহানামকে দিয়ে সে বলল, 'ফুল কিনে আমার ট্রাকায় বউকে ভালমন্দ খাইয়ে দিও।'

'ধন্যবাদ।' বলে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসল মহানাম। ওর ট্যাক্সি চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল স্বপ্নেন্দু। কোন মহিলা মহানামকে বিয়ে করছেন! তিনি কি করেন? মহানামের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই বিরাট প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন মহানামকে ছবির নায়ক করলে কি রকম হয়? যাঃ, জয়ীকে যে চরিত্রে সে ভেবেছে সেই চরিত্র মহানামকে একটুও সহ্য করতে পারবে না। দুই প্রতিভা কখনও একটা গাড়ি টানতে পারে না।

সন্ধের পর বাড়ি ফিরে চিত্রনাট্য লিখতে বসল স্বপ্নেন্দু। তার আগে ঠাকুরের দোকানে গিয়ে সকালের খাবারের দাম মিটিয়ে দিল। আগামীকাল সেলুনে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে। বেশ ভাল লাগছে এখন।

'সুনসান দুপুর। কলকাতার একটা গলিপথ। কড়া রোদ বলে পথে কেউ নেই। খোলা কলের একটু দূরে কয়েকটা কাক জল খাচ্ছিল।' এই অবধি লিখে থমকে গেল স্বপ্নেন্দু। শুটিং-এর সময় যদি কাকা না পাওয়া যায়! অথবা সেদিন সকাল থেকেই যদি ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে তাহলে কড়া রোদ কোথায় পাবে? আবার বৃষ্টির দিন লিখতেও পারছে না। সেদিনই হয়তো বৃষ্টি হল না। এই জন্যেই কাগজে কলমে চিত্রনাট্য লিখতে চায় না। এই কড়া রোদ এবং তৃষ্ণার্ত কাকের কথা লিখলে এবং পাশে ছবি এঁকে রাখলে সেটা মাথায় এমনভাবে ঢুকে যাবে যে শুটিং-এর সময় তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কষ্টকর। গৌরী সেনের টাকায় যারা ছবি করে নিয়ে তারা এইরকম একটা দুপুর পেতে দিনের পর দিন ক্যামেরা নিয়ে বসে থাকবেন। কিন্তু চিত্রনাট্য, না পেলে তথ্যমন্ত্রী টাকা দেবেন না! স্বপ্নেন্দু মনে মনে বলল, 'মুশকিল!'

ঠিক বারোটার সময় জয়ী এলেন ঘরে, পেছনে সিগারেটওয়ালা।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আসুন, আসুন।'

একটা টাইপ করা কাগজ বের করে জয়ী সিগারেটওয়ালাকে বললেন, 'এখানে লেখা আছে আপনি ওঁর কাছে এতকাল সিগারেটের দাম বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতেন। সেই টাকা আজ ফেরত পেয়ে গেলেন। পড়ে সই করুন।'

www.boiRboi.blogspot.com

'পড়ার কি দরকার। আপনারা কি মিথ্যে কথা বলবেন।' নির্দ্বিধায় সই করে দিল লোকটা। ব্যাগ থেকে পাঁচটা দশ হাজারের বান্ডিল বের করে সামনে রাখতেই লোকটা দু-হাতে সেগুলো তুলে নিল।

জয়ী বললেন, 'এবার আপনি চলে যেতে পারেন।'

টাকাগুলো কোনও মতে দু-পকেটে ঢুকিয়ে লোকটা চলে যেতে স্বপ্নেন্দু বলল, 'কি খারাপ লাগছে। আমি বইগুলো বিক্রি করে যা পেয়েছি তা থেকে তিন হাজার নিন।'

জয়ী খুব অবাক হলেন, 'কেন?'

'একটু ঋণ কমুক।'

'বাকিটা কবে শেষ হবে?'

'সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন, আমি কোনও কথা দিতে পারছি না। এই জন্যেই আপনাকে আমি নিষেধ করেছিলাম গতকাল। এই পুরনো বাড়িটা লোকটা নিয়ে নিলে কি এমন ক্ষতি হত আমার। আপনি কথা শুনলেন না!'

'বেশ তো, লোকটাকে দিয়ে দিচ্ছিলেন যখন তখন আমাকে দিতে আপনার নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে নেই। তবে একেবারে বিক্রি করতে বলছি না, মর্টগেজ রাখুন। তিন বছরের মধ্যে ছাড়িয়ে নিতে না পারলে এটা আর আপনার থাকবে না। আপনাকে ভাল সুযোগ দিলাম।' জয়ী হাসলেন।

'দূর! মর্টগেজ আবার কি! ওসবের ঝামেলায় আমাকে জড়াচ্ছেন কেন?'

'তাহলে?' জয়ীর কপালে ভাঁজ পড়ল।

'এটা আপনি নিয়েই নিন। এত টাকা দিলেন!'

জয়ী বললেন, 'আপনি বিক্রি করতে চাইলে হয়তো চার লাখ পেতেন। ভাড়াটে না থাকলে তিনগুণ বেশি। সেটা করে আমার টাকা না হয় ফিরিয়ে দিন।'

'কী মুশকিল! এসব করলে আমি মরে যাব।'

'মরে যাব মানে?'

'আমি কিছু ভাবতেই পারব না। ছবিটা হবে না। দেখুন, আমার বাবা এই বাড়িতে ছিলেন। বাড়িটা ওঁর প্রিয় ছিল। কিন্তু মরে যাওয়ার পর বাড়িটা ওঁর কোন উপকারে এল? লোকে ওঁর কথা ভুলেই গেছে। আমি একটা দাগ কেটে যেতে চাই। বাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকলে আমার অবস্থা বাবার মতো হবে।' খুব গম্ভীর গলায় বলল স্বপ্নেন্দু।

'চমৎকার। তাহলে এই কাগজটায় সই করে দিন। সাক্ষীদের পরে সই করিয়ে নেব। আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি। নিশ্চয়ই আপনার একার নামে বাড়ির মালিকানা রয়েছে এবং আর কারও কাছে বাড়ি লিখে দেননি?'

'একশোবার নয়। আপনি আমাকে কি ভাবছেন বলুন তো?'

'ভাবার সুযোগ পাচ্ছি কোথায়? শুধু মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।'

'মুগ্ধ?'

'আপত্তি আছে?'

'না, কি মুশকিল।'

'মুশকিল কেন?'

'ধরুন সুনসান দুপুর, কড়া রোদ। অথবা টিপটিপে বৃষ্টি, আকাশে মেঘ। উত্তর কলকাতার একটা গলিতে যে মেয়েটি হাঁটছে তার কপালে হলুদ টিপ, পরনে হলুদ শাড়ি। হঠাৎ একটা নোনাধরা বাড়ি দেখতে পেয়ে সে দাঁড়াল। তার চোখ বলছিল ওই বাড়িতে সে কখনও ঢোকেনি। আজ ঢুকল। সোজা দোতলায় উঠে একটা আধাখোলা দরজার সামনে গিয়ে দেখল ঘরে কেউ বই পড়ছে। যে পড়ছে সে মেয়েটিকে দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরে আপনি? এখানে কি করে এলেন?'

মেয়েটি হাত নাড়ল, 'এলাম। উঠুন তো, আমি একটু রেস্ট নেব।'

স্বপ্নেন্দু চোখ খুলল, 'চিত্রনাট্যের শুরু এভাবে ভেবেছি। আপনি ওই মেয়েটির চরিত্র করছেন। ব্যাপারটা ফ্যান্টাস্টিক হবে, তাই না?'

'তা হবে। তার সঙ্গে মুগ্ধতার ব্যাপারে কি মুশকিল হল?'

'না মানে, আমার প্রতি নয়, চরিত্রটার প্রতি আপনাকে মুগ্ধ হতে হবে। আপনি যেমন তেমনি বিহেভ করবেন।'

'অর্থাৎ, আমাকে আমার প্রতি মুগ্ধ হতে হবে।'

'ঠিক তাই।'

'সই করুন।'

স্বপ্নেন্দু রায়, নিজের নামটা লিখে নিজেই খুশি হল স্বপ্নেন্দু। পর্দায় যখন এই নামটা ভাসবে তখন তার সব স্বপ্ন সফল।

'তাহলে এখন থেকে এই বাড়ি আমার হয়ে গেল।' কাগজটা ভাঁজ করে ব্যাগে ঢোকালেন জয়ী, 'মোট কটা ঘর আছে?'

'ঘর? আটটা। কিন্তু সব ঘরে ভাড়াটে আছে।'

'তিন বছর বাদে ওঁরা থাকবেন না। আপনার কাছে তো এখন টাকা আছে। ভাল টাকা। আপনি কোনও হোটেলে বসে নিশ্চিন্তে চিত্রনাট্য লিখুন।'

'কেন? ওই ঘরটা তো—।'

'বাড়িটা আমি নিয়েছি। আমার ইচ্ছের ওপর আপনার থাকা নির্ভর করছে। আপনাকে বলেছিলাম আমি একটি ফ্ল্যাট খুঁজছি। আপাতত এই ঘরটাকে ঠিকঠাক করে নিলে আমার কোন অসুবিধে হবে না। আমরা দুজনে তো একসঙ্গে এ ঘরে থাকতে পারি না।'

চিন্তিত হল স্বপ্নেন্দু, 'আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু আমি কোথায় যাই বলুন তো?'

'সেটা আপনাকে ঠিক করতে হবে।'

'আমার জিনিসপত্র?'

এগুলোকে জায়গা খুঁজে পেলে নিয়ে যাবেন!'

'ও! মুশকিল। মানে—।'

শব্দ করে হেসে উঠলেন জয়ী, 'আবার ওই ভাষায় কথা বলছেন? ঠিক আছে বাবা, আপাতত থাকুন এখানে। তবে তিন বছরে মধ্যে টাকা শোধ করে না দিলে এই বাড়ি আমর হয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়া করেছেন?'

'না।'

'আমার আজ সময় নেই। খেয়ে নিয়ে লিখতে বসুন। হ্যাঁ, খাতায় সই করে ধার রেখে

www.boiRboi.blogspot.com

আর খাবেন না। এ ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আছে?'

'হ্যাঁ। এই যে।' দ্বিতীয় চাবি এগিয়ে দিল স্বপ্নেন্দু।

'এটা আমার কাছে রইল। চললাম।' জয়ী চলে গেলেন।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসে স্বপ্নেন্দু দেখল সে কিছুই ভাবতে পারছে না। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় এই বাড়ি মর্টগেজ রাখল বলে তার একটুও আফসোস হচ্ছে না। তিনটে বছর অনেক সময়। এই তিন বছরে ছবি শেষ করে বার্লিন, কান, টরেন্টো, টোকিওর ফেস্টিভ্যালগুলোতে ছবি দেখিয়ে আসা যাবে। তা হলে আর দেখতে হবে না। তথ্যমন্ত্রী জানতে পেরে বড় সরকারি ফ্ল্যাট কম ভাড়ায় দিয়ে দেবেন। কিন্তু এ কথা ঠিক, জয়ী তার খুব বড় উপকার করলেন আজ। নইলে সিগারেটওয়ালা বাড়িটার দখল নিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বলত। ব্যাটা পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়িয়ে বলেছিল?

খিদে পাচ্ছিল। পকেটে টাকাও আছে। কিন্তু বেরুতে ইচ্ছে করছিল না এখন। স্বপ্নেন্দু শুয়ে পড়ল। তার চোখের সামনে জয়ীর মুখ। জয়ী এই খাটে শুয়ে আছে। রেস্ট নিচ্ছে। তার পাশ ফিরে শোওয়া শরীরের রেখা অদ্ভুত ছবি তৈরি করছে দেওয়ালের পটভূমিকায়। ঘরের বাইরে তখন বেশ ভিড়। ছেলেটি, যার ঘর, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কি করবে বুঝতে না পেরে। তাকে ঘিরে ভিড়টা নানান প্রশ্ন করে যাচ্ছে। জয়ী ছেলেটির কেউ হয় না জানার পর একজন বলল, 'কি আশ্চর্য। জোরজবরদস্তি নাকি? বের করে দাও ঘর থেকে।' একজন মহিলা বললেন, 'কি নির্লজ্জ মেয়েমানুষ রে বাবা। দেশটা কি হয়ে গেল?'

'এইসময় দরজায় জয়ী এসে দাঁড়াল, 'কথাটা কে বললেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টা বরফ হয়ে গেল। জয়ী জিজ্ঞাসা করল, 'স্বীকার করবেন না?'

তবু কেউ কথা বলল না।

জয়ী বললেন, 'এই বল আপনাদের সমস্যা। আমাকে আপনারা নির্লজ্জ বলছেন। এই ভদ্রলোককে আমি চিনি। খুব টায়ার্ড ছিলাম বলে রেস্ট নিতে চেয়েছিলাম। এতে অন্যায় কোথায়? আর আপনি? আপনাকে বলছি, সারাজীবন ধরে একটা পুরুষের বিনা মাইনের ঝি হয়ে রইলেন, তার সেবা করলেন, সন্তান দিলেন কারণ তিনি আপনাকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে খাওয়াপরা দেওয়ার চুক্তিতে পাঁচজনকে সাক্ষী রেখে নিয়ে এসেছেন। এই জীবন যাপন করতে আপনার লজ্জা করে না। বলুন, কে বেশি নির্লজ্জ? আমি না আপনি?'

স্বপ্নেন্দু চোখ বন্ধ করল। সংলাপ একটু বড় হয়ে গেল না তো! বলার ধরনে মেলো এসে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিভাবে আরও কম কথায় বল যায় ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর এক স্বপ্ন দেখল সে। একটা লম্বা টেবিলে শুয়ে আছে জয়ী। ঠিক মাঝখানে হাজার পাওয়ারের বালব্ জ্বলছে। টেবিলের চারপাশে পাঁচজন মানুষ দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছে তাকে। এদের একজন মন্ত্রী, একজন সাংবাদিক, একজন নামকরা ডাক্তার, একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং শেষজন খুব সাধারণ মানুষ। মন্ত্রী বললেন, 'এই মেয়েছেলেটা এতদিন আমাদের জ্বালাচ্ছিল। এ দেশের অন্য মেয়েছেলেরা যা পারেনি এ তাই করতে চেয়েছিল। অনেক কায়দা করে একে ঘুম পাড়িয়ে এখানে আনা হয়েছে। আপনারা একে দেখতে চান?' চারজনেই মাথা নাড়ল। ডাক্তার বলল, 'ওর শরীরের গঠন

দেখা দরকার।' সাহিত্যিক বলল, 'শরীর থেকে কিরকম আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে বোঝা দরকার। সাংবাদিক বলল, 'কোন বিশেষ স্কুপ পেতে পারি দেখলে।' পাবলিক বলল, 'মেয়েছেলের শরীর একই রকম হয়। তবু দেখতে লোভ লাগে।'

মন্ত্রী হাততালি দিতেই একজন জয়ীর ওপর ঢেকে রাখা চাদর সরিয়ে দিল। সবাই যখন ঝুঁকে পড়েছে আরও তখন জয়ী উঠে বলল, 'কি দেখছিস তোরা? তোদের প্রত্যেকের মা আমার মতো দেখতে ছিল। দ্যাখ, নিজের মাকে দ্যাখ।'

স্বপ্ন মিলিয়ে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ভাগ্যিতেই লাফিয়ে উঠল স্বপ্নেন্দু। পেয়েছি, পেয়েছি। ইউরেকা। সে সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল। তার ছবির শেষ দৃশ্য পেয়ে গেছে সে। প্রথম আর শেষ দৃশ্য পেয়ে গেলে মাঝখানেরটা পেতে কি আর অসুবিধে হবে? চটপট লিখতে বসে গেল স্বপ্নেন্দু।

সন্ধের পরে বাড়ি থেকে বের হল সে। রাস্তায় পা দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সে চিন্তায় পড়ল। জয়ী যদি সত্যি আজ থেকে ঘর ছাড়তে বলতেন তা হলে সে কি করত? আজ না হয় পকেটে টাকা আছে কিন্তু যদি না থাকত? সে চিন্তা করতে লাগল। নিশ্চয়ই কারও বাড়িতে গিয়ে থাকতে হত? কার বাড়িতে। এই কলকাতায় তার কোন আত্মীয় নেই, বন্ধুও নেই। পরিচিত মুখগুলোর কথা মনে এল কিন্তু কেউ কি তাকে থাকতে দেবে?

উত্তর কলকাতার একটা বড় রেস্টুরেন্টে স্বপ্নেন্দু আজ ঢুকল। নানান সুখাদ্যে প্রায় আড়াইশো টাকা খরচ করে গেল। যাদের টাকা আছে তারা পৃথিবীর সব সেরা জিনিস উপভোগ করতে পারে এই সত্যটুকু আর একবার হৃদয়ঙ্গম করল সে। তারপর সে হাঁটা শুরু করল। এখন রাত হয়েছে। দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন কম। চলতে চলতে স্বপ্নেন্দু বিশ্বাস করে ফেলল তার আজ রাত্রে কোথাও শোওয়া জায়গা নেই। যে ঘটনা সাতদিন বাদে ঘটতে পারে তা আজ ঘটে গেলে কিছু বলার নেই। কোনও হোটেলে গিয়ে থাকবে? দেখতে কেমন লাগে? কিন্তু এই টাকা ফুরিয়ে যাবেই, তখন? কাছেই শুদ্ধদেব থাকেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললে কি রকম হয়? শুদ্ধদেব সবসময় নিঃস্ব মানুষের কথা তাঁর নাটকে বলে থাকেন।

স্বপ্নেন্দু দেখল একটা প্রাইভেট বাস থেকে রত্নাবলী নামছে। তারপর মাথা নিচু করে পাশের গলিতে ঢুকে গেল। স্বপ্নেন্দু চিৎকার করল, 'এই রত্নাবলী?'

রত্নাবলী দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকাল। স্বপ্নেন্দু কাছে যেতে সে বলল, 'কি ব্যাপার? এত রাত্রে তুমি এখানে?'

'তোমাকে পেয়ে খুব ভাল হল। কোত্থেকে আসছ?'

'রিহার্সাল দিয়ে। কোনও জরুরি কথা আছে?'

'না, মানে-ইয়ে—।'

'তাহলে যেতে দাও। আমাদের সদর দরজা বাড়িওয়ালা বন্ধ করে দিলে খুব বিপদে পড়ব। মাকে নেমে আসতে হয় দরজা খোলার জন্যে।'

'তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। চিত্রনাট্যের প্রথম আর শেষটা লিখে ফেলেছি। ফ্যান্টাস্টিক হয়েছে। তোমার রোল যদিও এখনও বের হয়নি—।'

'বের হলে খবর দিও। আমি যাই, কেমন?'

www.boiRboi.blogspot.com

'চল, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'তোমার বাড়িতে।'

হাঁটা শুরু করে রত্নাবলী বলল, 'অন্য সময় এসো। এত রাত্রে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে কথা উঠবে। আমার বাড়িওয়ালা লোক ভাল নয়।'

'তুমি ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'মানে?'

'আমরা তো কোন অন্যায় করছি না।'

'তাই হোক। তোমার সঙ্গে আমার দরকার কি?'

'ধরো আজ রাত্রে আমার কোথাও থাকার জায়গা নেই। তুমি থাকতে দেবে না?'

'সেকি? অসম্ভব স্বপ্নেন্দু।' আঁতকে উঠল রত্নাবলী।

'অসম্ভব কেন?'

'আমার দুটো ঘর। একটায় মা বাবা থাকেন। তাছাড়া তোমার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা নেই যাতে—! মাথাখারাপ! বাড়িওয়ালা জানতে পারলে খেয়ে ফেলবে। ভাড়া দেওয়ার সময় বলেছিল বাইরের লোক থাকতে পারবে না।'

'আমাকে বাইরের লোক ভাবছ? আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম।'

'স্বপ্নেন্দু, আমি একা থাকি।'

'এই বললে মাবাবা থাকেন।'

'আমার স্বামী নেই, এ কথাই বলছি।'

'আমি বন্ধু হিসেবে তো থাকতে পারি।'

'কি করে বোঝাই। এই, আমাব বাড়ি এসে গেছে। যাঃ, গেট বন্ধ। কি যে করি। সে-ই মাকে নেমে আসতে হবে।'

'দাঁড়াও। দরজার এস কে পাল লেখা আছে। ইনি কে?'

'বাড়িওয়ালা।'

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নেন্দু চিৎকার করল, 'মিস্টার পাল, একটু আসবেন? ও মিস্টার পাল? পালবাবু।' তারপর হতভম্ব রত্নাবলীকে সে বলল, 'মনে হয় পালবংশ এখন গভীর নিদ্রামগ্ন।'

'তুমি ওকে ডাকছ কেন?' চেঁচিয়ে উঠল রত্নাবলী।

তখন ওপরের জানলা খুলে গেল, 'কে?'

'আপনি মিস্টার পাল?'

'হ্যাঁ।'

'আমি স্বপ্নেন্দু। রত্নাবলীর বন্ধু। আপনার সদর দরজা খুলবেন?'

'দেরি হয়ে গেলে ওর মা খুলবে। আমাকে ডাকার কি আছে!'

'আমি যদি আজ রাত্রে এখানে থাকি তা হলে আপনার আপত্তি হবে?' স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'আমি বাইরের লোক নই। ওর সঙ্গে পড়তাম।'

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ সব কি ইয়ার্কি হচ্ছে, অ্যাঁ। এই যে ম্যাডাম, কাল এসে

আমার সঙ্গে কথা বলবেন।' জানলা বন্ধ হয়ে গেল।

রত্নাবলীর মুখ করুণ, 'এটা তুমি কি করলে? কি ক্ষতি করেছি আমি তোমার? যাও এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। প্লিজ।'

খুব মন খারাপ হয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে এল গলি থেকে। হাঁটতে হাঁটতে পাঁচমাথা মোড়ে এসে নেতাজির স্ট্যাচুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বেশ আছেন মশাই ঘোড়ায় চড়ে। অন্তত একটা ঘোড়া আপনার আছে। এখন তো আপনার একশো বছর পেরিয়ে গেছে। নীরদ সি-র চেয়ে সামান্য বড়। সেই ভদ্রলোক কিন্তু অক্সফোর্ডে বসে তাঁর মতো লিখে যাচ্ছে এখনও। ধরা যাক, প্লেন দুর্ঘটনায় আপনার মৃত্যু হয়নি। জাপানের কোনও গ্রামে দিব্যি বেঁচে আছেন। ভোরবেলায় উঠে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। শিশিরভেজা ঘাসে সামান্য হাঁটেন। যে জাপানি পরিবার আপনার দেখাশোনা করে তারা খুব ভাল। একজন বাগানে চেয়ার পেতে দেয়। আপনি সেখানে বসেন। বসে চা খান। তারপর তারা চেয়ারের সামনে একটা স্ট্যান্ড দাঁড় করিয়ে দেয় যেখানে অনেকদিন ধরে যে ছবিটা আঁকছেন সেটা সযত্নে আটকানো। আঁকার সরঞ্জামও তারা এনে দেয়। আপনি তুলি নিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন। মাঝে দু-একবার তুলি ছোঁয়াবার চেষ্টা করে থেমে যান। এ ছবি আপনি আঁকছেন সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট থেকে। তখন ছবির ভাবনা এক ছিল, আজ সেটা পাল্টেছে। কিন্তু আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। জাপানের টিভিতে দেখানো হয়েছিল ভারতবর্ষে আপনার জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। অনেকদিন পরে টিভি দেখছিলেন সেদিন। সেই খবরের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল ভারতবর্ষের মন্ত্রীরা ঘুষ খেয়ে ধরা পড়ে অথবা পড়ে না। যারা রাজনীতি করে তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। আপনার সময়ে কংগ্রেসে দুটো দল হয়েছিল এখন সেটা দুশো। যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই শুধু নেহরু পরিবারের বউ বলে তাঁকে মাথায় তুলছে লোলচর্ম বৃদ্ধ লোভীর দল নিজেদের স্বার্থ মেটাতে। ছবি যে ভারতমাতার তা নয় বোঝা যাচ্ছে না কারণ প্রতিদিন একটু একটু করে আপনি তাঁর ওপর বোরখা চাপিয়ে দিচ্ছেন তুলির চাপে।

হঠাৎ মাথার ভেতর নতুন আলোর ঝলকানি টের পেল স্বপ্নেন্দু। একশো বছরের নেতাজিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে ছবি তৈরি করলে কেমন হয়? ছবির শেষে টেবিলে শোয়া সেই মহিলার মতো ভারতমাতা চিৎকার করে বলবেন, 'আয়, তোরা আমাকে ধর্ষণ কর।'

'অ্যাই। এখানে কি মতলবে দাঁড়িয়ে?' রুক্ষ গলায় প্রশ্নটা এল।

'নেতাজিকে দেখছি।'

'রাতদুপুরে পেঁয়াজি। পকেটে কি আছে বের করো।' লোকটার হাতে লম্বা ছুরি। স্বপ্নেন্দু তাকাল, 'ধেৎ, মাইরি, কি মুশকিল।'

'তার মানে?' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল।

'অ্যাক্টিং জানো?'

'অ্যাক্টিং?'

'হ্যাঁ। আমি সিনেমা করছি।'

'কি সিনেমা?'

www.boiRboi.blogspot.com

'বাংলা সিনেমা। ফেস্টিভালে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা আস্তিনে লুকিয়ে লোকটা উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। খুব অবাক হয়ে গেল স্বপ্নেন্দু। বাংলা ছবির নাম শুনেই লোকটা অমন ভালমানুষ হয়ে গেল কেন? তা হলে মন্দমানুষও ভালমানুষ হয়।

এই সময় একটা পুলিশভ্যান এসে দাঁড়াল সামনে। একটা সেপাই গাড়ি থেকে নেমে তাকে টানতে টানতে ভ্যানে তুলে নিল। স্বপ্নেন্দুর কোন প্রতিবাদ তার কানে ঢুকল না। গাড়ি গিয়ে থামল লোকাল থানায়।

নীচের মহলের মানুষের সঙ্গে রাত দুটো পর্যন্ত বসে থাকার পর স্বপ্নেন্দুকে হাজির করা হল বড়বাবুর সামনে। সেই ভদ্রলোক চব্বিশ ঘণ্টার পারিবারিক, রাজনৈতিক, সরকারি নানান চাপে দিশেহারা হয়ে ঈষৎ পানীয় সেবন করে বসেছিলেন। দিলীপকুমারের গলায় হিন্দিতে বললেন, 'তোর মতো হুলিগানকে বাপের বাসি বিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার অভ্যেস আমার আছে।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কি মুশকিল! আমি বাঙালি।'

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঃ বাঙালি বলে মাথা কিনে নিয়েছিস নাকি? ওসব বাঙালিগিরি এখানে মাড়াবি না। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, সবাইকে হিন্দি বলতে হবে। তুই কে?'

'একি রকম কথাবার্তা। তুইতোকারি করছেন কেন? আমি সিনেমা করছি।'

'কি করছিস?'

'ফিল্ম ডিরেক্টার।'

এত বড় হাসির কথা বড়বাবু জীবনে শোনেননি। অনেকক্ষণ হা হা করে হেসে বললেন, 'কি ছবি করা হয়েছে?'

'এখনও হয়নি, শিগগির হবে।'

'অ। হাতে ভাল হিরোইন আছে?'

'মাইরি, কি মুশকিল—!'

'তুই একটা গুণ্ডা, হুলিগান, ছিনতাইকারী, সঙ্গে কত আছে?'

'যাচ্চলে। বলছি আমি ফিল্ম ডিরেক্টার।'

চোখ ছোট হয়ে গেল বড়বাবুর, 'প্রমাণ?'

'কিসের প্রমাণ?'

একজন বোনাফাইড লোকের নাম করো যে সার্টিফাই করবে।'

স্বপ্নেন্দু এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর ভবানীপুরের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের নাম বলল। শোনামাত্র সোজা হয়ে বসল বড়বাবু, 'ইয়ার্কি মারছ?'

'একদম না। ওঁকে ফোন করে বলুন স্বপ্নেন্দুকে চেনেন কিনা।'

'পাগল। এত রাত্রে ওঁকে ফোন করলে সি পি আমার বারোটা বাজিয়ে দেবে। আর কে চেনে, আর একটা নাম বলো।'

'মুশকিল। আমাকে যিনি ছবি করতে টাকা দেবেন তাকে ফোন করুন।'

'মালের নাম কি?'

'তথ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।'

অ্যাই শুয়ার! ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'একদম না। আমার ছবির জন্যে উনিই টাকার ব্যবস্থা করছেন।' স্বপ্নেন্দু তাকাল, 'আচ্ছা, গল্পউপন্যাসে যে সমস্ত পুলিশকে দেখানো হয়, মানে খারাপ ভাষায় কথা বলে, হম্বিতম্বি করা, তা থেকে আপনি বের হতে পারলেন না?'

বড়বাবুর চোখ পিটপিট করল, 'থার্ড নেম?'

স্বপ্নেন্দু ভাবনায় পড়ল। একটু ভাবতেই জয়ী এবং সন্দীপনের মুখ মনে পড়ল, 'সন্দীপন সেনের নাম শুনেছেন?'

'আমি কি অশিক্ষিত? আনকালচার্ড? বিখ্যাত নাট্যপরিচালক সন্দীপন সেনের নাম শুনিনি?' বড়বাবুর গলা নামল।

'উনি আমাকে চেনেন।'

'তাই নাকি? উনি তো এই এলাকায় থাকেন। বেশ, চলুন, ঢপ দিচ্ছেন কিনা হাতে হাতে বুঝতে পারব।'

বড়বাবুর জিপে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সন্দীপনদার বাড়িতে পৌঁছে গেল স্বপ্নেন্দু। সঙ্গে দুজন সেপাই। বড়বাবু নিজেই বেলের বোতাম টিপলেন। একবারেই দরজা খুললেন সন্দীপনদা। চেহারা দেখে বোঝা গেল এখনও ঘুমাননি। সন্দীপন পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গেলেন, 'কি ব্যাপার?'

'আপনাকে এত রাতে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। নিতান্ত বাধ্য হয়েই, এই ভদ্রলোককে চেনেন? এই যে, এদিকে আসুন।'

স্বপ্নেন্দু এগিয়ে যেতেই সন্দীপনদা চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'ওঃ, তুমি? এত রাত্রে তুমি আবার এসেছ?'

স্বপ্নেন্দু বড়বাবুর দিকে তাকাল, 'কি? শুনলেন তো?'

বড়বাবু কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আচ্ছা, পুলিশে চাকরি করছেন বলে একটু নর্মাল ব্যবহার করতে দোষ কি? জানেন, আজকাল ছবিতে, আপনি যে ধরনের ব্যবহার করেছেন, করলে নিজের কাছেই ক্লিশে বলে মনে হয়। ঠিক আছে, আমার ছবিটা একবার দেখবেন। কি নাম আপনার যেন?'

'কেন? নাম নিয়ে কি করবেন?'

'আমার ছবিতে ক'টা কসাই-এর সাইলেন্ট শট থাকবে। নো ডায়লগ। তার নাম রাখতে চাই আপনার নামে। লোকে ওকে ওই নামে ডেকে মাংস চাইবে।'

শোনামাত্র বড়বাবু আর দাঁড়ালেন না। সঙ্গীদের নিয়ে জিপে উঠে চলে গেলেন।

'এসব কি ব্যাপার?' অদ্ভুত গলায় বললেন সন্দীপন।

'আর বলবেন না, নেতাজির দিকে তাকিয়ে ছিলাম বলে আমাকে ধরে লকআপে পুরে দিল। মানুষ মানুষকে এত অবিশ্বাস করে। সরুন, একটু ভেতরে যাব।'

'ভেতরে যাওয়ার কি দরকার? পুলিশ তোমাকে ওখানে নিয়ে এল কেন?'

'আইডেন্টিফাই করাতে। আপনি চিনলেন বলে ওরা চলে গেল।'

'উঃ। কলকাতা শহরে কি গভীর রাতে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না

www.boiRboi.blogspot.com

তোমার?'

'এই কথাই তো বলব বলে ভেতরে যাচ্ছিলাম! আপনি তো এখনও ঘুমাননি।' সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল স্বপ্নেন্দু। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সন্দীপন বললেন, 'শোনো, আমি খুব সমস্যায় আছি। এখন রসিকতার সময় নয়।'

'আমি খুবই দুঃখিত সন্দীপনদা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আজ রাত্রে আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমি আর পারছি না। আপনি আমাকে শোয়ার জায়গা দিন।' স্বপ্নেন্দু আবেদন জানাল।

'শোয়ার জায়গা? এতদিন শুতে কোথায়?'

'আমার পৈতৃক বাড়িতে। সিগারেট খেয়ে সেটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল অ্যাডজাস্ট করতে। ম্যাডাম সেটাকে ও ম্যাডাম বলাতে আপত্তি করেছেন, জয়ী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়িটার মর্টগেজ নিয়েছেন। তিন বছরের মধ্যে টাকা না দিলে বাড়িটা ওঁর হয়ে যাবে। আপনি জানেন না?'

'না। জয়ী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে!' হতভম্ব সন্দীপন।

'দেয়নি। মানে দান করেনি। ওঁর কাছে বাঁধা রেখেছি বলে দিয়েছে।' স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'যাক গে। ও নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। বছর দেড়েক বাদে বার্লিন থেকে একটা ভালুক আমি আনবই। তখন টাকাটা শোধ করে দেব। অবশ্য তথ্যমন্ত্রী আমাকে গোলপার্কের কাছে একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ইচ্ছে হলে।'

'তার মানে তোমার ওখানে আছে জয়ী?'

'আমার ওখানে? দূর! কি মুশকিল। আমার ওখানে উনি থাকবেন কেন? উনি অবশ্য ফ্ল্যাট খুঁজছেন কিন্তু খোলনলচে পাল্টে না নিলে আমার ঘরে ওঁর মতো মহিলা কি থাকতে পারেন? এ বাড়িতেই ওঁর থাকার কথা। নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছেন।

'স্বপ্নেন্দু, জয়ী নেই। সে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।' কে যেন বলেছিল, সত্যিকারের আঘাত এলে রুচিবান শিক্ষিত সতর্ক মানুষের সমস্ত মুখোশ খুলে পড়ে যায়। তার ভেতর থেকে মেলোধর্মী সংলাপ বেরিয়ে আসে, বলার ধরনও সেইরকম হয়।

স্বপ্নেন্দু কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সন্দীপন এগিয়ে এলেন, 'ও তোমাকে ফ্ল্যাট খুঁজে দেবে বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গে কবে দেখা হল?'

'গতকাল। মেট্রো স্টেশনে।'

'ওর সঙ্গে কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ। আপনার দলের একজন, কি যেন নাম, কি যেন—?'

'কি রকম দেখতে? লম্বা, ফর্সা বেশ স্মার্ট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'বিক্রম? ওর নাম কি বিক্রম?'

'হ্যাঁ। বিক্রম, মনে পড়েছে।'

'উঃ। বিক্রম আমার এই সর্বনাশ করবে ভাবতে পারিনি আমি।'

'কি আশ্চর্য! বিক্রমদের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব তো আপনিই চাইতেন বলে শুনেছি।'

'বন্ধুত্ব এক জিনিস আর—।' সন্দীপন মাথা নাড়তে লাগলেন।

'জয়ী কোথায় গিয়েছেন তা আপনাকে বলেননি?'

'না। টেলিফোনে বলল, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন তো করতেই হবে, আজ তার ট্রায়াল দিচ্ছি। খোঁজ করার চেষ্টা কোরো না, আজ বাড়ি ফিরব না।'

'রিহার্সাল?'

'চুপ করো। আমার জীবন ছারখার হয়ে যাচ্ছে আর তুমি রসিকতা করছ? তোমার বাড়ি বাঁধা নিয়েছে আমাকে বলেনি। আমার মানসম্মান সব ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। কি করে আমি মুখ দেখাব?'

'আপনি যখন চারাগাছে জল দেননি তখনই এটা ভাবা উচিত ছিল।'

'তার মানে?'

'আর পারছি না সন্দীপনদা। খুব ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমাতে দেবেন?'

'ঘুমাও। যত ইচ্ছে ঘুমাও! স্নান করে দাড়ি কামিয়ে চা খেয়ে খুশি হওনি, এখন ঘুমিয়ে আমাকে কৃতার্থ করো।' চিৎকার করলেন সন্দীপন।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল স্বপ্নেন্দু। দুটো বেডরুম। কোনটায় শোবে কে? সন্দীপন-জয়ী যে ঘরে শোন সে-ঘরে শোওয়া উচিত হবে না। বেশি সাজানো ঘরটিকে সেই আন্দাজ করে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকল সে। চটি খুলে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল স্বপ্নেন্দু। আঃ, কি সুন্দর গন্ধ। কোন পারফিউম? স্বপ্নেন্দু ঝটপট ঘুমিয়ে পড়ল।

জাপানি পোশাক পরা একশো বছরের বৃদ্ধ লাঠি হাতে একটু একটু করে বাগানে হাঁটছিলেন। একটা গোলাপ গাছের সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য ঝুঁকে ফুলের ঘ্রাণ নিলেন। তারপর আকাশের দিকে তাকালেন। এই আকাশ পৃথিবীর সর্বত্র একই রকম। ঈশ্বর মাটি দিয়েছিলেন, মানুষ সেই মাটিকে অনেক ভাগে বিভক্ত করেছে। কিন্তু আকাশকে টুকরো করতে চেহারা পাল্টে দিতে কেউ পারেনি। তিনি ঘুরে দেখলেন চেয়ারের সামনে স্ট্যান্ডে আটকানো ছবিটা এখন ঝাপসা। সেইরকম বাগানের বাইরে একটি নারীমূর্তি এসে দাঁড়াল। গেট খুলে সামনে এসে বলল, 'আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'সত্যি আমি চিনতে পারছি না।'

নারী ছবিটির দিকে তাকাল, তারপর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বোরখা বের করে মাথা গলালো। গলিয়ে বলল, 'এবার?'

ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নেন্দুর। অসম্ভব ব্যাপার। জয়ী এমন কাণ্ড কি করে করলেন? হোক স্বপ্ন, তবু কলকাতা থেকে জাপানের একটি গ্রামে চলে গেলেন কী করে? দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরল সে। তার ভাবনা সব গুলিয়ে যাচ্ছে। দুটো আলাদা ভাবনা এক হয়ে যাচ্ছে কেন? সে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল।

'স্বপ্নেন্দু।'

স্বপ্নেন্দু তাকাল। সন্দীপন ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসে আছেন, 'তুমি দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছ। এবার আমাকে সাহায্য কর, প্লিজ।'

স্বপ্নেন্দু জবাব দিল না। এ কি উৎপাত।

www.boiRboi.blogspot.com

'এটা জয়ীর বিছানা। বিয়ের এক বছর পর থেকেই ও আলাদা শুত। তাতে আমার আপত্তি ছিল না। এভাবেই তো ও চিরজীবন থাকতে পারত।' সন্দীপন বিড় বিড় করলেন, 'আমি তো ওকে প্রেম দিয়েছিলাম। তবু—।'

'আপনি ভালমানুষ না মন্দমানুষ?'

'আমি? জানি না। প্রশ্নটা জয়ীকে কোরো।'

'জয়ী ভালমানুষ না মন্দ মানুষ?'

'কি বলি আমি, কি বলি।'

এই সময় নীচের দরজায় শব্দ হল। তারপরই জয়ীর গলা শোনা গেল, 'বাঃ। চমৎকার। সদরদরজা খোলা রয়েছে।'

স্বপ্নেন্দু তাকাল। সন্দীপন চেয়ারের সঙ্গে এঁটে রয়েছেন যেন। একটুও নড়লেন না। একটু পরেই জয়ীকে দরজায় দেখা গেল, 'একি! আপনি? এই খাটে?'

'খুব ঘুম পেয়েছিল—।'

'ঘুম পেয়েছিল তো নিজের ঘরে যাননি কেন?'

'অভ্যেস করছিলাম। আমাকে তো ছাড়তেই হবে।'

জয়ী তাকালেন। সন্দীপনকে দেখলেন, 'তুমি এখানে? ঘুমাওনি?'

সন্দীপন উঠে দাঁড়ালো, 'যাচ্ছি। ঘুমাতে যাচ্ছি।' তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্বপ্নেন্দু বিছানা উঠে দাঁড়াল, 'আমি আপনার বিছানা না জেনে, মানে, কিছু মনে করবেন না!'

জয়ী কিছুই না বলে দাঁড়িয়ে রইলেন একপাশে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আচ্ছা, চলি, মানে—!'

জয়ী তবু নিরুত্তর। স্বপ্নেন্দু ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

দরজায় তালা ঝুলছিল। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল স্বপ্নেন্দু। এটা কি তার ঘর? সমস্ত জিনিসপত্র এত সুন্দর করে গুছিয়ে রাখল কে? এমনকী তার জামাপ্যান্টও ভাঁজ করে রাখা আছে। হঠাৎ যেন এই ঘর তার কাছে অপরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। যেন একটা স্বপ্ন দেখছে এমন ঘোর লাগল। জামাপ্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরে শুয়ে পড়ল স্বপ্নেন্দু। এবং তখনই নাকে সেই মিষ্টি গন্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহা, কী মিষ্টি। তার বিছানায় পারফিউমের গন্ধ? খুব চেনা লাগছে গন্ধটা। হ্যাঁ, এই পারফিউমের গন্ধ সে সন্দীপনদার বাড়িতে খাটে শোওয়ার সময় পেয়েছিল। তা হলে কি জয়ী এখানে এসেছিলেন? সারারাত এই ঘরে ছিলেন? এই খাটে শুয়েছিলেন? মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল তার। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। উঠে বসল সে। না, আর কোনও চিহ্ন নেই শুধু সেই সুবাস এই বিছানায়।

ভাবতে চেষ্টা করল স্বপ্নেন্দু। কি আশ্চর্য, কোনও ভাবনাই সে ভাবতে পারছে না। এমন তো কখনও হয়নি। ভাবতে বসলেই হাজারটা চিন্তা লাফিয়ে আসত এতকাল। এখন এ কি হল? সে উঠে টেবিলের কাছে গেল। গতকাল যে চিত্রনাট্যের খসড়া সে করেছিল তার মার্জিনে লেখা হয়েছে 'না ভাল, না মন্দ, মানুষেরা।' এ নিশ্চয়ই জয়ী লিখেছেন।

কেন? চিত্রনাট্যের শুরু অর শেষ ভাবনায় এসেছে কিন্তু এ কি রকম কথা? না ভাল, না মন্দ, মানুষেরা? সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সন্দীপনের মুখ মনে পড়ল তার। জয়ীকে দেখার পর কীরকম শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে ওর চেয়ে ভালমানুষ পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। তা হলে?

পারফিউমের গন্ধ নাকে লেগে রয়েছে। এই গন্ধের আয়ু কতক্ষণ তা স্বপ্নেন্দু জানে না। কিন্তু অদ্ভুত আগ্রাসী শক্তি আছে গন্ধটার। স্বপ্নেন্দুর সমস্ত ভাবনাচিন্তা গ্রাস করে তাকে পুতুল করে দিচ্ছিল। সে চেয়ারে গিয়ে বসল। ঠিক যেভাবে সন্দীপন বসেছিলেন। প্রতীক্ষায়।

www.boiRboi.blogspot.com

নিকটকথা

আজকাল এটা খুব হচ্ছে। আর কারও হচ্ছে কিনা জানি না, আমার হচ্ছে। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলেই গা গুলিয়ে ওঠে, বমি পায়। নিজের পাছায় লাথি মারা যায়না বলে সেই বমিটা গিলে ফেলি। আমি তাই চেষ্টা করি কম কথা বলতে, একদম যদি না বলতে পারতাম তাহলে মন্দ হত না।

আমি যে বাড়িটায় থাকি সেটা তৈরি হয়ছিল আমার জন্মানোর বহু বছর আগে। একতলার কোণের ঘরটা আমার জন্যে বরাদ্দ। ঘরটায় সুবিধে হল রাস্তা দিয়ে ঢোকা যায় আবার ভেতরে যাওয়ার দরজাও আছে। ওই ঘরেই আমি থাকি আর আমি কথা বলতে ভালবাসি না সেটা বাড়ির সবাই জেনে গেছে বলে আমায় কেউ বিরক্ত করে না। আমার বয়স এখন আঠাশ।

আমার বার্থ সার্টিফিকেটে যে জন্ম তারিখ লেখা রয়েছে সেটা ধরলে আমার বয়স এখন সাতাশও হয়নি। স্কুলে ভর্তি করার সময় কর্পোরেশনকে ম্যানেজ করে বাবা একটা বার্থ সার্টিফিকেট জোগাড় করে ভেবেছিল, ছেলের আয়ু এক-দেড় বছর বাড়িয়ে দিলাম। এটা শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, আমার সঙ্গে পড়ত এমন অনেক ছেলের দেখেছি দুনম্বরী বয়স করে দিয়েছে বাপ মা। জিজ্ঞাসা করলে তেনারা বলবেন, যা চাকরির বাজার, হাতে দেড়-একবছর থাকলে খোঁজাখুঁজির সুবিধে হবে। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয়েছিল আমরা চাকরি পাব না ঠিক সময়ে, দরজায় দরজায় খুব ঘুরতে হবে এবং সেই ফাঁকে সময়সীমা ফুরিয়ে যেতে পারে তাই ওই বাড়তি সময়টুকু দিলে আমাদেরই উপকার হবে। বার্থ সার্টিফিকেটের কথা কিন্তু মা-বাবার মনে নেই। আমার পনের বছর বয়স পর্যন্ত এ বাড়িতে পায়েস হত ঠিকঠাক জন্মদিনে। পনের বছর বয়সে মা মারা যান।

আমার একটা এম.এ. ডিগ্রি আছে। বঙ্গ সন্তান স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়। কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে। কেন ভর্তি হচ্ছে, যেটা পড়ছে সেটা পড়ে পরে কি উপকারে লাগবে এ নিয়ে কেউ ভাবে না। তুমি এম.এ. পাশ করেছ, টাকাপয়সা খরচ করে পড়িয়েছি এতদিন, এবার চাকরি করে সংসারের উপকারে এসো। কিন্তু ইতিহাস বাংলা অথবা ফিলজফি নিয়ে পঞ্চাশ বাহান্ন পেয়ে পাশ করে হাত পাতলে যে চাকরি পাওয়া যায় না একথাটা ওঁরা যখন বিশ্বাস করবেন তখন ওঁদের কাছে আমরা ঘি শুকিয়ে যাওয়া ছাই-এর গাদা ছাড়া আর কিছু নই।

এই এক গ্যাঁড়াকল। পশ্চিমবাংলার প্রতিটি কলেজে প্রতিবছর হাজার হাজার

ছেলেমেয়ে ভর্তি হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনবছর ধরে হিউমানিটিজ গ্রুপের বিষয়গুলো পড়ানোর অভিনয় করা হয়। ছেলেমেয়েগুলো সেই বৈতরণী পার হবার পর দ্যাখে অর্জিত বিদ্যা কোন কাজে লাগছে না। স্কুলে মাস্টারি করতে গেলেও এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হতে হবে। আবার দুবছর। তারপর সমস্ত রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা স্কুলগুলোর একজন বাংলা বা ফিলজফির মাস্টার মশাই কবে অবসর নেবেন তাঁর সেই চেয়ারটির দিকে শকুনের মত তাকিয়ে থাকবে হাজার হাজার বাংলা অথবা ফিলজফির এম.এ., প্রতিবছর যাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দু-চারজনের কপালে শিকে ছিঁড়তে পারে, বাকিরা ঢুকে যায় কেরানির চাকরিতে তাও ভাগ্য সহায় থাকলে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অথবা ভাষার ইতিবৃত্ত পড়ে কি লাভ হল ছেলেটির? প্রশ্ন করলে উত্তর একটাই, জ্ঞানার্জনের জন্যে পড়াশুনা। নিজেকে শিক্ষিত করতে, ঐতিহ্যবহন করতে এই শিক্ষানবিসী। পেটে যার ভাত নেই তাকে দিনরাত রবীন্দ্রসংগীত গাইতে বলার মত ব্যাপার। আসলে স্কুলের পর পাঁচবছর এত হাজার হাজার ছেলেকে ভুলিয়ে রাখা গেল, এটাকে যাবা লাভ মনে করেন তাঁদের কাছে মুরগি আর কুকুরের মাংসের কোন পার্থক্য নেই। বিকেলবেলায় চমৎকার চপ কটিলেট ভেজে হাসিমুখে খদ্দেরের প্লেটে ধরে দিতে অসুবিধে হয় না।

দেখে শুনে মনে হয় আমরা শালা কুত্তার থেকেও অধম। রাস্তার ঘেয়ো কুত্তার কথা বলছি না। বাড়িতে বাড়িতে যেসব কুত্তা আদরে মানুষ হয় তারা আমাদের থেকে ঢের ভাল আছে। আমার এক মাসতুতো বোন তার কুকুরকে কাঁটামাছ খেতে দেয় না, গলায় কাঁটা ফুটে যাবে বলে। বমি বা পায়খানা করলে আদুরে গলায় ধমক দেয়, 'নো কিটি নো। তোমাকে কতবার বলেছি এসব খেলে ওয়েলটে যাবে। লোকে দেখলে বলবে তোমাকে আমি কিছুই শেখাইনি।' এইসব বলতে বলতে সে যখন বস্তুগুলো পরিষ্কার করছে তখন তার কিটি পাশে বসে লেজ নাড়ছে কান ঝুলিয়ে প্রসন্ন মুখে।

এই যে আমি কুত্তার সঙ্গে নিজেদের তুলনা করলাম, এটা আমার ভাল লাগল না। মুশকিল হল, কারও সঙ্গে যে কথা বলে না তার মনে সবসময় কথার খই ফোটে। আমি কেন বেঁচে আছি এ প্রশ্নের উত্তর আমার নিজের জানা নেই। কিন্তু উত্তরটা আমি সবসময় খোঁজার চেষ্টা করি। আর এই চেষ্টার জন্যে মনে হরেকরকম ভাবনা চলকে ওঠে। কুত্তা-ভাবনাটা সেই কারণে।

আমি এম.এ. পাশ করেছিলাম বাংলা নিয়ে। বাংলাদেশের মানুষ একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে শ্রদ্ধা করে। তাঁদের চেষ্টায় বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর অন্যতম স্বীকৃত ভাষা। ওরা যে ভাষার জন্যে জীবন দিয়ে হাততালি পায় আমি সেই ভাষায় এম.এ. পাশ করে জুতোর সুখতলা ক্ষইয়েছি এতদিন। এটাকে কি বলব? কলকাতায় যখন কেউ কেউ একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করে তখন তাদের ভণ্ডামি দেখে পিত্তি জ্বলে যায়।

হ্যাঁ, শব্দটা এতক্ষণে মাথায় এল। আমি আমার চারপাশে শুধু একের পর এক ভণ্ড দেখে যাচ্ছি। এত ভণ্ড একসঙ্গে বাস করে কি করে? এখন মনে হয় এই প্রশ্নটা করাও বোকামি। অন্ধদের দেশে তাঁরা তাঁদের মত করে বেঁচে ছিল। একজন চক্ষুষ্মান সেখানে হাজির হয়ে নানান অসঙ্গতি দেখে মানিয়ে উঠতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সে চোখ বন্ধ

www.boiRboi.blogspot.com

করে ফেলতেই সব কিছু সহজ হয়ে গেল তার কাছে।

এদেশে বাস করতে হলে সবাইকে ভণ্ড হয়ে থাকতে হবে। মুখে এক কথা, মনে আর এক, কাজ করব যা ভাবব অন্য। এ না হলে তোমার টায়ার পাংচার। আমার বাবা রাজনীতি করেন। গত কুড়ি বছর শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন। নীচের দিকের কমিটি ডিঙ্গিয়ে পার্টির ওপর দিকের কমিটিতে পৌঁছে গিয়েছেন। এখন তাঁর হাতে দলের অনেক কিছুর দায়িত্ব। কিন্তু তিনি কখনও নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। একটা ভেজা কাককেও দলের নমিনেশন পেলে তিনি নির্বাচনে জিতিয়ে আনতে পারেন তবু নিজে দাঁড়াতে চাইছেন না। এই ব্যাপারটাকে লোকে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। পার্টির জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে কজন পারে?

এই ভদ্রলোক চাকরি করতেন কর্পোরেশনে। কুড়িবছর আগে যখন দল ক্ষমতায় আসেনি তখন উনি এগারটার মধ্যে অফিসে যেতেন। দল ক্ষমতায় এলে তাঁর ওপর এত চাপ পড়ল যে তিনি একটার আগে সেখানে পৌঁছতে পারতেন না। কোনকোনদিন সেটাও সম্ভব হত না। অথচ মাইনেপত্তর ঠিকঠাকই পেতেন। সেসময় বাড়িতে আর একধরনের লোক আসত। তাদের কেউ কেউ কর্পোরেশনের কর্মচারী, বাকিরা কর্পোরেশনের অনুগ্রহ পেতে আগ্রহী। আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনে মনে হত বাবার হাতে একটা বিশেষ চাবি আছে যা দিয়ে তিনি যেকোন ইচ্ছার দরজা খুলে দিতে পারেন। তা এই করতে করতে বাবা যখন আরও ওপরতলায় উঠে এলেন তখন নিজের যা যা প্রাপ্য বুঝে নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। অবশ্য আমার একভাই একবোন কর্পোরেশনে চাকরি করছে। সল্টলেকে দু-দুটো ফ্ল্যাট ভাড়া খাটছে। হ্যান্ডলুমের পাজামাপাঞ্জাবি বাবা শরীর থেকে নামাননি। আমাদের সংসারের খরচ যেমন চলছিল তেমনই চলছে। এখন শুধু সকাল হলেই বাইরের ঘরে ভিড়। এলাকার ভাগ্যটে বাড়িওয়ালা, কারখানার মালিক শ্রমিক থেকে রাজ্যের গোলমাল ঢেউ-এর মত বাবার পায়ে এসে আছড়ে পড়ছে এবং তিনি সেগুলোর সুরাহা করে দিচ্ছেন।

বছর তিনেক আগে কাগজে খবর পড়ে কৌতূহল হয়েছিল। বিখ্যাত এক গুরুদেব এসেছিলেন কলকাতার উপকণ্ঠে। দেখতে গিয়েছিলাম। তখন বিকেলবেলা। বাস থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করতেই লোকে উৎসাহ নিয়ে দেখিয়ে দিল। বাড়ির সামনে খুব ভিড়। পাগলের মতো লোকে ঢুকতে চাইছে। স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সেই ভিড় সামলাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত লাইন করে দেওয়া হল। অতবড় লাইন আমি ইডেন গার্ডেনেও দেখিনি। লাইনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত শুনে গেলাম বাবার অযৌক্তিক কাহিনীগুলো। ক্যানসার তো বটেই এখন নাকি উনি এইড্‌সও সারিয়ে দিচ্ছেন স্পর্শ করে। বুঝতে পারলাম লাইনের বেশিরভাগ মানুষ কঠিন অসুখে ভুগছেন অথবা অসুস্থদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। তিনঘন্টার অপেক্ষা আমাকে পৌঁছে দিল যে ঘরে সেখানে ষণ্ডামার্কা স্বেচ্ছাসেবকরা রয়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে একটা দড়ি দরজা গলে ওঘুরে ঢুকে টেবিলের ওপর রয়েছে। আমার আগের মানুষটি সেই দড়ি ধরে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করছে করুণগলায়। তিরিশ সেকেন্ড হওয়া মাত্র জোর করে তাকে বের করে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বলল, 'তিরিশ সেকেন্ড! তিরিশ সেকেন্ড যা বলার বাবাকে বলে দিন।'

'তিনি কোথায়?' আমি অবাক।

'আরে! ওই দড়িটা দেখছেন না?'

'কিন্তু এটা তো বাবা নন?'

'যাচ্ছলে। কোথায় থাকো তুমি।' দ্বিতীয়জন বলল, 'ওই দড়ির প্রান্ত বাবা দোতলার ঘরে বসে বাঁ পায়ে ছুঁয়ে আছেন। ওটা ধরলেই বাবা তোমাকে টের পেয়ে যাবেন।'

'টেলিফোনের লাইনের মত কথা বলা যাবে?'

'আর, বলবে তো বল নইলে কেটে পড়।'

আমি দড়িটা ধরে জোরে টান মারলাম কিন্তু ওটা বেশ শক্ত আর নাড়ানো গেল না। মনে হল ওই দড়ির প্রান্ত ওপাশে, চোখের আড়ালে কোন শক্ত খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে। ততক্ষণে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল। আমার পরের লোকটি হামলে পড়ল দড়ির ওপর।

গুরুদেব সে-সময় কি করছেন কেউ জানে না, শুধু ওই দড়ি ধরে বৈতরণী পার হবার জন্যে যে আকুলতা ভক্তদের মধ্যে দেখেছি তাতে নিজেকে জুতোতে ইচ্ছে করছিল। এঁরাই আমাদের বাবা কাকা দাদা জেঠা। এঁদের সঙ্গেই আমরা বাড়িতে বাড়িতে বাস করি শ্রদ্ধা নিয়ে। চমৎকার।

ইদানিং আমার বাবা সেইরকম গুরুদেবের ভূমিকা নিয়ে ফেলেছেন। ওপরতলায় উঠলেই ক্ষমতা আসে হাতে, আর ক্ষমতা এলেই চামচে জুটে যায়। বাবারও জুটেছে। তারা পার্টিরই কর্মী। ওপরে ওঠার ইচ্ছে যতটা গুছিয়ে নেবার সাধ তার চেয়ে ঢের বেশি। লোকজন জেনে গেছে বাবা প্রসন্ন হলে এম এল এ হতে বাধা, রাইটার্স থেকে ফাইল নড়বে দূরের কথা, যাকে বলে ছুটবে, ঠিক তাই। কিন্তু ইদানীং তারা আমার বাবার দর্শন পাচ্ছেন না। এত লোকের সঙ্গে জনে জনে কথা বলার মত সময় তাঁর নেই। অতএব চামচেরা স্ক্রুটিনি করে। স্টোক দেয় অথবা কাটায়। যাঁর ভাগ্য খুব ভাল তিনি বাবার দর্শন পান। আগে বাবা বসতেন আমাদের বাইরের ঘরে। এখন আর একটি ভেতরের ঘরের দরকার হয়েছে আশীর্বাদধন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে। কিন্তু এসব চলে ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত। তারপরেই বাবা বেরিয়ে যান গণতান্ত্রিক কর্মধারা রূপায়ণের জন্যে।

এম.এ. পাশ করার পর বাবা আমাকে ডেকে বলেছিলেন। ভদ্রলোক এত ব্যস্ত যে আমার সঙ্গে আলাদা কথা বলার সময় তাঁর ছিল না। ভাই বোনের সঙ্গেও একই অবস্থা। ডাক পড়েছিল মধ্যরাত্রে। বাড়ি ফিরে স্নান করে উনি আহ্নিকে বসেন। শব্দটা বাবাই ব্যবহার করেন। রাত এগারোটার পরে কেউ ডাকতে এলে চাকরকে বলে দেন, 'এখন আমি ব্যস্ত, আহ্নিকে বসেছি; কাল আসতে বল।' বাবা আহ্নিক সারেন দু পেগ শীভাস রিগ্যাল আর আটটা কাজুবাদামে। সেই কর্পোরেশনে চাকরি করার সময় থেকেই এই পরিমিতিবোধ বাবার ছিল। তখন দু পেগ ডি এস খেতেন। একটু একটু করে ডি এস থেকে প্রিমিয়ামে উঠলেন। এখন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়াম হুইস্কি বাতিল করে স্কটল্যান্ডের প্রিমিয়ামে অবস্থান করছেন। তবে কখনই দু পেগের বেশি নয়। সারাদিন খাটাখাটনি, টেনসনের পর দু পেগ হুইস্কি খেলে নার্ভ ভাল থাকে। হার্টও সক্রিয় হয়। বাবা এবং তাঁদের মহান নেতারও নাকি ওই অভ্যেস আছে। সত্যি কথা, তিরাশি-চুরাশিতেও

www.boiRboi.blogspot.com

ভদ্রলোকের ছবি দেখলে মনে হয় সত্তর পার হননি। ওই বয়সে ভদ্রলোক যেরকম পরিশ্রম করেন তা একটা তিরিশ বছরের ছেলে করলে কদিনেই হাঁপিয়ে উঠবে। বাবা তাঁর এই মহান নেতাকে অনুসরণ করছেন অন্ধভাবে। ইদানীং বাবার কথাবার্তাও ওই ভদ্রলোকের মত হয়ে গিয়েছে।

আমার তখন ঘুম পাচ্ছিল। ভাবলাম বলে দিই এখন যেতে পারব না। তারপরই মনে হল অনেককাল বাবার সঙ্গে কথা বলিনি, উনিও ডাকেননি। তাছাড়া এরকম একটা ডাকের জন্যে দর্শনপ্রার্থী জনগণ যখন হাঁ করে বসে থাকে তখন আমি কি এমন হরিদাস যে ফিরিয়ে দেব?

গেলাম। বালিশে হেলান দিয়ে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বাবা বসেছিলেন। অনেককাল পরে বাবাকে খালি গায়ে দেখলাম। একটু রোগা রোগা মনে হল। লোকটাকে খুব খাটতে হচ্ছে।

'এসো। বসো, উঠে বসো। হ্যাঁ, বিছানাতেই বসো।' বাবা সামান্য সরলেন।

'না। ঠিক আছে।' আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'তুমি তো এম.এ. পাশ করলে। এবার কি করবে ঠিক করছে?'

'কিছুই ঠিক করিনি।'

'কেন?'

'আমি ঠিক করলেই সেটা করা যাবে কিনা তাতো জানি না।'

'আঃ, বড্ড পেঁচিয়ে কথা বল। তোমার মায়ের স্বভাব ছিল এইরকম।'

'আমি তো মায়েরই ছেলে।'

'মায়ের ছেলেরা কখনও বড় হয় না। হ্যাঁ। কলেজ সার্ভিস কমিশনে নাম লিখিয়েছ?'

'এখনও ওরা নাম চায়নি।'

'তোমার কলেজে পড়ানোর ইচ্ছা আছে তো?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'স্ট্রেঞ্জ। তাহলে বাংলা নিয়ে এম.এ. পাশ করলে কেন?'

'চাকরি করব বলে পড়িনি।'

'বাঃ। তা যখন পড়েই ফেলেছ তখন বিদ্যাটাকে কাজে লাগাও। ছেলেমেয়েদের শেখাও।'

'এই বিদ্যে শেখাবার জন্যে এম.এ. পড়ার দরকার হয় না। বাড়িতেই পড়া যায়।'

বাবা আমার দিকে তাকালেন। আমি তখনও দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি গ্লাস শেষ করে তাঁর কোটা অনুযায়ী দ্বিতীয়বার ঢাললেন। জল মেশাবার সময় লক্ষ্য করলাম তাঁর চোখ খুব সতর্ক। ঠিক পরিমাণ মত জল ঢেলে জাগটা ট্রের ওপর রেখে একটা কাজু মুখে পুরলেন, 'তোমার কথা শুনে আমি একটুও রাগ করিনি। এসো, এখানে বসো। কাম।'

অগত্যা বসতে হল। মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। ছেলেবেলায় দেখেছি মা বাবার জন্যে রাত জেগে বসে থাকতেন। তখন বোধহয় সংসারে খুব টানটানি ছিল। দেশ-উদ্ধার করে এসে বাবা খেতে বসতেন চোরের মত। প্রায়ই দেখেছি মায়ের খাবার কিছুই থাকত না। আর তখন মনে হত ওই লোকটা মায়ের খাবার খেয়ে নিয়েছে বলে

মা খেতে পেল না। তখনও বাবার নিয়মিত রাতের আহ্নিক শুরু হয়নি। কর্পোরেশনের এ্যাসেসমেন্ট সেলে বদলি হবার পর থেকেই বাড়ির হালচাল পাল্টালো। দুবেলা আমিষ পড়তে লাগল পাতে। এবং বাবা তাঁর আহ্নিক শুরু করলেন। কিন্তু মা হয়ে গেলেন আরও চুপচাপ।

বিছানায় বসার পর বাবা গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কাল থেকে তুমি পার্টি অফিসে যাবে। তোমাকে সবাই চেনে, তুমি এবার চেনাজানা করে নাও।'

'কেন?'

'আমার ছেলে হয়ে তোমার সঙ্গে পার্টির কোন সংযোগ নেই এটা ভাল দেখায় না, তাই।'

'সেটা কি অন্যায়?'

'ন্যায় অন্যায় জানি না। আমি যখন সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষকে আমাদের পতাকার নীচে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করছি তখন প্রশ্ন উঠতে পারে, নিজের ছেলের ক্ষেত্রে কেন পারিনি?'

'এর উত্তর তো আপনার জানা আছে।'

'জানা আছে? নাঃ, আমি জানি না!'

'যিনি আপনার আদর্শ বলে শুনেছি তিনি তো তাঁর ছেলেকে পার্টিতে নিয়ে যেতে পারেননি। নিশ্চয়ই তাঁকেও এ ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। সেই কৈফিয়ৎই কোট করবেন।'

'মাই গড!' বাবা চমকে উঠলেন।

'আমি ভুল বললে বলুন সংশোধন করে নেব।'

'তুমি কার সঙ্গে নিজের তুলনা করেছ জানো? ওর মত কর্মক্ষমতা থাকলে তুমি এম.এ. পাশ করে বেকার বলে থাকতে না।' বাবা হঠাৎ রেগে গেলেন।

'আমি কারও সঙ্গে নিজের তুলনা করছি না। কৈফিয়ৎ দেবার কথা উঠল বলে বললাম।'

কয়েক সেকেন্ড লাগল বাবার, নিজেকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে। বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আমার অনেক পরিকল্পনা আছে। দ্যাখো, এতকাল রাজনীতি করছি। রাজনীতির জন্যে চাকরি ছাড়লাম। এখন পার্টির কর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি। তুমি হয়তো জানো আমাকে অনেকবার ইলেকশনে দাঁড়াতে বলা হয়েছে কিন্তু আমি আড়ালেই থাকতে চাই। তবে সততার তো একটা মূল্য আছেই। সেই কারণেই পার্টিসূত্রে কিছু ক্ষমতা আমি পেয়েছি। এখন দেখছি মাঝারি শ্রেণীর নেতাদের ছেলেরা ঝটপট মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। তুমি বেলগাছিয়ায় যাও অথবা টালিগঞ্জে, শুনবে অমুক নেতা বা মন্ত্রীর ছেলে যা বলবে তাই হবে। এইসব ছেলের সঙ্গে পার্টির যোগ কিন্তু খুব কম। যেদিন বাবা থাকবে না সেদিন তাদেরও দিন শেষ। এই ভুলটা আমি তোমার ক্ষেত্রে করতে চাই না। তাছাড়া আমি তোমাকে একেবারে তৃণমূল থেকে উঠতে বলছি না। তার প্রয়োজনও নেই। তোমার ভূমি তৈরি আছে। এম.এ. ডিগ্রিটা কাজে লাগবে। ওটা তুমি চাকরি করার জন্যে অর্জন করোনি। পার্টিতে তোমার স্ট্যাটাস বাড়াবার জন্যে ব্যবহার করো। আমাদের

www.boiRboi.blogspot.com

বেশিরভাগই তো অশিক্ষিত। কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ তাই লাঠি ঘোরাতে পারে সহজেই।'

আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।

'খুব সহজ। পার্টির সঙ্গে সংযোগ রাখলে তোমাকে ওপরের দিকের কোনও সেলে প্লেস করতে আমার অসুবিধা হবে না। অধ্যাপনা করতে চাইলে কলেজ সার্ভিস কমিশনের প্যানেলের প্রথম দিকে তোমার নাম থাকবে।'

'আর না চাইলে—?'

'হ্যাঁ। এটাই আমি চাইছি। অধ্যাপনা করলে জীবন একটা জায়গায় আটকে থাকবে। অর্থ বল সম্মান সব একই জায়গায় পাক খাবে। আমি সেটা চাই না। দ্যাখো, আমাকে কেউ কখনও সাহায্য করেনি। আমি যা করেছি নিজের চেষ্টায় করেছি। কিন্তু এই করাটা এই সামান্য যে—। যাক গে, আমি চাই, তুমি আমার থেকে শুরু কর।'

'কি রকম?'

'দুজন ননরেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এ্যাপ্রোচ করেছেন। তাঁরা এখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে চান। একজন মাছের বিভিন্ন আইটেম টিনে প্যাক করে বিদেশে পাঠাবেন আর একজন টেক্সটাইলের কারখানা করবেন। কিন্তু ওঁদের কোন এস্টাব্লিশমেন্ট এদেশে নেই। তুমি ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দেবে। প্ল্যান প্রোগ্রাম যা কিছু ইঞ্জিনিয়াররাই করবে, তুমি শুধু সেটা এক্সিকিউট করবে। ব্যাপারটা রপ্তর করতে তোমার বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তার আগে তোমাকে পার্টির লোক হতে হবে। কয়েক মাস যাওয়া আসা, মিছিলে করা, স্লোগান দেওয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে তোমাকে পুশ করতে আমার অসুবিধে হবে না। এদেশে ব্যবসা করতে গেলে প্রথম সমস্যা হল শ্রমিক সমস্যা। তুমি যদি শ্রমিকদের একজন বলে নিজেকে আগেই চিহ্নিত করতে পারো তাহলে ওই সমস্যা মাথা চাড়া দেবে না। দ্বিতীয়ত, সরকারি লালফিতের ব্যাপার। ওর জন্যে আমি আছি। তাই তোমাকে নিলে যারা টাকা ঢালবে তারা বিস্তর উপকৃত যেমন হবে তেমনি তোমারও ওপরে ওঠার দরজা একটার পর একটা খুলে যাবে।'

আমি উঠে পড়লাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় চললে?'

আমি কথা বলতে পারছিলাম না। ইশারায় ওঁকে অপেক্ষা করতে বলে প্রায় দৌড়ে পাশের টয়লেটে ঢুকে পরলাম। আলো জ্বলে বেসিনের ওপর ঝুঁকে পড়তেই হড়হড় করে বমি বেরিয়ে এল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাক খাচ্ছিল ওগুলো, এখন মুখে তেতো স্বাদ নিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। কল খুলে জল মুখে নিয়েও স্বস্তি ফিরছিল না। আজকাল এটা হচ্ছে। কেন হচ্ছে বুঝতে পারি না। যখন হয় তখন আচম্বিতেই হয়। মুখ মুছে ঘরে ফিরে আসতেই প্রশ্ন হল, 'কি হয়েছে?'

'বমি।'

'সেকি। কি খেয়েছিলে? বদহজম হয়েছে নাকি?'

'না। তার জন্যে নয়।'

'তাহলে?'

'আজকাল এমন হয়।'

'তাই নাকি। কালই হরেন ডাক্তারের কাছে যেও, লিভারে কিছু হল নাকি।'

'শরীর ঠিক আছে।'

'আজকাল এমন হয় বলছ আবার শরীর ঠিক আছে, সম্ভব নাকি?'

'বেশি কথা বললে বা শুনলে এমন হয়।'

'কথা বললে বা শুনলে বমি হয় আমি বাপের জন্মে শুনিনি।'

'কেননা ঘেন্না লাগে, গা গুলিয়ে ওঠে আর তারপরই বমি বেরিয়ে আসে। আমি চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারিনি।'

বাবার মুখ এবার শক্ত হয়ে গেল, 'আমার কোন কথা শুনে তোমার ঘেন্না হল? গা গুলিয়ে উঠল? উত্তর দাও।'

আমি লোকটার দিকে তাকালাম। এই লোকটা আমার বাবা। সেই পুরোন গল্পোটা তুলে যদি প্রশ্ন করি, 'উত্তরটা দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে প্রমাণ করুন আপনি আমার বাবা। তাহলে কি জবাব দেবেন?'

'তাকিয়ে আছ কেন? কি জিজ্ঞাসা করলাম শুনতে পাওনি?'

'পেয়েছি। কিন্তু আমার উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে করছে না? তুমি এত বড় উদ্ধত?'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি এবিষয়ে কথা বললে আবার বমি করে ফেলব।'

'ট্রেঞ্জ।' বাবার চোখমুখ দেখবার মত। হাতের গ্লাসের দিকে তাকালেন, 'এর গন্ধ সহ্য হচ্ছে না, এমন তো হতে পারে। তোমার মায়ের হত না।'

'মায়ের সব অভ্যেস আমি পাইনি।'

'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'আসলে, আপনার আলমারির সব বই আমি পড়েছি।'

'বই? কোন বই?'

আমি আলমারিটা দেখলাম। ওটা বই-এ ঠাসা। মার্কস সাহেব থেকে আরম্ভ করে অশোক মিত্র, বাবার সংগ্রহ চমৎকার। কোন কোন বই পড়ার সময় বুঝেছি আমার আগে কেউ তার পাতা উল্টে দ্যাখেনি। বাবা চোখ ছোট করলেন, 'তো?'

'ওগুলো পড়লে যে ধারণা তৈরি হয় তার সঙ্গে আপনাদের কাজের কোনও মিল নেই। অথচ ওগুলো থেকে কিছু শব্দ নিয়ে বাক্য তৈরি করে আপনারা এমন একটা বাতাবরণ তৈরি করেছেন যে—। আমার আর কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

'না। পালিয়ে যেতে দেব না তোমাকে। বল, কি বলতে চাও?'

'আপনি আমাকে পার্টি করতে বলছেন সুবিধে আদায় করার জন্য। আপনাদের দলের বেশিরভাগ নেতার ছেলে বেআইনি পথে টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে। বাবার ইনফ্লুয়েন্স আর সেই সুবাদে সঙ্গে মাস্তান রেখে চললে টাকা আপনি আসে। আর আপনার নেতার ছেলে পার্টি থেকে বহু দূরে থেকেও এদেশে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এমন কি তার কোম্পানিতে কেন লকআউট ক্লোজার হয় তা নিয়ে আপনাদের শ্রমিকদরদী নেতারা কোনও প্রশ্নও করে না। আপনি সেই ভুলটা করতে চান না বলে আমার ওপর পার্টির সাইনবোর্ডটা টাঙিয়ে রাখতে চান। আপনারা পার্টি করেন টাকা রোজগারের

www.boiRboi.blogspot.com

ধান্দায়। ওপরের তলার নব্বুইভাগ নেতার বেআইনি সম্পত্তি আছে। এই আপনি দু-দুটো বেআইনি ফ্ল্যাটের মালিক। ওইসব বই-এর লাইন আপনাদের দেখে এখন লজ্জা ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। আপনার উপদেশ শুনলে তাই আমার বমি আসে।'

'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। এক পয়সার মুরোদ নেই অথচ জ্ঞান দিচ্ছ আমাকে। শুয়োরের বাচ্চা।' চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'কয়েকজন, খুব অল্প কয়েকটা মানুষ দলে আছে যারা আদর্শে বিশ্বাস করে, মানুষের জন্যে কাজ করতে চায়। দলের অবস্থা দেখে তাদের কেউ কেউ মন্ত্রীত্ব থেকে বেরিয়ে এসেও শেষপর্যন্ত সামান্য কিছু করতে পারবে বলে আপোস করে। এরা আছে বলে এখনও আপনারা সর্বহারা গণতান্ত্রিক ইত্যাদির সাইনবোর্ডটা বহন করতে পারছেন। নইলে আপনাদের সঙ্গে আপনাদের বিরোধীদের কোনও পার্থক্য নেই।' বলতে বলতে আবার বমি পেয়ে গেল। আমি টয়লেটে ছুটলাম। শরীর হালকা হতেই মুখে জল দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখলাম। এই আমি, আমার নাম মা রেখেছিলেন বিপ্লব। মা কি বোকা ছিলেন!

এই পরিবারের কর্তা যদি বাবা তখন তার ছেলের নাম বিপ্লব? কানাছেলের নাম পদ্মলোচন এর চেয়ে কম হাস্যকর। মায়ের কেন এমন মতিভ্রম হল তা তিনিই জানেন।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, এইসময় হুঙ্কার উঠল, 'যাচ্ছ কোথায়? আগে কথা কমপ্লিট কর।'

'আমার কোন কথা নেই।'

'নেই?'

'হ্যাঁ। কারণ আপনি আমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলেছেন।'

'তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছ?'

'একদম নয়। বলে ভাল করেছেন।'

'ভাল করেছি?'

'হ্যাঁ প্রশ্নটা আমার মধ্যে পাক খাচ্ছিল। নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলাম আমি কেন শুয়োরের বাচ্চা হতে পারছি না। কেন আমার এসব দেখলে শুনলে বমি আসে! শুয়োরের বাচ্চাদের তো বমি পায় না। তারা ঘোঁত ঘোঁত করে কাদায় খাবার খোঁজে, কোন প্রতিবাদ করে না। মানুষের অবস্থা তো একই রকম। বাসে-ট্রামে ওঠার জায়গা নেই তবু ওঠে, আগে এক পয়সা ভাড়া বাড়ানোয় যার আগুন জ্বেলেছিল প্রতিবাদে তারাই এখন বিভিন্ন নাম দিয়ে সরকারি বাস বের করে তিনগুণ বেশি ভাড়া নিচ্ছে বেসরকারি বাসের চেয়ে অথচ কেউ প্রতিবাদ করে না। আলুর দাম মন্ত্রীর কৃপায় হু হু করে বেড়ে গেলেও মুখ বুঁজে লোকে কেনে। পাঁঠার মাংসের দাম একশ টাকা ছাড়িয়ে গেলে ভাবে তার নিজের মাংসে কি ওই দামে বিক্রি হবে? নিউ মার্কেটে শুয়োরের বাচ্চার মাংস বেশ দামী। অথচ মানুষের মাংস কলকাতায় বিক্রি হয় না। হলে তবু—! যাকগে আপনি আমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলে কিছুটা সম্মান দিলেন।'

'সম্মান দিলাম? তুমি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না ভেবেছে? যেহেতু তোমাকে শুয়োরের বাচ্চা রাগের মাথায় বলে ফেলেছি তাই বার বার বলে বোঝাতে

চাইছ আমি শুয়োর। স্কাউন্ড্রেল।' উনি সত্যি সত্যি ক্ষেপে গেলেন।

'আমি শুয়োরের বাচ্চা হলে আপনাকে শুয়োর ভাবব কেন?'

'যেহেতু আমি তোমার বাবা—!'

'এইটে গোলমেলে ব্যাপার।'

'তার মানে?' ওঁর চোয়াল আবার ঝুলে গেল।

'আচ্ছা, আপনাকে যদি বলা হয় প্রমাণ করুন, আপনি আমার বাবা তাহলে সেটা প্রমাণ করতে পারবেন? গোলমেলে ব্যাপার নয়?'

'আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি তোমার বাবা?'

'যদি বলা হয়! না, পারবেন না। দেখুন, আপনার চেহারার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। মা বলত আমি মামা বাড়ির ধাত পেয়েছি। আপনার স্বভাবের সঙ্গে আমার কোন সাদৃশ্য নেই। আপনি যা ভাবেন আমি তার উল্টো। আমাদের দেখলে পাবলিক কখনই বলবে না আমরা বাপ-ছেলে। মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে এসেছি। সেটা মা তো বটেই, ডাক্তার নার্স সাক্ষী হিসেবে আছে। অতএব আমি মায়ের ছেলে। এ নিয়ে কোন ডিসপুট নেই। কিন্তু কে বাবা তা মা বলে দেয় বলেই তিনি বাবা হন।'

'বাঃ। তোমার বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম আছে বাবা হিসেবে।'

'ওখানে আপনার বদলে মায়ের কোন বয়ফ্রেন্ডের নাম বললে ওরা সেটাই লিখত।'

'মায়ের বয় ফ্রেন্ড? জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব হতভাগা।'

'আপনি একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন আমি সত্যি বলছি।' আর দাঁড়ালাম না আমি। একটু ভাল লাগছিল গা গুলানো ভাবটা কমে যাচ্ছিল। নিজের ঘরে চলে এলাম। নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়াতেই ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগল। রাত বাড়লে বাতাসের চরিত্র খারাপ হয়? ওই ভদ্রলোক আমাকে ব্যবহার করতে চাইছেন। নিজে দুহাতে কামিয়ে চলছে না, আমাকে এন আর আইয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে মাল খেঁচতে চান। ওই ওঁর নেতার সম্পর্কে পাবলিক একই কথা বলে। ছেলেকে হরেকরকম কোম্পানি করে দিচ্ছেন ভদ্রলোক বিদেশিদের সঙ্গে কোলাবরেশনে, তার এক একটার নাভিশ্বাস অল্প কয়েক বছরেই উঠে যাচ্ছে। কিন্তু, লোকে বলে, ছেলে তার অর্জিত কালো টাকা সুইস ব্যাঙ্কে রেখে আসছে। আর তিনি বছরে দু বার এন আর আই খোঁজার নাম করে ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট চেক করে আসেন।

আজ আমার ঘুম আসছিল না। হঠাৎ চোখে পড়ল মহিলাটিকে। ঠিক উল্টোদিকের ফ্ল্যাট। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমি দেখতে পেয়েছি বুঝে হাত নেড়ে বললেন, 'ঘুম আসছে না?' আমি না বুঝে মাথা নাড়লাম। হ্যাঁ। তিনি গলা তুললেন, 'আমারও।'

আমি ঝটপট সরে এলাম। এরকম কেস জীবনে শুনিনি। ওই বাড়িটা নতুন হয়েছে। সবকটা ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেছে তৈরি হবার আগেই। ওই মহিলাকে কখনও দ্যাখিনি। ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে কি হাত নাড়ছেন? নাকি এদিকে অন্য কেউ আছে। আমি একতলায় আর উনি দোতলায়। তাকিয়ে আছেন এইদিকেই। অতএব আমি ওঁর লক্ষ্য। আমার ঘুম আসছে কি আসছেন না জেনে উনি কি করবেন? কি লাভ?

সরে এলাম জানলা থেকে।

www.boiRboi.blogspot.com

আজ আমার খুব ভাল লাগছে। যাঁকে বাবা বলি, জ্ঞান হবার পর থেকে বলে এসেছি বলেই বলি, তাঁকে কথাগুলো বলতে পেরে আনন্দ লাগছে। আচ্ছা, মানুষ কত সহজে আনন্দিত হয়, না? অথচ ওই ভদ্রলোকের আহ্নিকের আরাম আজ ঘুচলো। এখন উনি কি করতে পারেন? আমাকে, বড়জোর এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন, আমার মাসিক আয় এখন আটশো টাকা। দিব্যি চলে যায়। কলেজ স্ট্রিটের এক প্রকাশকের নতুন বই-এর প্রুফ দেখি আমি। এই হল বিপ্লবকুমারের বিপ্লব। আটশো টাকায় থাকা খাওয়া যায়?

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, অনেকেই ঘর অন্ধকার হলে চমৎকার ঘুমিয়ে পড়েন। আমার আবারা উল্টো। অন্ধকার আমার মনে হাজারটা সমস্যা প্রেশ করে। সেগুলো মুছতে রীতিমত লড়াই করতে হয়।

আজকাল কিছুতেই ভোরবেলায় আমার ঘুম ভাঙে না। ওদিকে রাত হয় বলেই হয়তো—। আজও সাড়ে আটটায় বিছানা ছাড়লাম। ব্রাশে পেস্ট নিয়ে কেন জানি না জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ পড়ল সামনের দোতলায়। কেউ নেই সেখানে। কিন্তু এদিকে বাড়ির সামনে ভিড় জমেছে। বাবার দর্শন পেতে আগ্রহীরা ইতিমধ্যেই জড়ো হয়ে গেছে। আচ্ছা, ভদ্রলোক কি গতরাত্রে ঘুমিয়েছিল? ওঁর মনে কি একবারও মায়ের চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ এসেছিল? আমার মায়ের চরিত্র কিরকম ছিল? মায়ের মুখ মনে পড়ল। সাধারণ আটপৌরে সহজ সরল বাঙালি মেয়ের মুখ। যাদের জীবনে স্বামীপুত্রকন্যা ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই, পরপুরুষের সঙ্গে দুরকথা, নিজের স্বামীর সঙ্গেই যাঁদের প্রেম করা হয় ওঠে না। হয়তো শারীরিক আনন্দও একটা অভ্যেসের মধ্যে সীমিত। আমার মায়ের চরিত্র এতই আটপৌরে যে ওই ভদ্রলোকের সন্দেহ লবণের লাড্ডু হয়ে যাবে এবং সেটা তাঁকেই গিলতে হবে। আচ্ছা, মা কেন বেঁচেছিলেন? যদি জন্ডিসে মারা না যেতেন তাহলে এতকাল কি কারণে বেঁচে থাকতেন? শুধু স্বামীর সঙ্গে সহবাসে পাওয়া সন্তানগুলিকে বড় করার জন্যে? দুবেলা রান্নাঘরে কাটিয়ে প্রত্যেকের মুখে আহার তুলে দেবার জন্য? একে তো একধরনের মানুষ সেবা বলে থাকেন। তা সেই সেবা করে জীবন ফুরিয়ে দিতে যারা উৎসাহ যোগান, মহীয়সী আখ্যা দেন, তাদের মত ক্রিমিন্যালদের গুলি করে মারা যায় না? আর এই সব নির্বোধ রমণীদের যাদের জ্ঞানচক্ষু ফোটালেও ফুটবে না, জন্মমাত্র কেন জন্ডিস হয় না? ম্যালিগন্যান্ট জন্ডিস!

পিতৃদেবের ঘরের গায়ে তাঁর নিজস্ব টয়লেট বাথরুম রয়েছে। কিন্তু আমাদের সবার জন্যে বাথরুম কমন। টয়লেট তার মধ্যেই। বাড়িটা যেহেতু পুরোন ধরনের তাই এই ব্যবস্থা। এখনও এ বাড়ির কল ঘরে চৌবাচ্চা আছে। চৌবাচ্চার বিলাসিতা দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাট বাড়িতে আজকাল ভাবা যায় না।

কলঘরের সামনে পৌঁছে দেখলাম ওটার দরজা বন্ধ। এই এক জ্বালা। একটু অপেক্ষা করে গলা তুললাম, 'ভেতরে কে? তাড়াতাড়ি কর।'

'দেরি হবে।' মেজভাই-এর গলা।

'কেন?'

'এইমাত্র ঢুকেছি। অফিস যেতে হবে।'

অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। নেই কেন? মনে পড়তেই দোতলায় উঠে এলাম। ভদ্রলোক ঘরে নেই। এখন তিনি নীচের দরবারে আসীন। ওর বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হলাম। এখানে আসা আমাদের অভ্যেস নেই, বোধহয় এক্তিয়ারেও। কিন্তু আজ মনে হল, কেন আসব না? এই বাথরুম টয়লেট তো বাড়ির বাইরে নয়।

সকালে এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট আমার বরাদ্দ। সকালে এর চেয়ে বেশি খেতেও ইচ্ছে করে না। এখন আমাদের রান্নাঘর ঠাকুর সামলায়। লোকটা রোজ ফুলে ফেঁপে উঠছে। কিন্তু কিছু করার নেই। কেন জানি না, ঠাকুর আমাকে একটু সমীহ করে চলে। চলুক।

সেজেগুজে পথে নামলাম। সাজগোজ বলতে জিনস আর টি শার্ট। পায়ে চপ্পল। দরজায় তালা দিয়ে দেখলাম তখনও দুতিনজন পাবলিক বাবার চামচাদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। মানুষের কতরকমের ধান্দা থাকে তা মানুষই জানে না।

রাস্তায় নামবার আগে দোতলায় নজর চলে গেল কোন কারণ ছাড়াই। তখন তাকে দেখতে পেলাম। কাল রাত্রের সেই মহিলা। বয়স কত হবে? আমারই বয়সী। কিন্তু কি আশ্চর্য, চোখাচোখি হতে চোখ সরিয়ে নিল। যেন আমাকে কখনও দ্যাখেনি। উদাস হয়ে তাকিয়ে রইল দূরের বাড়ির দিকে। অথচ গতরাত্রে ইনিই আমাকে হাত নেড়ে প্রশ্ন করেছিলেন। একেই হয়তো নকসা করা বলে। মেয়েদের পক্ষে এমনটা করাই সম্ভব। নিকুচি করেছে।

আমার হাসি পেল। হাঁটতে হাঁটতেই হাসলাম। আমাদের বাংলা ভাষায় চমৎকার কিছু শব্দ আছে। যেমন এই নিকুচি। আহা। কী শব্দ! যেমন, ন্যাকামি। কর অনুবাদ। পারবে না। কিন্তু ওই শব্দদুটো কত শত মানে কী স্বচ্ছন্দে বুঝিয়ে দেয়। মোড়ের মাথায় আসতেই হঠাৎ কানে শব্দগুলো ঢুকল। দুটো বছর বাইশের ছেলে কথা বলছে। ভারতীয় ক্রিকেট টিম কেন একের পর এক ম্যাচ হেরে যাচ্ছে তাই নিয়ে আলোচনা। কিন্তু প্রতি তিনটি শব্দের পর দু অক্ষরের পুরুষাঙ্গ অথবা চার অক্ষরের শব্দ অকাতরে ব্যবহার করে চলেছে জোর গলায়। রাস্তা দিয়ে ছেলেমেয়ে মহিলা বৃদ্ধরা যাচ্ছেন কিন্তু ওরা অসাড়। আর যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা ওসব শুনেও যেন শুনতে পাননি এমন ভান করছেন।

আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'এই যে ভাই, কাজটা কি ঠিক করছেন?'

ওরা হকচকিয়ে গেল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? অন্যায় কিছু করেছি?'

'আপনারা এতক্ষণ কী বলছিলেন?'

'ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করছি।'

'করছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অশ্লীল শব্দ বলছিলেন কেন?'

'অশ্লীল শব্দ? যাঃ বাঁআ। অশ্লীল শব্দ কখন বললাম?'

'এইমাত্র কি বললেন? আপনার লজ্জা করছে না, নিজেই জানেন না কি বললেন। আপনার মা-বোনেদের সামনে বসে ওই কথা যদি কেউ বলত আপনার ভাল লাগত?' আমি চিৎকার করে উঠতেই ভিড় জমে গেল। কয়েকজন আমাকে টানতে লাগল। একজন বলল, 'ছেড়ে দিন দাদা। এদের বাঁআ বলে কিছু লাভ হবে না।'

www.boiRboi.blogspot.com

আমি অসহায় চোখে লোকটির দিকে তাকালাম। তারপর হাঁটা শুরু করলাম। কানে এল, প্রথম ছেলেটি তখনও বিস্মিত গলায় বলে চলেছে, 'কী মাল মাইরি। আমাকে কেন টকরালো তাই বুঝতে পারিছ না এখনও।' আফসোস হচ্ছিল। আমি কাদের বোঝাতে যাচ্ছিলাম। জননীদেবী যত ভালবাস নিয়ে আমরা নাম বিপ্লব রাখুন না কেন আমার ক্ষমতা একটা মাথা নাড়া পুতুলের চেয়ে বেশি নয়। শরীর গুলিয়ে উঠছিল। ট্রাম রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যদি কোন অলৌকিক উপায়ে ক্ষমতা পেতাম তাহলে এইসব বঙ্গ যুবকদের জিভ কেটে ফেলতাম। হয়তো আশি শতাংশ যুবক বোবা হয়ে যেত কিন্তু তাতে কানের আরাম হত।

তারপরেই মনে হল, আমি অকারণ রেগে যাচ্ছি। এককালে শালা বলাটাও অশ্লীল ছিল, এখন তো নেই। তাহলে?

ট্রামে চেপে কলেজ স্ট্রিট যেতে কতক্ষণ। তারমধ্যেই চোখে পড়ল দুটো মধ্যবয়সী লোক টিকিট না নিয়ে এক টাকা কন্ডাক্টরের হাতে গুঁজে নেমে পড়ল। দু টাকা কুড়ির বদলে এক টাকা। কন্ডাক্টরের মুখের দিকে তাকালাম। একেবারে বুদ্ধদেবের মুখ। দাড়ি কদিন না কামানো সত্ত্বেও ওই মুখে পৃথিবীর কোন পাপ স্পর্শ করেনি।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম ভেতরের দিকে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এই যে দাদা, আপনাকে আট আনা দিলে বিনা টিকিটে যাওয়া যায় বুঝি!'

লোকটি আমার দিকে তাকাল না। নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

এক বৃদ্ধ বললেন, 'এই তো চলে আসছে ভাই। আজ তো নতুন দেখছি না। পঞ্চাশ সালেও এই কাণ্ড হত। এই করে করে বাস ট্রাম লোকসানে চলছে। যাও প্রাইভেট বাসে। অনেক কম ভাড়া, কই তাদের তো তবু লোকসান হয় না!'

আর একজন প্রৌঢ় খিঁচিয়ে উঠলেন, 'লোকসান কোথায় নেই বলুন তো? বড় বড় মন্ত্রীরা ঘুষ নিচ্ছে, হাওলাকেস, বোফর্স কেস-এ কত ট্রানজাকশন হয়েছে জানেন? তা এমনি এমনি হয়েছে নাকি? পাবলিককে ঠকিয়ে হয়েছে। দেশের এক নম্বর যদি ঘুষ নেয় তো এই বেচারারা কি দোষ করল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে আপনি ওকে সমর্থন করছেন?'

'আলবৎ করছি। কটাকা মাইনে পায়? ভাড়া বাড়িতে থেকে বাজার করে খেতে গেলে ওর এই মাইনেতে কদিন চলবে? অ্যাঁ! এই যে বাজারে দ্যাখেন, একশ টাকা মাংস, দেড়শো টাকা ইলিশ হু হু করে পাবলিকের ব্যাগে ঢুকে যাচ্ছে কোন রোজগারে? নিশ্চয়ই মাইনের টাকায় নয়। দেখছেন না, চারপাশের সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে অথচ লোকে প্রতিবাদ না করে দিব্যি ম্যানেজ করে যাচ্ছে। ও বেচারাকে একটাকা আট আনার জন্যে দোষ দিয়ে কি লাভ?'

কথাগুলো শোনামাত্র আমার গা-গুলানি ভাবটা উধাও হয়ে গেল। মনে হল ভদ্রলোকের প্রত্যেকটা কথাই সত্যি। বাড়তি রোজগার তো খেটেখুটে হয় না। আর বাড়তি রোজগার না করলে মানুষ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাঁচবে কি করে? এদেশে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমবন্টন, ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো চালু করা আর সোনার পাথরবাটি কিনে আনা যে একই ব্যাপার তা গণতান্ত্রিক দলের নেতারা বুঝে

গিয়েছেন বলেই তাঁরা আর ও পথে এগোচ্ছেন না। যে যা পারো লুটেপুটে খাও, বেঁচে থাকো কিন্তু খবরদার দলের শৃঙ্খলা ভেঙো না। ওটা ভাঙলেই তোমাকে দলবিরোধী কাজের জন্যে বহিষ্কার করা হবে।

কলেজ স্ট্রিটে নেমে বাবার কথা মনে এল। ওই লোকটির উপদেশ বাবার কাছে নিশ্চয়ই কথামৃত। শুনলে খুশি হতেন। আচ্ছা, এসব সত্য জানা সত্ত্বেও আমি মেনে নিতে পারি না কেন? কেন মনের ভেতর খচ্‌খচ্‌ করে? আহা, এই খচ্‌খচ্‌ শব্দটাও তো দারুণ।

প্রকাশনা সংস্থাটি বেশ বড়। এদেশে তো বটেই বাংলাদেশেও এদের বিশাল কারবার। আমি এখানে চাকরি করি না। চাকরি এঁরা আমাকে অফার করে নি। কিন্তু একটা টেবিল চেয়ার দিয়েছেন। প্রুফ এলে টেবিলে পাটিয়ে দেন। দু ঘণ্টা অন্তর চা খাওয়ান। এবং দুপুরে রুটি এবং আলুর দমের ব্যবস্থা থাকে। এতেই আমার চলে যায়।

টেবিলে বসামাত্র কেয়ারা প্রুফ দিয়ে গেল। আমার একপাশে চলন্তিকা এবং সংসদ। বাংলাভাষার প্রহরী। খুব জনপ্রিয় একজন উপন্যাসিকের উপন্যাস। বছরে চার পাঁচটা সংস্করণ চোখ বন্ধ করে বিক্রি হয়। অবশ্য এঁর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশেই বেশি। তিনলাইন পড়তেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। ভুল বানান যদি দীর্ঘদিন কেউ লেখে তাহলে তার লেখা ভুলে যাওয়া উচিত। উপন্যাসের শুরু হয়েছে এইভাবে। 'তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। দয়া করে তুমি আমাকে ভুল বুঝো না প্রিয়া।' উনিশশো ছিয়ানব্বইতে এই রকম লেখা যাঁরা লেখেন তারা কী আমি জানি কিন্তু যাঁরা পড়েন, পয়সা দিয়ে বই কিনে পড়েন তাঁরা কোন গ্রহের মানুষ? এছাড়া নায়ক ধুতি পরে বাড়ি থেকে বের হল এবং একটু বাদেই রাস্তায় জল জমা থাকায় প্যান্টের পা গোটাল। নায়িকার নাম প্রিয়া, পিয়া, তিয়া, এক এক পাতায় এক এক রকম। বাক্য মাঝে মাঝেই অসম্পূর্ণ! আমি টেবিল থেকে উঠলাম।

অফিস ঘরের ভেতর একটা কাচের ঘর। প্রকাশক মশাই সেখানে বসেন। রোগা ফর্সা, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শিক্ষিত এবং সুদর্শন। মাস কয়েক আগে ওঁর ঘরে ঢুকে বলেছিলাম, 'ভাল বাংলা বানান জানি, কাজ দেবেন?' তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'লেখার নেশা আছে নাকি?'

'না।'

'তাহলে বসো। কি নাম?'

কাজটা হয়ে গিয়েছিল। দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। উনি কিছু হিসেব করছিলেন। বিরক্ত হয়ে তাকালেন। বললাম, 'কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলব।'

'বল।'

'আপনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি করছেন।'

'আমি?' চমকে উঠলেন ভদ্রলোক, 'কি রকম?'

'স্বজন মুখোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসটা ছাপা হচ্ছে সেটা আপনি পড়েছেন?'

'না।'

'সেকি? আপনি না পড়ে বই ছাপছেন?'

উনি সোজা হয়ে বসলেন। কলম বন্ধ করলেন, 'পড়া উচিত বলে মনে করিনি।

www.boiRboi.blogspot.com

স্বজনবাবুর বই-এর স্টেডি সেল আছে।'

'ও। তাহলে কিছু বলার নেই। আপনার তো আরও অনেক প্রুফ রিডার আছে। তাদের কাউকে ওর প্রুফ দিলে আমার ভাল লাগবে।'

'কেন?'

'উনি লিখতে জানেন না। বাক্য অসংলগ্ন, অজস্র বানান ভুল। ভেতরে তথ্যের অসংলগ্নতা মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।'

'নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে এসে প্রুফ নিয়ে গেলাম। তিনি দেখলেন।

তারপর বললেন, 'মানুষ করে দাও।'

'মানে?'

'রিরাইট করে দাও।'

'অসম্ভব।'

'বাজে কথা বোল না। এ বই ছাপা হলে যখন বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হবে তখন তোমার উচিত সেই ক্ষতিটা যাতে না হয় তা দেখা।'

'আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন। রিরাইট হলে সমস্ত লেখাটাই নতুন করে লিখতে হবে। অথচ সেটা ওঁর নামে ছাপা হবে, টাকা উনিই পাবেন।'

'ও ব্যাপারে কথা বলছি।' টেলিফোন তুলে ডায়াল করলেন প্রকাশক, 'হ্যালো, স্বজনবাবু ভাল আছেন? হ্যাঁ, আগেরটা আবার এডিসন হয়েছে। কিন্তু স্বজনবাবু আমি যে মুশকিল পড়েছি। কি করি বলুন তো? হ্যাঁ। একজন সাংবাদিক এসেছেন আমার পাণ্ডুলিপি দেখতে। উনি ফটোকপি ছাপবেন কাগজে, মানে আপনার ওপর কভারেজ করবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা কিন্তু মুশকিলটা এখানেই। কেন? আপনার হয়তো সময় কম ছিল তাই প্রতি পাতায় অন্তত কুড়িটা বানান ভুল, সেন্টেন্সে গোলমাল। এগুলোর ছবি ছাপা হলে কি হবে ভেবেছেন? আমি বলি কি আপনি যদি নতুন করে—! হ্যাঁ, সময় কম তা আমি জানি। আচ্ছা, এককাজ করলে হয়। আমার পরিচিত একটি ছেলেকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিই? হ্যাঁ, খুব ভাল বানন জানে। না না কেউ জানবে না। তবে বিনা পয়সায় তো করবে না। ধরুন—আপনার প্রাপ্য থেকে তিনচার পার্সেন্ট ওকে দিয়ে দিলে সম্মানটাও থাকে আপনার নামও বেড়ে যাবে। না দুচারশো দিলে ও রাজি হবে না, তাছাড়া খবরটা তো চেপে রাখার ব্যাপার আছে, এটা বুঝছেন না কেন? ঠিক আছে তো? ও কে!'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'যাও।'

'উনি রাজি হলেন?'

'হয়েছেন। তুমি প্রুফেই কারকেশন করতে করতে যাও।'

'আমি অন্যের হয়ে লিখব?'

'আপত্তি কেন? তুমি সন্তোষকুমার ঘোষের নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ। শ্রীচরণেষু মাকে-র লেখক।'

'উনি একজন বিখ্যাত সাংবাদিকের নামে রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখেছিলেন। সেই বইতে কোথাও ওঁর নাম ছাপা ছিল না। তুমি ভেবে নাও, বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়ে দিচ্ছ।

আরে, আমি না ছাপি আর একজন কৃতার্থ হয়ে ওই বই ছাপবে। বুঝেছ?'

টেবিলে ফিরে এসে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে আরম্ভ করলাম। কি করব বুঝতে পারছি না। একটা মন বলছিল, এ অন্যায়, খুব অন্যায়। আর এক মন বলছিল, এটা শ্রাদ্ধের মত কাজ। করা উচিত। এই বই ছাপা হলে অন্তত ষাট টাকা দাম হবে। যারা খেয়ে না খেয়ে বই কেনে তাদের উপকার করা হবে।

প্রথমে পুরো উপন্যাসটি পড়ে ফেললাম। সেই ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। কোন সময়ের গল্প, নায়ক নায়িকা কি করে এসব নিয়ে লেখক মাথা ঘামায়নি। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। এই লেখক গল্পো বলতে জানেন। যত খারাপ লাগুক আমাকে শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে তো ছাড়ল। প্রচণ্ড গতি। বাবার আলমারিতে একটা উটকো বই পেয়েছিলাম। ওই রাজনৈতিক মতবাদ বোঝাই বইগুলোর পেছনে সেটা পড়েছিল। মোহন সিরিজের বই। মোহন সিরিজের নাম আমি কলেজে পড়তে শুনেছি। বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসের ইতিহাস বলতে হলে ওই মোহন সিরিজের কথা সমালোচকরা একটু আধটু বলে থাকেন। তা আগ্রহী হয়ে বইটি পড়লাম। ওই সিরিজ নাকি একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। ওই লেখকের লেখায় গতি ছিল। যখনই কোন সমস্যার সামনে নায়ক দিশাহারা তখন লেখক সমাধান করতেন এই বলে, কোথা হইতে কি করিয়া কি হইয়া গেল মোহন জানে না কিন্তু—। বাঙালি পাঠককুল পড়ার সময় এই গোঁজামিল মেনে নিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে স্বজনবাবু বাজার করে খাচ্ছেন।

একবার মনে হল অত ঝামেলার দরকার কি? আমার কাজ প্রুফ দেখা। বানান ঠিক করে দেওয়া প্যারাগ্রাফ সাজিয়ে দেওয়া আর কোন বাক্যে গোলমাল থাকলে ঠিক করা। তাই করি। আমি শুরু করলাম। দুপুরে আলুর দম দিয়ে রুটি সবে শেষ করেছি এমন সময় স্বজনবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা প্রকাশকের কাচের ঘরে চলে গেলেন তিনি। ভদ্রলোকের পরনে পাম্প শু, ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি। এই রকম পোশাকে লেখক আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

আমি আবার কাজ শুরু করতেই উনি বেরিয়ে এসে আমাদের ম্যানেজারকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। ম্যানেজার আমাকে দেখিয়ে দিতে একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসলেন, 'কি নাম ভাই?'

নিজের নাম বলতে খারাপ লাগল। বললাম, 'বলুন।'

'ইয়ে, হয়েছে কি, এই লেখাটা খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে লিখেছি। যদি ভুল ভাল কিছু হয়ে থাকে তাহলে ঠিকঠাক করে দেবেন ভাই।' স্বজনবাবু বললেন।

'আপনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভুল কোট করেছেন।'

'অ। ওটা অবশ্য অনেকেই করে। মানে, দেখবেন, কিছু লোক গল্প করার সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলল কিন্তু সব শব্দ ঠিক বলল না। আমি ওই বাস্তবচিত্রটা ধরতে চেয়েছি। ঠিকঠাক করে দিন। কিন্তু ভাই, কথাটা পাঁচ কান করবেন না।'

লোকটার গলার স্বর এমন যে আমার মজা করতে ইচ্ছে করল। প্রকাশকের ঘর দেখিয়ে বললাম, 'কিন্তু উনি আমাকে বলেছেন পুরো উপন্যাসটাকে রিরাইট করতে।'

'বলেছেন?'

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ।'

'বেশ করুন। গল্পটা ঠিক রাখবেন। আর স্পিড। স্পিডটা নষ্ট করবেন না। আমার এ্যাসেট হল ওটা। ওটা যেন নষ্ট না হয়।'

'দেখছি।'

'আপনি গল্পো লেখেন?'

'না।'

'বাঁচা গেল। যারা গল্পো লেখে তারা তাদের মত লিখবে। তাদের নিজেদের লেখা যখন পাবলিক পড়ে না তখন আমার হয়ে লিখলে তার হালও ওই একই রকম হবে। তা আপনি যখন লেখালেখি করেন না তখন ভরসা পাওয়া গেল। আজ সন্ধ্যেবেলায় কি করছেন?'

'কেন?'

'আসুন না। একটু খাওয়াদাওয়া যাবে।'

'কোথায় যেতে হবে?'

একটা কাগজ টেনে ফসফস করে ঠিকানা লিখলেন স্বজনবাবু। সেটা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'চলে আসুন। ওখানে গল্প পাবো। আপনি আমাকে সাহায্য করলে আর দেখতে হবে না।' একটা চোখ কুঁচকে উঠে গেলেন ভদ্রলোক।

আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। সাহিত্য কি সহকারিকে সঙ্গে নিয়ে করা যায়? বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র মাথায় থাকুন, বিভূতিভূষণ তারাশংকর এমন প্রস্তাব শুনলে কি আত্মহত্যা করতেন না? নাকি যুগ পাল্টেছে, এ্যাপ্রোচও। এখন কম্প্যুটারের যুগ। পাঠক যা চান তাই লেখক উগরে যদি না দেন তাহলে বাজার শেষ হয়ে যাবে। এমন কত লেখক তো লেখেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দূরে থাক, দেশ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় কত নতুন লেখকের গল্প, সদ্য পরিচিত লেখকের ধারাবাহিক উপন্যাস। অথচ সেগুলো সম্পর্কে পাঠক মোটেই উৎসাহী নয়। অথচ স্বজনবাবুদের উপন্যাস বাজারে বেরুলেই এডিসন হয়ে যায়। বইমেলায় লোকে অটোগ্রাফ নেবে বলে কেনে। এইসব লোক তো বুদ্ধু নয়। স্বজনবাবুর উপন্যাস না কিনে ছয়শো গ্রাম মাংস কিনলে রবিবারের দুপুরে ভাতের স্বাদ আরও চমৎকার হত। কিন্তু তাতো করছে না। আমার কাছে ধন্দ এখানেই।

কয়েকদিন আগে একটি ছেলে ভুল করে অফিসে ঢুকে পড়েছিল। আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, স্বজন মুখোপাধ্যায়ের 'দুপুর ঠাকুরপো' বইটা আছে? আমি কিনতে চাই।' অবাক হয়ে তাকালাম। বড়জোর বছর কুড়ি বয়স। দুপুর ঠাকুরপো যে কোন উপন্যাসের নাম হয় তা আমি ভাবতে পারি না।

ম্যানেজার শুনছিলেন, বললেন, 'আমাদের সেলস কাউন্টারে যান ভাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দাম?'

'আশি টাকা।' ম্যানেজার বলার আগেই ছেলেটি জানাল।

বুঝি খুব উপন্যাস পড়েন?'

'স্বজন মুখার্জীর লেখা?'

'না। সমরেশ বসুর উপন্যাস।'

'নাঃ। ওসব পুরোন লেখা পড়া হয়নি। আচ্ছা চলি।'

কথাটা মনে পড়তেই আমার খুব রাগ হল। যে লোকটা সমরেশ বসুর পায়ের নখের যোগ্য নয় তার বই আমাকে রিরাইট করতে হবে কেন? শুধু টাকার জন্যে? কোন দরকার নেই। ঠিক করলাম, প্রুফ দেখে দায় শেষ করব। রিরাইট করা আমার দ্বারা হবে না। প্রকাশক যাই মনে করুন, আমি নাচার।

পাঁচটা নাগাদ আমি বের হলাম। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি এখন কোথায় যাওয় যায়? কফি হাউসে অবশ্য যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি লাভ? সেই টেবিল বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরনিন্দা পরচর্চা করা কাঁহাতক ভাল লাগে। কফিহাউস এক আজব জায়গা। যদি কেউ বলে গত দশ কি কুড়ি বছর ধরে নিয়মিত কফিহাউসে আসছে তাহলে চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় লোকটির জীবন চোরাবালিতে আটকে গিয়েছে। সাফল্য পেলে কেউ আর অনর্থক সময় নষ্ট করার জন্যে কফিহাউসে আসে না।

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছে?'

পেছন ফিরে তাকালাম। প্রকাশক বেরিয়ে এসেছেন।

'ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়!'

'যাওয়ার কোন জায়গা নেই বুঝি?'

'তা না—!'

'আমার সঙ্গে চল।'

'কোথায়?'

'রবীন্দ্রসদনে। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রোগ্রাম আছে।'

'রবীন্দ্রনাথের গান?'

'ওহো, জানো না। আমরা যাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতাম এখনকার ছেলেমেয়েরা তাকেই রবীন্দ্রনাথের গান বলে। চল।'

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার ওপর এমন সদয় হচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না। এই কয় মাসে তিনি প্রয়োজন ছাড়া একটা কথা বলেননি। মাঝে মাঝে মনে হত উনি আমাকে চেনেনই না।

রবীন্দ্রসদনের পেছনে বাড়ি পার্ক করতেই কানে এল কেউ গান গাইছে। সুন্দর, উদাত্ত গলা মাইকে ভেসে আসছে না। উদাসী হাওয়ায় পথে পথে—। গাড়ি থেকে নামতেই লোকটাকে দেখতে পেলাম। মুখে দাড়ি, হাতে ব্যাগ। গান গাইতে গাইতে হনহন করে হাঁটছে। একবার গেটের কাছে চলে যাচ্ছে, আর একবার পার্কিং লটের কাছে ফিরে আসছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গানটা শেষ হতেই আর একটা ধরল। প্রকাশক বললেন, 'বাঃ, গাইছে বেশ ভাল কিন্তু পাগল নাকি?'

সদনের সদরদরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু লোকটি আমাকে আচ্ছন্ন করল। যে ভঙ্গিতে ও গান গাইছে তা একমাত্র নিজের জন্যেই গাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্য কেউ সেটা শুনছে কিনা তা নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। এই মুহূর্তে ও নিজেই নিজের রাজা।

www.boiRboi.blogspot.com

এমন সুখ কজন মানুষ পেতে পারে। নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে ওর কোন দায় নেই।

রবীন্দ্রসদনের চাতালে মোটামুটি ভিড়। মেয়েরা সব সেজেগুজে এসেছে। আমি লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথ হলেই কলকাতার কিছু মহিলা অফ হোয়াইট শাড়ি পরেন, চুলে সাদা ফুল। তখন তাঁদের তাকানো হাঁটাচলা সম্পূর্ণ বদলে যায়। ঠিক আশ্রমবালিকা যাকে বলে তা নয় কিন্তু নিজেকে শুদ্ধ দেখাবার চেষ্টা প্রকট থাকে। প্রকাশকের আসন প্রথম সারিতে। তার পাশে আমাকে বসালেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'বুঝলে, হে, আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আসছি সায়গলের আমল থেকে। হ্যাঁ।'

সায়গল? যদ্দুর জানি পঞ্চাশ সালের অনেক আগেই ভদ্রলোক গত হয়েছেন। আমার এই প্রকাশকের বয়স কিছুতেই পঞ্চান্নর বেশি নয়। পঞ্চাশ সালে ওঁর বয়স ছিল বড় জোর উনিশ। ওই বয়সে কেউ—। তাই বা বলি কেন? শুনেছি উনি ওপার বাংলার লোক। কুড়ি বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসেছিলেন। তাহলে সায়গলের গান শুনলেন কখন? আমি চাপা গলায় বললাম, 'আপনি গুল মারছেন।'

'কি? কি বললে?'

'আপনি শুনতে পেয়েছেন। গুল যারা মারে তাদের কান খুব শার্প হয়।'

'অ। আমি গুল মারছি?'

'এই তো শুনেছেন।'

'তুমি তোমার বস্-এর সঙ্গে ওইভাবে কথা বলবে?'

'দেখুন, আমি যদি বলতাম আপনি মিথ্যে কথা বলছেন তাহলে আপনি খুব রাগ করতেন। কিন্তু গুল মারছেন বললে আপনার একটু কাটলো কিন্তু রক্ত পড়ল না।'

'বাঃ। তুমি দেখছি বেশ বুদ্ধিমান। গুড।'

'আমার বাবা এটা মনে করেন না, আপনি করলেন।'

'উনি তাহলে তোমার সঙ্গে মেশেননি। যাকগে, স্বজনের উপন্যাসটায় হাত দিয়েছ।'

'হাত। ওটা ঠিক করতে গেলে দশটা হাত লাগবে। মা দুর্গাকে ডেকে আনুন।'

'ওসব বললে তো চলবে না। পাবলিক যা খায় তাই লিখছে স্বজন।'

'আমি বানান আর সেনটেন্স দেখে দিচ্ছি।'

'কি? রিরাইট করছ না?' প্রকাশক হতভম্ব।

'না। বিবেকে লাগছে।'

'এই কথা বলার জন্যে আমি তোমাকে স্যাক করতে পারি, তা জানো?'

'করে দিন। আমি তাহলে বেঁচে যাই।'

'এ্যাঁ। তার মানে?'

'একটি কুৎসিত পরিশ্রম করতে হয় না তাহলে।'

প্রেক্ষাগৃহ তখন প্রায় ভরে গেছে। অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে মিনিট দশেক দেরি আছে। আমি ভেবেছিলাম, এখনই আমাকে ওখান থেকে উঠে যেতে হবে। কিন্তু প্রকাশক মুখ খোলার আগেই একনজন সুন্দরী মহিলা এগিয়ে এলেন। অফ হোয়াইট সিল্কের শাড়ি, মিলিয়ে ব্লাউজ, কপালে চন্দনের টিপ। মহিলা প্রকাশককে বললেন, 'ও মা, কখন এসেছ!

আমি ভাবতে পারছি না। কি ভাল লাগছে!'

প্রকাশক জোর করেই বোধহয় হাসলেন, 'তোরা কেমন আছিস?'

'আমি ভাল। শুধু মায়ের বাতের ব্যথা আবার বেড়েছে। শোন মামা, আমি তোমার অফিসে যাব। আমার কয়েকটা রেফারেন্স বই-এর দরকার আছে। তোমাকে হেল্প করতে হবে।'

'এম এ করেছিস অনেকদিন! এখন ওসব বই-এর কি দরকার।'

'ওটা তুমি বুঝবে না।'

হঠাৎ মহিলা আমার দিকে তাকালেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আপনি কি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি সাবজেক্ট ছিল?'

'বাংলা।'

'এই, তুমি বিপ্লব। না?'

'হ্যাঁ।'

'আমায় চিনতে পারছ না? আমি সুভদ্রা।'

সুভদ্রা? আমি মনে করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন বিশ্বাসঘাতকতা করল। সুভদ্রা নামের কোন মেয়ের কথা মনে পড়ল না।

'কি, মনে পড়ছে না?'

'না। আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

'আমরা তিনবন্ধু সবসময় একসঙ্গে ঘুরতাম, একই শাড়ি পড়ে ক্লাশে যেতাম। তাই ছেলেরা আমাদের নাম দিয়েছিল ত্রিধারা। মনে পড়ছে?'

এবার আবছা মনে এল। তিন বন্ধু, খুব হাসত। অন্য মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারলে ওই তিনজনে কখনই ছেলেদের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু তিনজনকে একসঙ্গে মনে পড়েছে, আলাদা করে একে নয়। আমি মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ, বাকি দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তো?'

'চিঠিতে। মঞ্জুলা এখন আমেরিকায়। ওর স্বামী ওখানে ডাক্তারি করে। রত্না দিল্লিতে। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কি করছ তুমি?' সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করল।

'আপাতত তোমার মামার পাবলিকেশনে গিয়ে প্রুফ দেখি।'

'সেকি? অন্য কিছু—!'

প্রকাশক এবার কথা বললেন, 'তোরা এবার মুখ বন্ধ করবি? এখনই পর্দা উঠবে। এই, তুই তোর সিটে চলে যা। ইনটারভ্যালে আসিস।'

সুভদ্রা গম্ভীর মুখে চলে গেলে। আমার অত সামান্য কাজ করা বোধহয় ওকে খুব বিভ্রান্ত করেছে। হ্যাঁ, এম. এ. পাশ করে একজন মাত্র আটশো টাকার বিনিময়ে বানান ঠিক করে দেয়, অন্য কোন এ্যাম্বিশন নেই, এটা কারও ভাল লাগার কথা নয়।

পর্দা ওঠার আগে প্রকাশক বললেন, 'তুমি এম এ পাশ করে পড়ানোর দিকে গেলে না কেন?'

www.boiRboi.blogspot.com

'আমার জন্যে চাকরি নিয়ে কেউ বসে নেই, তাই।'

'তুমি বড্ড বেঁকা বেঁকা কথা বল তো হে!'

'আপনার কান এসব শুনতে অভ্যস্ত নয়, তাই বেঁকা বলে মনে হচ্ছে।'

পর্দা উঠল। ঘোষক খুব ইনিয়ে বিনিয়ে সাধ এবং সাধ্যের গল্প শোনালেন। একেবারে প্রথম একজন মধ্যবয়সী মহিলা এলেন উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—! ইনিয়ে বিনিয়ে দুলে দুলে গান লোক চুপচাপ শুনেছিল। তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত সহযোগে নৃত্য। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচ, একথা ঘোষক বললেন না। আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে, মঞ্চের ওপাশ থেকে গান ভেসে এল আর বছর তিরিশের এক মহিলা চকচকে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটে এলেন মঞ্চে। গানের কথার রূপ দিলেন হাত পা চোখের ভঙ্গিমায়। দোলাও দোলাও-এর সঙ্গে যেভাবে হাত নাড়লেন তা শিশুকে ঘুম পাড়াবার সময় মায়েরা ওইভাবে হাতে তুলে দোলায়। কিছুক্ষণ দেখার পর অসহ্য মনে হল আমার কাছে। এইসব বুড়োধাড়ি মেয়েকে ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলা উচিত, 'তোমার বয়স কত মা? পাঁচ বছরের বাচ্চা যা করে তা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু তোমাকে কি মানায়?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। প্রকাশক চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একি? কোথায় যাচ্ছ?'

'এসব দেখলে আমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।' ওঁকে কোন কথা বলার সুযোগ না নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে এলাম। হলের বাইরে এসে মনে হল, আহা, কী আরাম।

আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলায় না জন্মাতেন, বাংলাভাষায় না লিখতেন তাহলে বাঙালি কি নিয়ে থাকতো। এইসব ধ্যাস্টামো কিভাবে করত? নজরুল যা লিখেছেন তা নিয়ে এইসব ইয়ার্কি করা যায় না। মধুসূদন বড্ড সিরিয়াস এবং এই লাইনে তাঁকে ফেলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে আমোদিত হতে সাহায্য করলেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, উনি তো বাঙালিকে অনেক দিয়েছেন, একটা আধশোয়া জাতিকে টেনে তুলে ছুটতে সাহায্য করেছেন, কিন্তু কী দরকার ছিল ওঁর নৃত্যনাট্য লেখার? রোগা রোগা বাবড়ি চুল রাখা ধেড়ে ধেড়ে ছেলেগুলো ওইসব নৃত্যনাট্যে শরীর দোলায়, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছের সময় আঙুলের মুদ্রায় কাকে তারা ডাকে তারা নিজেরাই জানে না। যে আবেগ কবির কলমে ছিল তা এইসব নাচিয়েদের কল্যাণে উধাও।

বাসস্টপে দাঁড়ালাম। রবীন্দ্রসদনের সামনে বাসস্টপটায় এই সময়েই বেশ ভিড়। হঠাৎ নজরে এল একটি অল্পবয়সী মেয়ে বিরক্ত হয়ে সরে আসছে আমার দিকে। তার ঠিক পাশেই মধ্যবয়সী একটি লোক যার হাতে গাড়ির চাবি। লোকটা চাবিটা দেখানোর ভঙ্গি করে নাড়ছে। মাথাটা গরম হয়ে গেল। সোজা মেয়েটির পাশে গিয়ে বললাম, 'দাঁড়ান ভাই।' এবার লোকটাকে ডাকলাম, 'এই যে, এদিকে আসুন।'

লোকটা একটু হকচকিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল আমার মতলব কি।

বললাম, 'আপনার গাড়িটা কোথায়? এখানে নিয়ে আসুন। আপনার বাড়িতে আমরা যাব।'

মেয়েটি আঁতকে উঠল, 'আমি কেন যাব? আমি কোথাও যাব না।'

বললাম, 'আপনি ভয় পাবেন না। ওর গাড়িতে চড়ে আমরা বাড়িতে গিয়ে

আত্মীয়স্বজনদের বলে আসব উনি বাসস্টপে মেয়ে দেখলেই গাড়ির চাবি দেখান। যান, নিয়ে আসুন গাড়ি।'

হঠাৎ লোকটা উদাসী হয়ে গেল। যেন পৃথিবীতে কোন সমস্যা নেই এমন ভঙ্গি করে হেঁটে যেতে লাগল আকাদেমির দিকে। একবারও ফিরে তাকাল না।

বললাম, 'এবার যান। আর ও আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

মেয়েটি সেই যাওয়া দেখে বলল, 'আমার খুব ভয় করছে।'

'কেন? কি বলেছে ও আপনাকে?'

'কিছু বলেনি। শুধু গাড়ির চাবি দেখিয়ে বলছিল, সঙ্গে গাড়ি আছে।'

'ঠিক আছে। বাসে উঠুন।'

তখনই একটা বাস এসে দাঁড়াল। মেয়েটি ভীতচোখে বলল, 'এই বাস।'

'বেশ। উঠুন। আমি না হয় একটু এগিয়ে দিচ্ছি।'

মেয়েটি ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল। আমি পাদানিতে। এইভাবেই যাওয়া আসা করতে হবে তা কলকাতার মানুষ মেনে নিয়েছে অনেককাল। গোটা পাঁচেক স্টপ চলে যাওয়ার পর মনে হল এখন তো মেয়েটার কোন ভয় নেই। ভাড়া দিয়ে টিকিট নিয়ে নেমে পড়লাম।

নামবার পর দেখলাম আমি এখন ভবানীপুরে। আমাকে ফিরতে হবে উল্টোদিকে। সময় নিয়ে ভাবি না, কিছু বাড়তি পয়সা খরচ হল। কয়েক পা হাঁটতেই আমার পা স্থির হল। উল্টো দিকের গলিতে ঢুকে তিন নম্বর বাড়িটা আমাকে টানতে লাগল। এটা কি রকম হল? এখানে আসার কোন কথা ছিল না। একেই কি কাকতালীয় ব্যাপার বলে? বছর খানেক আগে শেষবার আমি ওই বাড়িতে গিয়েছি। সেদিন হেনা বলেছিল, 'বিপ্লব, তুমি আর এখানে এসো না। আমি তোমাকে টলারেট করতে পারছি না। তোমার সঙ্গ আর পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

সেই শেষ। এই একবছর কোন যোগাযোগ নেই, না দেখা, না ফোন।

আজ টানটাকে এড়াতে পারলাম না। গলিতে ঢুকলাম। তিন নম্বর বাড়িটা পাঁচতলা। লিফট আছে। হেনা থাকে তিনতলায়। লিফট থেকে নেমে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলাম। এক বছরে মানুষ কি একই রকম থাকে? হেনা কি একটু পাল্টায়নি। তারপরেই মনে হল, আমি কি পাল্টেছি?

উত্তরটা স্পষ্ট। না, পাল্টাইনি, একবছর আগে যা ভাবতাম তা বাতিল করার কোন কারণ ঘটেনি যখন তখন পাল্টাবো কেন? আমি যদি না পাল্টাই তাহলে হেনারও তো একই অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক। অতএব আসার উচিত নয় ওকে বিরক্ত করা। আমি ফিরলাম। লিফটের বোতাম টিপলাম নেমে যাওয়ার জন্যে। একটু পরেই লিফট উঠে আসার আওয়াজ হল। লিফট উঠে আসছে। হেনা বা তার মা দেখতে পাওয়ার আগেই আমি নীচে নেমে যেতে চাই।

লিফট থামল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল হেনা এবং তার পেছনে এক ছিমছাম যুবক। আমি চমকে গিয়েছিলাম। মুখ ফিরিয়ে নিতেই শুনলাম প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে হেনা বলছে; 'আরে তুমি? কখন এলে? চলে যাচ্ছ যে। এসো এসো।' প্রায় দৌড়ে এসে হেনা আমার

www.boiRboi.blogspot.com

হাত ধরল। এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। এই গলায় হেনা কখনও আমার সঙ্গে কথা বলেনি। আর এখন, শেষ কথা হয়ে যাওয়ার পর, এভাবে বলছে ভাবা যায় না।

আমি বললাম, 'না, থাক, মনে হচ্ছে তুমি এখন ব্যস্ত থাকবে!'

'ব্যস্ত? তুমি কি বলছ? এসো, কাম অরিত্র। হেনা এগিয়ে গিয়ে বেল টিপল। তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'অরিত্র মিট মাই ফ্রেন্ড, বিপ্লব, আমার অনেক দিনের বন্ধু।'

অরিত্র মাথা নাড়ল, 'নমস্কার।'

লোকটা নমস্কার বলল, কিন্তু হাত তুলল না। এখন মনে হল, তুলতে যে হবেই তার কোন মানে নেই। মুখে বললেই তো মানে বোঝানো হল। দরজা খুলল যে কাজের মেয়েটি তাকে আমি চিনি না। অন্তত গত এক বছরে প্রথম পরিবর্তন নজরে এল। প্রথম বলা ঠিক হল না, দ্বিতীয়, প্রথম পরিবর্তন তো হেনার বলা একটু আগের কথাগুলো। যে ভঙ্গিতে ও কখনও কথা বলেনি তা আজ বলল।

'তোমরা একটু বসো, প্লিজ।' হেনা সোফা দেখিয়ে ভেতরে চলে গেল।

আমরা বসলাম। বসা মাত্র অরিত্রকে দেখলাম একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পাতা খুলতে। অর্থাৎ ও এখন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। আচ্ছা, এই লোকটা কে? হেনার সঙ্গে ওর কি ধরনের সম্পর্ক? যে ভঙ্গি নিয়ে ঘরে ঢুকল তাতে খুব অন্তরঙ্গ বলে মনে হচ্ছে না। এ কি অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে? হঠাৎ বুকের ভেতর অস্বস্তি এল। সেটা মুহূর্তের জন্যে। তারপরই ভাবলাম, এ নিয়ে আমি ভাবছি কেন? হেনা এখন স্বাধীন। কারও কাছে কোনও অবলিগেশন নেই। যা ইচ্ছে তাই ও করতে পারে।

হেনা ফিরে এল, 'কি খাবে বল? চা কফি না ঠাণ্ডা?

অরিত্র কাঁধ নাচাল। আমি বললাম, 'কিছু না।'

'এখনও রাগ পড়েনি?'

'মানে?'

'তুমি না একটা যাচ্ছে তাই।' হাসল হেনা, 'জানো অরিত্র, বিপ্লব বড় অভিমানী। কদিন আগে ওর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করেছি, বাবুর রাগ হয়ে গেল।'

অরিত্র ম্যাগাজিন রেখে আমায় দেখল তারপর হেনাকে।

হেনা হাসল, 'আমরা খুব পুরোন বন্ধু। আমরা পরস্পরকে খুব ভাল বুঝতে পারি।'

'ও।'

'বিপ্লব, অরিত্র খুব আপ রাইজিং। আমার সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। আমার এক অফিস কলিগ ওর বন্ধু, সেই সুবাদে।'

হঠাৎ অরিত্র ঘড়ি দেখল, 'মাই গড।' সে উঠে দাঁড়াল।

হেনা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমার জন্যে ক্যালকাটা ক্লাবে একজন অপেক্ষা করছে। আমি খুবই দুঃখিত, আমাকে এখনই চলে যেতে হচ্ছে।' সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

হেনা বলল, 'কিন্তু—!'

অরিত্র কাঁধ নাচিয়ে দরজার দিকে এগোলো। হেনা চটপট ওর পেছনে ছুটল।

অরিত্রকে দরজা খুলে দিয়ে সে বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কাজ থাকলে তো কিছু করার নেই!'

অরিত্র মাথা নেড়ে বেরিয়ে যেতেই সে দরজাটা বন্ধ করল।

ফিরে যখন এল তখন আমি অন্য হেনাকে দেখলাম, মুখের একটা উপশিরাও নড়ছে না, স্থির পায়ে আমার উল্টোদিকের সোফার পাশে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

আমি কিছুই বুঝতে পারিছ না। তোমার সঙ্গে একবছর দেখা হয়নি অথচ তুমি ভদ্রলোককে বললে কদিন আগে আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করেছ। কি ব্যাপার?'

'ওটা না বললে অরিত্র এখান থেকে এখন চলে যেত না। ও যখন আজ আমার কাঁধে চেপেছিল তখন ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করে ওকে কাটাবো। আজকের সন্ধ্যেটা ওর প্রেম প্রস্তাব শুনে নষ্ট করতে হবে বলে খারাপ লাগছিল। তা হঠাৎ তোমাকে দেখে মনে হল বেঁচে গেলাম। আমার কথা শুনে তুমি প্রতিবাদ করোনি সেটা ইনডাইরেক্টলি আমাকে হেল্প করেছে, তাই তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি কি বিশেষ কোন কারণে এখানে এসেছিলে?' হেনা তখনও বসছিল না।

'না।'

'তাহলে?'

'হঠাৎ এ পাড়ায় চলে আসি। আসার পর মনে হল অনেকদিন দেখা হয়নি।'

'হঠাৎ এ পাড়ায় চলে আসি মানে? প্ল্যান না করে কেউ আসে নাকি? এরকম সিলি যুক্তি দেবার বয়স তুমি দশ বছর আগে পেরিয়ে এসেছ বিপ্লব। তাছাড়া অনেককাল দেখা হয়নি মানে এই নয় দেখা কার জন্যে ছটফট করতে হবে। তোমার সঙ্গে আমার শেষবার যে কথা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই মনে আছে। যাকগে, আজকে তুমি আমাকে ইনডাইরেক্টলি সাহায্যে করেছ। চা খাবে?'

'না।'

'তাহলে—!'

আমি হেনার দিকে তাকালাম 'তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?'

'আমি খুব টায়ার্ড।'

'টায়ার্ড। একটু আগে অরিত্র যখন এসেছিল তখন তোমাকে দেখে বা কথা শুনে একটু মনে হয়নি ওকথা। আমি না থাকলে নিশ্চয়ই অরিত্র এখনই উঠে যেত না!'

হঠাৎ হেনা শরীরটাকে দ্রুত সোফায় নিয়ে গেল, 'কি করতে চাও তুমি? বসতে চাও? বসো। কতক্ষণ বসবে দয়া করে বলে দাও, সেইমত তৈরি হই।'

'হেনা?' আমি চমকে উঠলাম।

হেনা মুখ ফেরাল অন্য পাশে।

'বেশ। আমি যাচ্ছি।'

'এক মিনিট! বসো। আমি খুব অবাক হয়ে গেছি তোমার ব্যাপার দেখে।'

'মানে?'

'যে তুমি আমার সঙ্গে কোনরকম এ্যাডভান্স করতে চাইতে না সেই তুমি আজ এলে কেন?'

www.boiRboi.blogspot.com

'এককালে তো সম্পর্ক ছিল, সেসময়টা তো মিথ্যে ছিল না। যদি সেটাকে বন্ধুত্ব বল তাহলে তার সুবাদে তো আসা যায়, এরকম মনে হয়েছিল আমার। ভুল মনে হয়েছিল। এখন তুমি প্রতিদিন হয়তো নতুন নতুন প্রেমপ্রস্তাব শুনতে অভ্যস্ত। পুরোনকে ভাল লাগার কথা নয়।'

'বাঃ। চমৎকার! তুমি দেখছি বাংলা সিনেমার সংলাপ ভাল লিখতে পারবে। এখনও নিশ্চয়ই কোন কোম্পানির চাকর হওনি। হয়ছে? তা দ্যাখো না, চেষ্টার করে ফিল্মলাইনে।' হেনা মাথা ঝাঁকাতেই ওর চকচকে পালিশ করা কাঁধ ছুঁয়ে থাকা চুলগুলো চোখ গাল স্পর্শ করে গেল, 'হ্যাঁ। প্রেমপ্রস্তাবের কথা বলেছিলে না? আমি স্বীকার করতে বাধ্য আজ পর্যন্ত তুমি ছাড়া আর যে সমস্ত পুরুষ আমাকে প্রস্তাব দেবার সময় প্রায় একই ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করেছে অথবা একই ভঙ্গিতে কথা বলেছে। ব্যাপারটা ক্রমশ এমন একঘেঁয়ে হয়ে গিয়েছে যে আর শোনার মত ধৈর্য আমার নেই।'

'তবু তো আজ শুনতে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ। কারণ কাজের সুবাদে অরিত্রর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি আজ যে কোম্পানিতে আছি কাল সেখানে নাও থাকতে পারি। খামোকা কাউকে চটিয়ে দিয়ে আমার কোন লাভ হবে না। তাছাড়া লোকটা ভদ্রলোক লম্পট নয়।'

'আচ্ছা! তা আমাকে হঠাৎ আলাদা করলে কেন?'

'ওটা আমার বোকামি।'

'বোকামি?'

'তখন বয়স কম ছিল। তুমি যেসব কথা বলতে সেগুলোকে সত্যি বলে মনে হত, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করত। জীবন সম্পর্কে তোমার এ্যাপ্রোচ ছিল নেগেটিভ। ওই বয়সে বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে বেশ আরাম লাগত। কিন্তু সেটা বয়স বাড়ার পর নেহাৎ বোকামো বলেই মনে হয়েছে। তোমার মনের বয়স বাড়েনি বলে তুমি একই জায়গায় পড়ে আছে। তোমাকে সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তাই যারা বানানো ক্লিশে হয়ে যাওয়া শব্দ-উচ্চারণ করে, মেকি জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দুনম্বরী হাসি হাসে তাদের সহ্য করতে তোমার আপত্তি নেই।'

'না নেই। তোমাকে আমি আগেও অনেকবার বলেছি কোটি কোটি মানুষ যা মেনে নিয়েছে তুমি তার ব্যতিক্রম হতে পারনা। এই যে তুমি এম.এ. পাশ করেও চাকরি করনি, ব্যবসা করনি, কিভাবে টাকা রোজগার করছ, আদৌ করছ কিনা তা জানি না, তোমার উপর কেউ নির্ভর করতে পারে? তুমি নিজে নিজের ওপর নির্ভর করতে পার?'

'আমার তো চলে যাচ্ছে।'

'হাঁ। বাবার হোটেলে দুবেলা খাওয়া আর পৈতৃক বাড়ির ছাদ মাথার উপর থাকলে বুলির বিপ্লব করা যায়। কিন্তু তাও কদিন? তেইশ কি চব্বিশ। তোমার বয়স তো তাও অনেককাল পার হয়ে গিয়েছে। এবার তাকিয়ে দ্যাখো না। দুটো পা মাটিতে রাখো!'

'যার দশে হয়নি তার এক'শতেও হবে না হেনা।'

'তার মানে চিরকাল তুমি একটি অকর্মণ্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবে?

'অকর্মণ্য?' আমি হাঁ হয়ে গেলাম।

'নিশ্চয়ই। শুধু কথাসর্বস্ব মানুষকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে? আর যে কথা আজকের যুগে অচল। তোমার ওপর কোন মানুষ আস্থা রাখতে পারবে? তুমি কারও দায়িত্ব নিতে পারবে?'

'তোমার এসব কথায় যুক্তি আছে, ছিল। আমি তাই একবছর আগে মেনে নিয়েছি।'

'তবু তুমি নিজেকে শোধরাওনি?'

'না। আজকাল আমার বমি পায়।'

'বমি পায়?'

'কেউ দুনম্বরী কথা বললে বা জ্ঞান দিলে শরীর গুলিয়ে ওঠে। হেনা অনেকক্ষণ থেকে আমার ওইরকম হচ্ছে। তোমার টয়লেটে যেতে পারি।

'নোঃ।' চিৎকার হলে উঠল হেনা, 'তোমার শরীরের কোন কিছু এ বাড়িতে রেখে যাবে না তুমি।'

'বমিও করতে পারব না?'

'এনি ড্যাম থিং?'

কিন্তু আমি পারলাম না। তীরের মত দৌড়ে গেলাম টয়লেটের দিকে। যেহেতু আমার জানা ছিল তাই দরজাটা খুলে বেসিনে পৌঁছাতে পারলাম শেষমুহূর্তে। ভেতর থেকে যাবতীয় আবর্জনা বেরিয়ে আসার কথা কিন্তু কয়েক চামচ তেতো জল ছাড়া কিছু বের হল না। মুখে ঘাড়ে জল দিলাম, একটু কুলকুচি করলাম হাঁপাতে হাঁপাতে।

'তুমি কি অসুস্থ?' টয়লেটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে হেনা।

'না।' মাথা নাড়লাম। তখনও শরীরে কাঁপুনি হচ্ছিল।

'তাহলে?'

'এরকম হয়?'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

আমি উত্তর দিলাম না। পৃথিবীর কোন ডাক্তার এর চিকিৎসা করতে পারবে না। একথা বলে কি লাভ। চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই হেনা বলল, 'শোন। একটু বসে যাও।'

'কেন?'

'আমি অনুরোধ করছি।'

এই গলায় হেনা অনেককাল কথা বলেনি। আমি বসলাম। হেনা ভেতরে চলে গেল। মানুষের নিজস্ব কিছু চরিত্র আছে। এই চরিত্র এক একজনের এক একরকম। তার নিজের মতন। আবার কিছু চরিত্রে অনেকের পার্থক্য নেই। এই যেমন, সম্পর্ক যখন সহজ থাকে, মন ভাল থাকে তখন মানুষ যে গলায় কথা বলে, একবার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গেলে নিজের অজান্তে আর সেই গলা ব্যবহার করতে পারে না। তখন হয়তো ঝগড়া হচ্ছে না, সেদিন কোন অশান্তি হয়নি কিন্তু মন টোল খেয়ে গেলে কণ্ঠস্বর সেই যে পাল্টে যায় তা আর আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। যদি যায় তাহলে বলতে হবে অসাধ্যসাধন করা হল। আজ হেনার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে এমন ভাবার তো কোন কারণ নেই।

এক গ্লাস জল নিয়ে এল হেনা, 'খেয়ে নাও।'

www.boiRboi.blogspot.com

বিনা বাক্যব্যয়ে জল খেলাম। খুব প্রয়োজন ছিল জলের।

আমার হাত থেকে গ্লাস ফিরিয়ে নিয়ে হেনা সোফায় বসল। ও এখন কথা খুঁজছে বুঝতে পারছি। কিভাবে আমাকে বুঝবে সেটা ভেবে পাচ্ছে না। চিরকালই ওর জ্ঞান দেবার একটু ঝোঁক আছে। ওকে সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে চিনি। তখন স্কার্ট পরে কলেজ যেত, দুটো বেণী পিঠে নাচতো। আমি বাংলা ও ইকনমিক্স। আমি যখন এম.এ. ক্লাশে সময় নষ্ট করছি তখন কিসব পরীক্ষা দিয়ে হেনা চাকরিতে ঢুকে পড়েছে। ওর নিজের বাড়ি বারাকপুরে। এই ফ্ল্যাটটা ওর বাবা ওকে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। একজন খুব পুরোন মহিলা হেনার সঙ্গে একবছর আগে থাকত। হেনাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। সেই মহিলা কি এখনও নেই?

এইসময় হেনা বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে। তুমি একটু বসবে, দেখি কি বানাতে পারি।'

'কেন? তোমার সেই মহিলা নেই?'

'না। নাতনির বিয়েতে গেছে।' হেনা উঠে গেল।

খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বমিটা করার পর। সোফায় শরীর এলিয়ে দিলাম। এবং তার ফলে যে কখন ঘুম এসে গেল তা বুঝতে পারিনি। যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ঘর অন্ধকার। হেনা এ-ঘরে নেই। হড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তারপর ডাকলাম, 'হেনা।'

কোন সাড়া এল না। আমি দ্বিতীয়বার ডাকলাম, এবার একটু জোরে। কিন্তু তবু সাড়া এল না।

হেনা কি আমার মত ঘুমিয়ে পড়েছে? আমি পাশের ঘরে ঢুকলাম। ফ্ল্যাটটা তিন ঘরের ফ্ল্যাট। এর পাশেরটা হেনার বেডরুম, বেডরুমের দরজা বন্ধ। কয়েকবার নক্ করা সত্ত্বেও সাড়া এল না। ঠিক তখনই টেলিফোনটা আওয়াজ করে উঠল। শব্দটা এমন আকস্মিক যে আমি ছিটকে উঠেছিলাম। আমি আবার বন্ধ দরজায় আঘাত করলাম, তোমার টেলিফোন, প্লিজ দরজা খোল।'

তবু দরজা খুলে বেরিয়ে এল না হেনা। এটা রসিকতা হলে মোটা দাগের রসিকতা। আর নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ আছে বলে হেনা দরজা দিয়েছে, এমন ধরে নিলে আর দরজায় আঘাত করে ওর চৈতন্য জাগানোর কোন মানে হয় না। তার চেয়ে রিসিভারটা তুলে বলে দিই আজ রাত্রে ফোন করে কোন লাভ নেই।

রিসিভার তুলতেই মনে হল কী শান্তি। ছোট ফ্ল্যাটে রাত বাড়লে শব্দ ভয়ঙ্কর হয়ে যায়।

'হ্যালো।' গম্ভীর হয়ে বললাম।

'যাক। তোমার ঘুম শেষ পর্যন্ত ভেঙেছে।' হেনার গলা।

'আরে তুমি? তুমি কোত্থেকে বলছ?' আমি হতভম্ব হয়ে বন্ধ দরজাটা দেখলাম।

'তখন তোমাকে বলার সুযোগই হল না। আমি সাড়ে নটা নাগাদ ডিনারে বেরিয়েছি। খুব ভাল বড় পার্টি হচ্ছে আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে। তুমি এমন মড়ার মত ঘুমাচ্ছিলে যে তোমাকে আর ডিস্টার্ব করিনি আসার সময়। এখন তো রাত হয়ে গেছে। তুমি

নিশ্চয়ই চলে যাবে। যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যেও। প্লিজ! রাখছি।'

ওপাশে রিসিভার রাখার আওয়াজ হল। ফোন নামিয়ে ধাতস্থ হতে সময় লাগল আমার। বন্ধ দরজাটার দিকে তাকালাম। ওর ভেতরে কেউ নেই অথচ কত আজেবাজে ভাবনা মাথায় আসছিল বন্ধ দরজা দেখে। এমন তো হতেই পারে, হেনার আগে থেকেই নেমন্তন্ন ছিল। আমাকে ওভাবে ঘুমাতে দেখে ও কেন নেমন্তন্ন বাতিল করবে?

কিন্তু খিদে পাচ্ছে খুব। আমি শেষ কখন খেয়েছি? দুপুরে। রুটি আর আলুর দম। আমার কাছে পয়সা ছিল, বিকেলে যাহোক কিছু খেয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু সঙ্গে লোক থাকলে ওই হয় মুশকিল। প্রকাশকের গাড়ি করে রবীন্দ্রসদনে গিয়েছিলাম। ওঁর উচিত ছিল আমাকে খাওয়ার কথা বলা। বলেননি। আমি যা খাবো তা উনি খাবেন না বলেই আমি কিছু বলিনি।

কিচেনে ঢুকলাম। ফ্রিজ ভর্তি খাবার। মাংস মাছ সব রান্না করা হয়েছে। এমনকি ভাতও। কিন্তু গরম না করে খাওয়া যাবে না। হেনা কি তিনচার দিনের রান্না একসঙ্গে রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখে? মিষ্টির বাক্সটা দেখলাম। নাঃ। চলবে না। ফ্রিজ বন্ধ করে হটবক্সটা দেখলাম। কিছুই নেই ভেতরে। কিন্তু হেনা বলেছিল কিছু বানাতে কিচেনে যাচ্ছে। কি বানিয়েছে তখন?

পেলাম শেষ পর্যন্ত। একটা সসপ্যানের মধ্যে চাপা দেওয়া ছিল। মোটা মোটা ওমলেট আর চার পিস টোস্ট। ওমলেট একটাই। তার মানে হেনার নিজেরটা খেয়ে গেছে। স্বাভাবিক। অফিস থেকে ফিরে এসে অভুক্ত অবস্থায় কেউ পার্টিতে যায় না।

ঠাণ্ডা ওমলেট এবং শীতল টোস্ট ক্ষুধার্তের জিভে কোন বিস্বাদ আনে না। খাওয়া হয়ে গেলে শরীরে বল পেলাম। এবার ফেরা যাক। রাত ঢের হয়েছে। এরপরে বাস পাব না। ট্যাক্সিতে চেপে বাড়ি ফেরার বিলাসিতা আমি এ্যাফোর্ড করতে পারি না। কিন্তু বাইরের দরজা খুলতে যাওয়ার সময় মনে হল হেনার সঙ্গে আমার কোন কথাই হল না। একবছর ধরে না আসার কারণ যে ব্যবধান ছিল তা আর কখনই না এলে নিশ্চয়ই আরও বেড়ে যেত। কথা বলার কোন প্রয়োজনই হত না। কিন্তু আজ সন্ধ্যেবেলায় কথাগুলো নতুন করে উঠেছিল। সেটা শেষ করতে হলে আমাকে আবার এই ফ্ল্যাটে আসতে হয়। ওই আবার আসা হেনা পছন্দ করবে না। তাই সাপ ব্যাঙ যা হোক আজই শেষ করে যাওয়া ভাল। যতই রাত হোক, কলকাতার রাস্তায় কেউ পড়ে থাকে না।

তবে বাড়িতে যে খাবার আমার জন্যে বরাদ্দ সেটা নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। আমার জন্যে খাবার না রাখার জন্যে বলে দেব বলে ফোনের দিকে এগোলাম। ডায়াল করতে গিয়ে থমকে গেলাম। বাচ্চলে! আমার বাড়ির নাম্বারটা যেন কত? ঝাপসা ঝাপসা লাগছে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অদ্ভুত যন্ত্রণা শুরু হল। তারপরেই মনে হল ওটা আমার বাড়ি ভাবলাম কেন? যে বাড়িতে আমি থাকি, মানে রাত্রিবাস করি, সেটা আমার বাড়ি হবে কেন? ওটা আমার পিতার বাড়ি। পিতা? ধ্যাৎ! পিতা বললেই কিরকম মুনিঋষি সাধুসন্ত সেইটাদের ছবি মনে আসে। বাবা শব্দটার মধ্যে ওগুলো অতটা না হলেও কিছুটাতো থাকছেই। বাপ শব্দটা বরং অনেক বেশি সহজ। কোন স্ট্যাম্প নেই। মেয়েরা যদি বাপের বাড়ি বলতে পারে তাহলে ছেলেরাই বা বলবে না কেন? এইটুকু

www.boiRboi.blogspot.com

ভাবতেই নাম্বারটা মনে এসে গেল।

ওপাশে ফোন বাজছে। আমার বাপ বাড়িতে থাকলে এখন তাঁর আহ্নিকের সময়। নিশ্চয়ই ভাই ফোনটা তুলবে। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। ফোনটা বেজে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। লাইনটা কেটে আবার ডায়াল করলাম। একই অবস্থা। এমনটা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ফোন খারাপ হয়েছে। বাড়ি খালি করে সবাই অন্য কোথাও কিছুতেই চলে যেতে পারে না। ওয়ান নাইন নাইনে ফোন করলাম। মিনিট তিনেক বাজল কিন্তু দিদিমণিরা সাড়া দিলেন না।

শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম। ঘড়ি বলছে এগারটা বেজে গিয়েছে। এবার বেরুতে হয়। আলো নিভিয়ে দিতেই দরজায় শব্দ হল। বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে কেউ দরজা খুলছে। চোর নাকি? দ্রুত সরে এলাম এক কোণে। চোর হলে হেনার উপকার করে যাওয়া উচিত। আলমারির আড়ালে দাঁড়ালাম।

কিন্তু হেনারই গলা বাজল, 'তোমাদের অনেক ধন্যবাদ পৌঁছে দেবার জন্যে।'

টুক করে আলো জ্বলল। হেনা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল। আমি ঘড়ি দেখলাম। যাচ্চলে! আমি এতক্ষণ কি দেখছিলাম? এগারটা নয় বারোটা বেজে গেছে।

একটি মহিলা কণ্ঠ বলল, 'টয়লেট কোথায় হেনা?'

'ওইতো, ওইদিকে। যাও।' হেনার গলা। তারপরেই টয়লেটের দরজার বন্ধ হবার শব্দ হল।

সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরুষ কণ্ঠ শুনলাম। চাপা গলায় বলছে, 'হেনা! আমি আর পারছি না।'

'কেন? শরীর খারাপ?' হেনা খুব সিরিয়াস।

'ওঃ ঠাট্টা করো না। আই নিড ইউ হেনা, আই লাভ ইউ।'

'প্লিজ সুমিত! তোমার বউ শুনলে দুঃখ পাবে।'

'আই ডোন্ট কেয়ার! আমি আর ওর সঙ্গে থাকতে পারছি না। আই নিউ ইউ।'

'রিয়েলি?'

'জাস্ট টেল মি ইয়েস!'

'তোমার বউ-এর সামনে বলতে পারবে?'

'তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ?'

'না। কিন্তু মুশকিল হল, তুমি একবারও জানতে চাইছ না আমি ফ্রি আছি কিনা!'

'তার মানে?'

'আমি তো অন্য কারো সঙ্গে এনগেজড্ হয়ে থাকতে পারি!'

'মাই গড!'

'কেন? পারি না?'

'সেই ভাগ্যবানটি কে?'

'তুমি চিনবে না। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম।'

'হেনা, তুমি আমাকে ব্লাফ দিচ্ছ না তো?'

হেনাকে উত্তর দিতে হল না কারণ সেইসময় টয়লেটের দরজা খুলে গেল। আশ্চর্য

দুনম্বরী লোক তো। বউ টয়লেট যাওয়া মাত্র অন্য মহিলাকে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে? ইচ্ছে হচ্ছিল বাইরে বেরিয়ে এসে লোকটার কলার ধরি। কিন্তু মহিলা বললেন, 'চল। এলাম ভাই।'

'এসো। আবার বলছি অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্যে।' হেনার গলা।

দরজা বন্ধ হল। আলো নিবল। নিবল বলেই সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হেনা আমাকে দেখতে পেল না। শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেলে সে। ঘরে আলো জ্বলল। গুণগুণ করে সুর ভাঁজছে হেনা। মনে বোধহয় আনন্দ এসেছে। কেন? এই যে একের পর এক অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষরা ওকে প্রেম নিবেদন করছে, তাই? কিন্তু ব্যাপারটা কি? এই দুনম্বরী লোকটাকেও হেনা যার কথা বলল সে আমি ছাড়া কেউ নয়। অথচ এখন হেনা আমার সঙ্গে প্রেম করছে না। কিন্তু প্রেমিকদের কাটাবার জন্যে আমার নাম ব্যবহার করছে। কেন?

হেনা বেরিয়ে এল। এখন ওর পোশাক পাল্টে গেল। হালকা নীল এবং বেশ পাতলা একটা হাতকাটা নাইটি পরেছে। এক পলক দেখতে পেলাম, তারপরেই কিচেনে ঢুকে আলো জ্বালল। গুণগুণানি বন্ধ হচ্ছে না এখনও। আমি এখন কি করি। চোরের মত এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা আর ভাল দেখাচ্ছে না। আমি যে যাইনি, এই বাড়িতেই ছিলাম, তাও হেনা পছন্দ করবে না। অথচ এখন দরজা খুলে বেরুতে গেলেই আমি ওর কাছে ধরা পড়ে যাব।

তখনই কিচেনের আলো নিবিয়ে বেরিয়ে এল হেনা। একটু দাঁড়াল। তারপর টেলিফোনের সামনে গেল। আমি ওর পেছনটা দেখতে পাচ্ছি। হেনার ফিগার খুব ভাল। আজকাল চুলে নানান কায়দা করায় গ্ল্যামার বেড়ে গেছে। ওপাশের আলো জেলে নিয়ে হেনা ডায়াল করল। কয়েক সেকেণ্ড বাদেই সে "হেলো" বলল।

'হেলো। আমি খুব দুঃখিত এত রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করছি বলে। আসলে বিপ্লব আমার এখানে একটু দেরি করে বের হয়েছে। ও ঠিকঠাক বাড়িতে পৌঁছালো কিনা সে ব্যাপারে চিন্তায় ছিলাম। কি বললেন? এখনও পৌঁছায়নি? অদ্ভুত! আমি? আমি ওর সঙ্গে একসময় কলেজে পড়তাম। আমার নাম হেনা। আপনি? ওহো, না মেসোমশাই, আমি আগে কখনও ফোন করিনি। নাম্বারটা লেখা ছিল। কি বললেন? এটা ঠিক, আপনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলেকে চেনেন। ওকে কনভিন্স করা খুব ডিফিকাল্ট। ও, তাই? এ তো খুব ভাল ব্যাপার। এন-আর আই-দের সঙ্গে? বাঃ। আচ্ছা, ঠিক আছে, না না, তার দরকার নেই। আজ রাত্রে আর ফোন করতে হবে না। নিশ্চয়ই পৌঁছে যাব। গুডনাইট।'

আমি হতভম্ব হয়ে শুনছিলাম। আমার বাপের এখন সুখনিদ্রা দেওয়ার সময়। এই সময় তিনি ফোন তুললে ক্ষেপে যাওয়ার কথা, এক পার্টির বড়কর্তার ফোন যদি না হয়। আজ হেনা যে গলায় বলল তাতে মনে হল তিনি বেশ ফুর্তিতে আছেন। আর হেনার ব্যাপারটা কি? কোনদিন ও সত্যিই ফোন করেনি। আজ সে পৌঁছালো কিনা তা জানতে এত উদ্বিগ্ন হবে কেন?

হেনা তার ঘরে চলে গেল। ঠিক করলাম ও ঘুমিয়ে পড়লে এখান থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু কাঁহাতক এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? আমি অন্ধকার ঘরে পা টিপে টিপে

www.boiRboi.blogspot.com

সোফার কাছে গেলাম। তারপর প্রায় নিঃশব্দে সোফায় বসে পড়লাম। আঃ, আরাম।

হেনার এই ফোন করাটা আমাকে খুব ডিস্টার্ব করছে। এত রাত্রে ফোন করে বাবার সঙ্গে কথা বলা মানে ও ইচ্ছে করে জানিয়ে দিল ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। কেন? বাবাকে জানিয়ে ওর কি লাভ যখন সম্পর্কটা নেই।

ভেতরের ঘরের টিউব নিবল এবং একটা হালকা নীল আলো জ্বলে উঠল। আর বড়জোর মিনিট পনের। তার মধ্যেই ওর ঘুমিয়ে পড়ার কথা। আমি ঘড়ি দেখতে লাগলাম। অন্ধকারে ঘড়ির ভেতরটা যেভাবে জ্বলে তাতে রহস্য আরও বেড়ে যায়।

পনের মিনিট বাদে উঠে দাঁড়িয়ে মনে হল হেনা ঘুমিয়েছে কিনা তা দেখে তবেই দরজা খোলা উচিত। নইলে খুলতে গেলে যে শব্দ হবে তাতে হেনা সজাগ হয়ে যাবে।

নিঃশব্দে ওর বেডরুমের দরজার পাশে পৌঁছে গেলাম। উঁকি মারতেই আমার শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রবাহিত হল। উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে হেনা। সেই নাইটিটা পাশে খুলে রেখেছে। এখন তার অঙ্গে শুধু অন্তর্বাস ছাড়া কিছু নেই। ওই নীলাভ আলো ওর শরীরের খোলা জায়গায় পড়ে অপূর্ব মায়া সৃষ্টি করেছে। আমার মনে তীব্র বাসনা জাগল ওই জায়গা স্পর্শ করতে। এমন আকর্ষণ আমি কখনও অনুভব করিনি। এক পা এগিয়েই আমি থেমে গেলাম। হঠাৎই নিজেকে চোর বলে মনে হল।

চুপচাপ ফিরে এলাম। মাথার মধ্যে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুই ভাবতে পারছি না। শুধু মনে হচ্ছিল এখান থেকে বেরিয়ে গেলে আমি বেঁচে যাব। দরজা খুললাম। সামান্য শব্দ বাজল। বন্ধ করতে সেটা দ্বিগুণ হল। মনে হল হেনার গলা শুনতে পেলাম। ও কি জেগে উঠে কে বলল। লিফট বন্ধ। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।

নীচে নেমেই দেখতে পেলাম গেট বন্ধ। সেখানে তালা ঝুলছে বের হবার কোন উপায় নেই। কি করা যায়? দারোয়ান নিশ্চয় তালাচাবি দিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়নি? লোকটাকে খোঁজার চেষ্টা করলাম উঁকি মেরে। এদিকের আলো জ্বলছে না। দারোয়ানকে দেখতে পেলাম না। সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই।

মিনিট পনের বাদে মনে হল ওপরেই উঠে যাই। হেনাকে ডেকে তুলে বলি সব কথা। আমার কোন মতলব ছিল না এই থেকে যাওয়ার পেছনে। ঠিক সেই সময় কেউ একজন হাঁকল, 'কে? কে ওখানে? কৌন হ্যায়?'

চিৎকারটা এত জোরে যে আমি ঝটপট সরে এলাম। ওই লোকটাই কি এই বাড়ির দারোয়ান? এই সময় দ্বিতীয় গলা শোনা গেল, 'কেয়া হুয়া সেলিম ভাই?'

'একটা লোককে দেখলাম গেট থেকে সরে যেতে। তালা খোল, জলদি।'

এইবার হাতেনাতে ধরা পড়ার চেয়ে লুকিয়ে পড়া ভাল। নাকি, এগিয়ে গিয়ে বলব, 'আমি চোর নই। হেনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম কিন্তু গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছে তা জানতাম না।' যুক্তিটা জলো বলে মনে হল। হেনা নিশ্চয়ই জানে যখন গেট বন্ধ হয়। সেক্ষেত্রে সে নিশ্চয়ই তার কাছে রাখা চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিত। ওরা আমাকে হেনার কাছে ধরে নিয়ে যাবে সত্যিই বলছি কিনা জানার জন্যে। তখন হেনা কি বলবে?

দ্রুত দৌড়ে ওপরে উঠলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার সামনে পৌঁছে বেল বাজালাম

মিনিট খানেক গেল, মনে হচ্ছিল অনেক সময়। নীচে হল্লা বাড়ছে। এই সময় দরজা খুলল হেনা। তার পরনে এখন হাউসকোট। আমাকে দেখে সে হতভম্ব, 'তুমি?'

তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। তখনও নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়নি।

'তুমি এখানে কি করে এলে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল হেনা।

'প্লিজ! চুপ করো। সব বলছি।' আমি মিনতি করলাম।

'কিন্তু—।'

'আমি তোমাকে বিরক্ত করছি কিন্তু কোন উপায় নেই। যদি কেউ এখানে খোঁজ করতে আসে তাহলে বলবে আমি এখানে আসিনি।'

'এই বাড়িতে ঢুকলে কি করে?'

'আমি এখান থেকে বের হইনি।' সোফায় বসে হেনাকে সব খুলে বললাম।

হঠাৎ হেনার চোখমুখ অন্যরকম হয়ে গেল, 'আমি শুয়ে পড়ার পর তুমি আমার বেডরুমে গিয়েছিলে? সত্যি কথা বল?'

'না।' বলেই মনে হল, মিথ্যে বলে কি লাভ, 'ভেতরে যাইনি। দরজা পর্যন্ত গিয়ে দেখেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ কিনা। আই অ্যাম সরি।'

'ভেতরে গিয়ে ডাকোনি কেন?'

'এ্যাঁ?'

'ভেতরে ঢুকে আমাকে ডাকোনি কেন?'

'আমার মনে হয়েছিল ঘুম থেকে উঠে আমাকে দেখে তুমি রেগে যাবে।'

'অদ্ভুত। আচ্ছা, বলতো, তুমি আর কতদিন আমাকে জ্বালাবে?'

'আমি চাইনি।'

'এখন কি করবে। এত রাত্রে এখান থেকে আমি যদি তোমাকে নিয়ে গিয়ে গেট খুলে দিই তাহলে কাল সবাই গল্পটাকে নানান রঙে সাজবে। উঃ।'

'আমি এখানেই থাকছি। সকাল হলে গেট খুললে বেরিয়ে যাব। আমাকে নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। যাও, শুয়ে পড়। তোমাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত! শব্দটাকে অর্থহীন করে দিলে তুমি।'

'যাও। শুয়ে পড়।'

'কি ভাবে?'

'তার মানে?'

'একই ফ্ল্যাটে একজন পুরুষ বাইরে বসে থাকলে আমার ঘুম আসবে?'

'দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

'বেডরুমের দরজা আমি কখনও বন্ধ করি না।'

'ও। আমি প্রমিজ করছি, ওদিকে যাব না। বিশ্বাস করো।'

'আমি বিশ্বাস করি না। তুমি একবার গিয়েছ, আবার যেতে পার। তখন সাহস পাওনি, এখন—। তাছাড়া আমি হাউসকোট বা শাড়ি পরে শুতে পারি না। তুমি এ ঘরে থাকলে এগুলো ছেড়ে শোওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

www.boiRboi.blogspot.com

হঠাৎ আমার মনে হল বড্ড বাড়াবাড়ি করছে হেনা। বললাম, 'যা ইচ্ছে তাই করো তাহলে। আলো নিবিয়ে চলে যাও, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

হেনা চলে গেল। আলো নেবাল না। আমি চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। বাপ নিশ্চয়ই আজ রাত্রে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছে। কাল বাড়িতে গেলে গেট আউট বললে অবাক হব না। পরিস্থিতি যেরকম হবে সেইরকম কাজ করতে হবে। আগেভাগে ভেবে কোন লাভ নেই। তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। চেয়ারের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিতে ঘুম এসে গেল। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

হাঁটুতে মৃদু আঘাত লাগতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখলাম প্রায় রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে হেনা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'ওঠো!'

'কেন?'

'আমার ফ্ল্যাটে তুমি আরাম করে ঘুমাবে আর আমি ঠায় জেগে থেকে সেটা দেখব এটা হতে পারে না।'

'তুমি ঘুমাচ্ছ না কেন?'

'কারণ আমি মানুষ। তোমার মত এ্যাবনর্মাল নই যে সুইচ টিপলেই ঘুম চলে আসবে। তোমাকে এখানে থাকতে হলে জেগে থাকতে হবে নইলে চাবি দিচ্ছি বেরিয়ে যাও, যাওয়ার সময় আমার লেটার বক্সে চাবিটা ফেলে দিয়ে যেও।'

'এত রাত্রে আমি কোথায় যাব?'

'তুমি তো আমার অনুমতি নিয়ে এখানে থাকোনি।'

'বেশ। দাও চাবি।'

'বাঃ। তবু তুমি জেগে থাকবে না?'

'তোমার উদ্ভট ইচ্ছে পূর্ণ করার কোন মানে হয় না।'

'কে উদ্ভট? আমি না তুমি? এম.এ. পাশ করে বেকার বসে আছ, কি না, আমি দুনম্বরী উপায়ে পাওয়া চাকরি নেব না। ভালবাসব অথচ যাকে ভালবাসি তাকে নিরাপত্তা দেব না। তোমার মত সুবিধেবাদী অলস অকর্মণ্যরাই একথা বলে। এই সমাজে তুমিই নিজেকে উদ্ভট করে রেখেছ।'

'বেশ। তুমি আমাকে কি করতে বল?'

'আমার কিছু বলার নেই।'

'প্লিজ, হেনা।'

হেনা আমার দিকে তাকাল, 'বেশ। পারবে তুমি তোমার বাবার অফার অ্যাকসেপ্ট করতে? এন আর আই-দের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করতে পারবে?'

'তুমি বুঝতে পারছ না ওটা করতে গেলে বাপের দুনম্বরী ক্ষমতার সাহায্য চাই। পার্টি, রাইটার্স বিল্ডিং, সর্বত্র বাপের প্রতিপত্তি খাটিয়ে কাজ আদায় করতে হবে। যার এই সুযোগ নেই সে-বেচারা কোনদিন যা পাবে না আমি তা সহজেই পেয়ে যাব। আমাকে তুমি এই অন্যায় করতে বলছ?' আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

'অন্যায়? এই যে এখানে একজন অবিবাহিতা একা মহিলার ফ্ল্যাটে মধ্যরাতে তুমি দাঁড়িয়ে আছ যার সঙ্গে তোমার কোন লিগ্যাল সম্পর্ক নেই, এটা অন্যায় নয়? এতই যখন

তোমার আপত্তি তাহলে এখানে পড়ে আছ কেন? জঙ্গলে বা পাহাড়ে চলে যাও। সেখানে হয়তো এত সমস্যা থাকবে না।' হেনা ছুটে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল চাবি নিয়ে। টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'গেট লস্ট।'

চাবিটা তুলে বেরিয়ে এলাম। নীচে নেমে তালা খুলতেই একজন এগিয়ে এল, 'আপনি কোন ফ্ল্যাট থেকে আসছেন স্যার?'

উত্তর দিলাম। লোকটা দ্বিতীয় প্রশ্ন করার আগে বাইরের দেওয়ালে টাঙানো লেটার বক্সগুলোর মধ্যে যেটার বুকে হেনার নাম লেখা তার গর্তে চাবিটা ফেলে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখলাম রাস্তা সুনসান। আলোগুলো হলদেটে লাগছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মনে হল, সত্যি কি আমি উদ্ভট? হেনাকে আজ কত বছর হয়ে গেল বন্ধু বলে নিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি একবারও ওকে চুমু খাইনি। কলেজে পড়ার সময় এসব ব্যাপারে যারা অভিজ্ঞ তারা কতবার জিজ্ঞাসা করেছে আমাদের সম্পর্ক কত দূর এগিয়েছে? চুমু খাওয়া ওদের কাছে হাত মেলানোর মত সহজ ব্যাপার ছিল, ওরা আরও এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হেনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করলেও ওসব ভাবনা আমার মথায় আসেনি। হেনা যখন চাকরি নিল, ওর ব্যাচেলার মামার এই ফ্ল্যাটে উঠে এল তখন তো অনেকসময়ই একা পেতাম। মামা মারা যাওয়া পর তো কোন ভয় ছিল না। তাহলে? আমি কি একজন ছেলেবন্ধুর থেকে হেনাকে আলাদা করিনি? এটা উদ্ভট নয়? একজন আমার বয়সী ছেলে হেনার মত সুন্দরী মহিলাকে প্রেমিকা হিসেবে পেয়ে শরীর সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকবে কি?

আমি উদ্ভট না মিসফিট? এই জগৎসংসারে সবাই যেমন চলছে তেমন চলতে পারি না কেন? এই সব প্রশ্ন যখন মনে আসছিল ঠিক তখন একটা মারুতি ভ্যান দ্রুত গতিতে পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে ব্রেক কষে দাঁড়াল বেশ খানিকটা দূরে। গাড়িটা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ব্যাক করে চলে এল আমার পাশে। গাড়ির কাচ কালো, ভেতরে ঠাণ্ডা মেশিন চলছে বলেই বোধহয় সেগুলো নামানো হয়নি। ড্রাইভারের পাশের আসনে যে বসেছিল সে কাচ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, টাইগার সিনেমাটা কোন দিকে পড়বে?'

কলকাতায় বাস করে টাইগার চেনে না এমন হতে পারে না। বুঝলাম এরা নতুন। আমি জায়গাটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম কিন্তু লোকটা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ মনে হল ওরা যদি আমাকে লিফট দেয় তাহলে আমি ধর্মতলা এগিয়ে যেতে পারি আর ওদেরও উপকার হবে। লোকটি বলল, 'আমরা কলকাতায় নতুন। আপনি কি এখানে থাকেন?'

'না। আমি ওদিকেই থাকি।' বললাম, 'আপনার গাড়িতে জায়গা থাকলে সঙ্গে যেতে পারি।'

'তাই নাকি? খুব ভাল হয়। উঠে পড়ুন।'

পেছনের দরজা খুলে দিতেই গাড়িতে উঠলাম। দরজা বন্ধ করতেই গাড়ি ছুটল। আমি রাস্তা বলতে গিয়ে শুনলাম পেছন থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। চমকে পেছন ফিরে দেখলাম কেউ একজন ডিকিতে পড়ে আছে। হাত পা মুখ বাঁধা তার। আর পাশে তাকালাম। সেখানে দুজন লোক বসে আছে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে। জিজ্ঞাসা করলাম,

www.boiRboi.blogspot.com

'এসব কি ব্যাপার?'

সামনের লোকটি বলল, 'ওর দিন হয়ে গেছে। আজ বলি হবে। আমরাই করব ঠিক ছিল। এখন মনে হচ্ছে সেটা তোকে দিয়ে করালে ভাল হয়। অন্তত পুলিশ জানবে আমরা খুন করিনি। চুপচাপ বসে থাক যদি প্রাণে বাঁচতে চাস। টাইগার চেনাচ্ছে।' বলা মাত্র বাকিরা হো হো করে হেসে উঠল। মদের গন্ধ নাকে লাগল।

'আমাকে নামিয়ে দাও। থামাও গাড়ি। থামাও।' চিৎকার করবো বলতেই একটা শক্ত কিছু দিয়ে পেটে আঘাত করল আমার। কক্ কক্ পেট চেপে ধরলাম। তীব্র যন্ত্রণাতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল প্রায় লোকটি বলল, 'আবার চিৎকার করলে জন্মের মত থামিয়ে দেব।'

গাড়ি ছুটে চলেছে নির্জন রাস্তা দিয়ে। সেদিকে তাকাবার মত ক্ষমতা আমার নেই। যন্ত্রণাটা কিছুতেই কমছিল না। এরা মাস্তান না ডাকাত আমি জানি না। তবে এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর তা বুঝে গিয়েছি। পেছনের লোকটাকে এরা খুন করবে। আমাকে একা এত রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়েছে কাজটা করাবে বলে। না করলে আমার ভাগ্যে কি আছে আমি জানি না।

ভ্যানটা থামতেই সামনে থেকে হুকুম হল, 'চটপট।'

ওপাশের দরজা খুলে লোক দুটো লাফিয়ে নামল। ডিকি খুল লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামাল। মনে হল এই সুযোগ পালিয়ে যাওয়ার। আমি দরজা খুলতে যেতেই সামনের লোকটা আমার দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বল, 'তোকে নামতে হবে না। তুই এখানে বসেই গুলি ছুঁড়বি। চালাকি আমি একদম পছন্দ করি না।'

আমি অজান্তেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। সেটা দেখে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'আগে কখনও খুন করেছিস? করিসনি তো?'

হঠাৎ কিছু একটা ভর করল আমার ওপর। তিলজলা থেকে বাপের কাছে একটা লোক আগে প্রায়ই আসতো। বিশেষ করে ইলেকশনের সময়। লোকটার নাম মহিম গুপ্ত। মুখে কাটা দাগ ছিল। ছুরি মেরেছিল কেউ। সে এলেই বাপ সাবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। সমাজবিরোধী হিসেবে লোকটার নাম কয়েকবার কাগজে বেরিয়েছে। আজ হঠাৎ সেই মহিম গুপ্তকে মনে পড়ল। পড়তেই বললাম, 'শেয়ার দিতে হবে।'

'তার মানে?' খিঁচিয়ে উঠল সে।

'আমি মহিমের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'মহিম? কোন মহিম।'

'তিলজলার মহিম গুপ্ত। ও শেয়ার ছাড়া কোন কাজ করে না। আমি করাও যা আর ওর করাও তা। চেনা যাচ্ছে?'

লোকটা হঠাৎ দরজা খুলে নেমে গেল। ওর সাকরেদদের সঙ্গে কথা বলল। তারপর এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার আস্তানা কোথায়?'

তুই থেকে তুমিতে উঠেছি দেখে সাহস বেড়ে গেল। জায়গাটা বললাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহিমকে ফোন করবে? ও আমার বাপের চামচে?'

'চামচে? তোমার বাপের নাম কি?'

জবাব শুনে লোকগুলো এর ওর দিকে তাকাল। তারপরেই মুখের চেহারা বেশ বদলে গেল লোকটার, 'খুব ভুল হয়ে গেছে দাদা। একদম সেমসাইড করে ফেলেছি। কিছু মনে রাখবেন না। আপনার বাবা কিংবা মহিমকে জানানোর দরকার নেই।'

'এ কে?'

'বহুৎ হারামি। আমাদের কয়েকজনকে ফাঁসিয়েছে। আজ মওকা বুঝে তুলেছি। এই উঠে পড়।' লোকটা হুকুম করতেই বাকিরা উঠে পড়ল। গাড়িতে ওঠার আগে সামনের সিটের লোকটা রিভলভারে ট্রিগার টিপল। দুবার। দুটো শব্দ বাজল। দেখলাম লোকটা পাশ ফিরে পড়ে আছে হাত পা বাঁধা অবস্থায়। অন্ধকারে রক্ত বের হয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

গাড়ি চলেছে ফুল স্পিডে। আমার চোখের সামনে একটা মানুষ খুন হয়ে গেল কিন্তু আমার কোন প্রতিক্রিয়া নেই? উল্টে আমাকে খুন করতে হল না বলে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। যদি মহিমের নামটা মুখে না আসত তাহলে ওরা আমাকে বাধ্য করত খুন করতে। আমার অন্য কোন পথ ছিল না। কিন্তু বাপের নামটা শোনামাত্র ওরা পালটে গেল কেন? ওই মহিম গুপ্তের নাম ওদের এতখানি বিচলিত করেনি। বাপ জানতাম সরকারি মহলে খুব প্রতিপত্তিশালী নেতা কিন্তু সমাজবিরোধীরাও এত খাতির করে?

ওরা গাড়ি ছুটিয়েছে নর্থের দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদিকে?'

'আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসছি দাদা।'

দাদা! নামিয়ে দিয়ে আসছে? আমাদের বাড়ি চেনে নাকি? অথবা শেষবার আমার পরিচয় যাচাই করতে যাচ্ছে। যাকগে, আমারই সুবিধে হচ্ছে। বউবাজারের মোড়ে একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়েছিল। দুজন অফিসার হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাল। একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? এত রাত্রে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কার গাড়ি?'

সামনে বসা লোকটি বলল, 'কাজ ছিল।' আমার বাপের নাম বলে বলল, 'ওর ছেলেকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি বাড়িতে। আপত্তি আছে?'

অফিসার উঁকি মেরে আমাকে দেখল, 'ঠিক আছে। যান।' গাড়ি আবার স্পিড তুলল। সামনের লোকটি হাসল, 'দাদার নাম বললে দারুণ কাজ হয়।'

আমি চুপচাপ বসেছিলাম। এসব কি হচ্ছে? যা আমি কোন কালে চাইনি, সেই কাজটাই এরা করছে। আমার এতদিনের লড়াই তাহলে বৃথা হবে। হঠাৎ নজরে এল থানা আসছে। ওই একটা জায়গায় আমি জীবনে যাইনি। তেইশ বছর বয়সে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম। সরকারি চাকরি। ইন্টারভিউ হয়েছিল লিখিত পরীক্ষার পরে। শুনেছিলাম পুলিশ ভেরিফিকেশনের পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসবে, খুব ভাল লাগছিল সে সময়। এই প্রথম কাউকে ধরে বা কারও দয়ায় আমি চাকরি পাচ্ছি না, একেবার নিজের যোগ্যতায় চাকরি করতে চলেছি। ব্যাপারটা আমার বাপকে জানাইনি। একদিন সকালে একটা রোগামত লোক চোরের মত বাড়িতে এল। বাপ তখন বাড়িতে নেই। এসে বলল ওই থানার একজন অফিসার আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। পাড়ার এক সেলুনে তিনি দাড়ি কামাচ্ছেন। আমার সঙ্গে পুলিশের কি কথা থাকতে পারে বুঝতে না পেরে যখন চুপ করেছিলাম তখন লোকটা বলল, 'আপনার চাকরির ব্যাপারে। বাবু

www.boiRboi.blogspot.com

খুব ভাল লোক, হয়ে যাবে। চলুন।'

গিয়েছিলাম। ওই সেলুনটায় আমরা সাধারণত ঢুকি না। সবসময় হিন্দি গান বাজানো হয়। ঢুকে দেখলাম সেলুন ফাঁকা। পুলিশ দাড়ি কামাচ্ছে বলেই বোধহয় লপেটারা তখন বাইরে। লোকটা বেশ মোটা, মুখে সাবানের ফেনা। রোগা লোকটা বলল, 'এনেছি স্যার।'

'আপনি বিপ্লবচন্দ্র?' আয়না দিয়ে লোকটা আমাকে দেখল।

'না। আমি শুধু বিপ্লব।'

'ওই একই হল। ইন্টারভিউ তো ভালই হয়েছে। আমি এক কলম ফেবারে লিখলে চাকরি। বুঝতে পারছেন? তবে আমার তো না লিখে উপায় নেই। জলে বাস করে তো কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না। আপনার বাবাকে কুমির বলিনি কিন্তু 'ওটা কথার কথা।' লোকটা হাসল, 'আসলে, আপনার বাবাও জানেন, এসব কেসে আমরা কিছু পেয়ে থাকি।'

'কি পান?'

'কি পাই? যার যেমন চাকরি সে তেমন দেয়। আপনার চাকরি মন্দ নয়।'

'কেন পান?'

'কেন পাই?' লোকটা এবার সারসরি আমাকে দেখল। মুখে সাবান থাকায় এই মুখ পরে চেনা মুশকিল হবে। তবে কপালে কাটা দাগ ছিল।

লোকটা হাসল, 'রসিকতা হচ্ছে? হেঁহে। ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। শুনুন আমি তো আপনার বাবাকে বলতে পারব না। বললে বড়বাবু, বড়বাবু থেকে এসি, ডি সি সিপির কানে চলে যাবে কথাটা। দিয়ে দেবে রাইটার্সের ভি আই পি গেটে ডিউটি। জীবন কয়লা হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে বলতে পারি। না না টাকা পয়সা চাই না। পোস্টিং চাই। বড়বাজারে। লালবাজারকে ধরলে কিছু করতে পারব না। আপনার বাবা যদি বলে দেন তাহলে কর্তারা না করতে পারবে না। আপনি আমার হয়ে ওঁকে রাজি করাবেন বলতে। ঠিক আছে?'

'কেন?'

'কেন?' কেন মানে? আমি যে খুব ভাল রিপোর্ট দেব আপনার ফাইলে।'

'আমি আজ পর্যন্ত কোন খারাপ কাজ করিনি যে আপনি খারাপ রিপোর্ট দেবেন।'

'অ।'

'আমি যেতে পারি?'

'হেনা নামে একটা মেয়ে আপনার বন্ধু?'

হেনার নাম ওর মুখে শুনবো ভাবিনি। অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'ওর বাড়িতে যে যান তা আপনার বাবা জানেন?'

'কেন?'

'আমার রিপোর্টে সত্যি কথাটা যে লিখতে হবে। হেনাকে নিয়ে আপনি নার্সিং হোমে গিয়েছিলেন এ্যাবারসন করাতে। আপনার মর‍্যাল ক্যারেক্টার কিরকম তা জানলে এই চাকরি কি পাবেন। ভেবে দেখুন।'

'আপনি মিথ্যেবাদী। যদি পুলিশ না হতেন তাহলে আমি আপনাকে মারতাম।' কথাটা

www.boiRboi.blogspot.com

লার সময় চিৎকার করে উঠলাম।

লোকটা চট করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয় বলল, 'এই, দাঁড়িয়ে দেখছ কি, আমার টাইম নেই। দাড়ি কাটো।'

আমি বেরিয়ে এলাম। রাগে শরীর জ্বলছিল। কিরকম বানিয়ে গল্প বলল লোকটা। এই হল পুলিশ। বাবার নেতা এদের সভায় গিয়ে এদেরই প্রশংসা করেন। মনে হয়েছিল এত বড় মিথ্যে কাগজে কলমে কখনও লিখতে পারবে না লোকটা। সেই রোগা লোকটা পেছন পেছন আসছিল, 'আপনি রাগ করবেন না। শুধু বাবাকে একটু বলে দিন বাবু আপনার ভাল রিপোর্ট দেবে। বুঝতেই পারছেন।'

আমি জবাব দিইনি। চাকরিটা আমার হয়নি। ওই পুলিশ অফিসার কিরকম রিপোর্ট দিয়েছিল বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু কি লিখেছিল তা জানি না। বাপকে আমি কিছু বলিনি। বললেই তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কৃতার্থ করতেন। সেটা চাইনি। ভেবেছিলাম এমনিতেই চাকরিটা হয়ে যাবে। ভারতবর্ষে তা হয় না। এদেশে যারা ভোট দেয় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। কিন্তু সেই অধিকার আদায় করতে গেলে টাকা লাগে। আর যেহেতু এদেশের নিরানব্বুই ভাগ মানুষের টাকা নেই তাই ওসব অধিকার টধিকার কাগুজে ব্যাপার। আমি শুধু নিজের মত প্রতিবাদ করে স্বস্তি পেতে পারি, জানি সেই স্বস্তিটাও হরিণের লুকানোর মত।

থানাটার সামনে ভ্যানটাকে দাঁড় করাতে বললাম আমি। সামনের লোকটা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। খুব নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'খুব দরকার আছে ভাই?'

আমি চুপচাপ মাথা নাড়লাম। ভ্যান থামল। দরজা খুলে নেমে সোজা থানায় চলে এলাম। দুটো সেপাই বসে গল্প করছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওসি কোথায়?'

'বড়বাবু এখন কোয়াটার্সে। মেজবাবু আছেন, ভেতরে যান।'

দ্বিতীয় জন জিজ্ঞাসা করল, 'কি কেন?'

আমি উত্তর না দিয়ে ভেতরের ঘর ঢুকে দেখলাম একটা লোক গেঞ্জি গায়ে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে ঘুমাচ্ছে। এই লোকটাই কি মেজবাবু? আমি পেপার ওয়েট তুলে শব্দ করতে মেজবাবুর ঘুম ভাঙ্গল। চোখ তুলে পা না নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?'

'একটু আগে ময়দানে একটা মার্ডার হয়েছে।'

'কোথায়?'

'ময়দানে। লোকটাকে গুলি করে মারা হয়েছে। আমি নিজের চোখে—।'

হাত তুলে থামতে বললেন মেজবাবু, 'ময়দান আমাদের জুরিসডিকসন নয়। যত্তসব ঝুট ঝমেলা। এই এলাকায় খুন হলে আসবেন। যান।'

'দেখুন, যারা খুন করেছে তারা থানার বাইরে গাড়িতে বসে আছে।'

'এ্যা?'

'হ্যাঁ। আপনি এখনই ওদের এ্যারেস্ট করুন।'

'ইয়ার্কি মারছেন? ময়দানে খুন করে কেউ আমার থানার সামনে এসে অপেক্ষা করবে ধরা দেওয়ার জন্যে। রাতবিরেতে ইয়ার্কি মারছেন?'

'বেশ চলুন। ওদের সঙ্গে রিভলার আছে কিন্তু।'

রিভলবার শব্দটায় কাজ হল। মেজবাবু লাফিয়ে উঠে হাঁকাহাঁকি করতে লাগলেন মিনিট দুয়েকের মধ্যে রণসাজে সজ্জিত হয়ে বাইরে বার হওয়া মাত্র মারুতিটা সোঁ ক. বেরিয়ে গেল সামনে থেকে। ধর ধর করেও তার নাগাল পাওয়া গেল না আমার ে দেখে বোধহয় আগেই ইঞ্জিন চালু করে রেখেছিল।

মেজবাবু মিলিয়ে যাওয়া গাড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই গাড়িতে কজন ছিল বলুন তো?'

'ড্রাইভারকে নিয়ে চারজন।'

'হুম। গাড়ির নাম্বারটা নোট করেছেন?'

মনে করতে পারলাম না। গাড়িতে ওঠার সময় সন্দেহ হয়নি, তাই নাম্বার দেখিনি। গাড়িতে বসে থাকার সময় তো নাম্বার দেখার সুযোগ নেই। আর এখানে নামার সময় যদি আমি নাম্বার দেখতে যেতাম তাহলে ওরা আমাকেই সন্দেহ করত।

'না। আমি দেখিনি।'

'তাহলে কি দেখেছেন? আসুন।' সদলবলে মেজবাবু থানায় ঢুকে গেলেন।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম থানায় গেলে আর কোন কাজের কাজ হবে না, উল্টে আমাকে ঝামেলায় ফেলবে ওরা। অথচ লোকটার গাফিলতিতে খুনিরা ধরা পড়ল না, আমি ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগলাম। বাঁ দিকের গলি দিয়ে গেলে পাড়ায় সর্টকাটে পৌঁছানো যায়। সেটাই ধরলাম। ময়দানে মৃতদেহ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তখন টনক পড়বে মেজবাবুর। কৃতিত্ব দেখানোর জন্যে তিনি আমাকে লালবাজারে পাঠাবেন। আর সেখানে পুলিশ আমাকে জেরা করে জেরবার করে ছাড়বে। অপরিচিত লোকের গাড়িতে কেন আমি উঠলাম? অত রাত্রে ভবানীপুরের ফুটপাতে কেন দাঁড়িয়েছিলাম? কোথায় গিয়েছিলাম তার আগে? ওরা যখন কাউকে খুন করবেই আমাকে কেন সাক্ষী হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে দিয়ে খুন করানোর গল্প যদি সত্যি হয় তাহলে সেটা করল না কেন? তার ওপর ওই লোকগুলোর পরিচয় কি? বাপের নাম শুনে যদি ভয় পেয়ে থাকে তাহলে আমার বাপ নিশ্চয়ই তাদের চেনে। এসব প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দিলেও ওরা খুশি হবে না অথচ খুনীদের ধরার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম এটুকুই আমার সান্ত্বনা মেজবাবু আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি আমাকে চেনেনওনা। তাই আমার কাছে পৌঁছবার কোন রাস্তা ওঁর কাছে খোলা নেই।

বাড়ির সামনে যখন পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে তিনটে। পাড়া নিঝুম। বাড়িতে একটাও আলো জ্বলছে না। ভাগ্যিস আমার ঘরের একটা দরজা রাস্তার দিকে আর সেটাও তালা দিয়ে আমি বের হই। তালা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। জামাকাপড় খুলে পাজামা পরে শুয়ে পরলাম অন্ধকারেই। বাথরুমে গেলে আলো জ্বালতে হবে। সেইটে চাইলাম না।

ঘুম ভাঙ্গল বেশ বেলায়। ভাঙ্গালো ছোটভাই। 'বাবা তোকে ডাকছে।'

বুঝলাম ঝড় উঠবে। কি আর হবে? চলে যেতে বলবেন বড়জোর। ধীরে সুস্থে বাথরুম সেরে দাঁত মেজে খবর নিলাম, এ বাড়ির চায়ের পাট শেষ হয়ে গেছে। এখন

রান্নার সময়। চা পাওয়া যাবে না। জামাপ্যান্ট পরে বাপের ঘরে ঢুকলাম। ঘরে তখন বাপ ছাড়া যে লোকটি বসে আছে তাকে দেখেই চিনতে পারলাম, মহিম গুপ্ত।

বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?'

'আমার এক সহপাঠিনীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফিরতে রাত হয়েছিল।'

'সেটা আমি জানি। মেয়েটি মাঝরাতে ফোনে জিজ্ঞাসা করেছিল তুমি বাড়ি ফিরেছ কিনা। তারপর? তারপর কোথায় গিয়েছিলে?'

'কোথাও যাইনি। আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা মারুতি ভ্যানে মিথ্যে কথা বলে আমাকে তুলে নেওয়া হয়।'

'তোমাকে মিথ্যে কথা বলে তুলল আর তুমি গেলে? বাচ্চা ছেলে নাকি? যদি ওরা তোমাকে দিয়ে খুন করাতো? পারতে সারাজীবন এই দায় থেকে নিজেকে বাঁচাতে? ছি ছি। তোমার আর কবে কাণ্ডজ্ঞান হবে বলতো? ওদের কাছে প্রথমে মহিমের নাম করেছ। মহিমকে তুমি চিনলে কি করে?' বাপ গলার স্বর পাল্টালেন।

'আপনার কাছে আসতে দেখেছি।'

'আমার কাছে তো হাজারটা লোক আসে। হোয়াই মহিম?'

'আমার মনে হয়েছিল উনি ক্ষমতাবান লোক।'

'মহিম তিলজলায় থাকে তা জানলে কি করে?'

'খবরের কাগজে পড়েছি।'

মহিম গুপ্ত চুপচাপ শুনছিল। এবার হাত নাড়ল, 'ঠিক আছে দাদা। আপনি রাগ করবেন না। আমর নাম বলেছিল বলে প্রাণে বেঁচে গেছে। ওসব লোক খুব খতরনাক। তারপর আপনার ছেলে শুনে ভদ্রতা করে পৌঁছাতে এসেছিল কিন্তু তখনই উনি বেইমানি করে ফেললেন বলে ওরা বলছে। থানার বাইরে দাঁড় করিয়ে উনি ভেতরে গিয়েছিলেন পুলিশকে খবর দিতে। ঠিক তো?' এই প্রশ্নটা আমার উদ্দেশ্যে।

'হ্যাঁ। আমি মনে করি খুনীদের শাস্তি হওয়া উচিত।'

'ঠিক কথা। কিন্তু ওরা আপনার জান বাঁচাল, বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছিল সেটা আপনি ভুলে গেলেন কেন? এটা কি ঠিক কাজ?'

বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি পুলিশকে ঠিক কি বলেছ?'

'বলেছি ওরা ময়দানে একজনকে আমার সামনে গুলি করে মেরেছে। কিন্তু মেজবাবু বললেন ময়দান নাকি তাঁর এলাকায় পড়ে না। তারপর যখন উঠলেন তখন ওরা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।'

'বাঃ। নাম ধাম বলেছ? মহিমের নাম?'

'না। কিছুই বলিনি।'

মহিম গুপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ির নাম্বার?'

'নাম্বার আমি নিজেই দেখিনি তো বলব কি করে?'

মহিম গুপ্তকে এবার একটু সহজ দেখাল। বলল, 'ওটা ওদের পলিটিক্যাল ব্যাপার ভাই। রোজ গ্রামে গঞ্জে রাজনৈতিক সংঘর্ষে কত মানুষ মারা যাচ্ছে, কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। এটা ঠিক যুদ্ধের মত। যুদ্ধে শত্রুকে মারলে তাকে খুন বলা হয় না। আপনি

www.boiRboi.blogspot.com

একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তবে ওরা ভেবেছিল আপনি আমার নাম আর গাড়ির নাম্বার পুলিশকে দিয়েছেন। তা যখন দেননি তখন ওদের বুঝিয়ে বলব মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। এসব নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আপন কতবড় লোকের ছেলে। দাদার একটা আলাদা ইজ্জত আছে। যান।'

আমি ফিরে যাচ্ছিলাম বাপ বলল, 'শোন। তোমার ওই সহপাঠিনীর নামটা কি যেন? আমার মনে পড়ছে না!'

'হেনা।'

'হ্যাঁ। হেনা আমার বড়মাসীর নাম হেনা ছিল। যাক গে, মেয়েটিকে বেশ বুদ্ধিমতী মনে হল। কোথায় আছে, মানে কি করে?'

'চাকরি করে।'

'কোথায়?'

'আমি জানি না। মনে হয় কোন বড় কোম্পানিতে।'

'সহপাঠিনীর বাড়িতে মাঝরাত পর্যন্ত আড্ডা মারো অথচ সে কি করে তার খোঁজ রাখো না। ওয়ার্থলেশ। মেয়েটি আমাকে বলেছে সে-ও চায় তুমি ব্যবসায় ঢোক। আর সেটা করতে গেলে এন আর আইদের অফারটা নেওয়া উচিত। একথা সে বলেছে। বুঝলাম তোমার মত বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকার মেয়ে সে নয়। একদিন আসতে বলবে, ওর সঙ্গে কথা বলে আমার ভাল লেগেছে।' বাপ ইশারা করলেন চলে যেতে।

'সেটা সম্ভব নয়।' না বলে পারলাম না।

'কেন?' তিনি তাকালেন।

'আমার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। ইনফ্যাক্ট একবছর ধরে নেই। কাল সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল। আমাকে ওর উদ্ভট বল মনে হয়।'

'সত্যি? একথা বলেছে সে? ঠিক কথা বলেছে। তোমার মত উদ্ভট লোকের সঙ্গে কোন ভদ্রলোক সম্পর্ক রাখতে পারে না। মেয়েটার ওপর শ্রদ্ধা আমার আরও বেড়ে গেল। শোন, ওসব পাগলামি ছাড়ো। রোমে থাকতে হলে রোমান হওয়া উচিত।'

'তার মানে আপনার কাছে ওই আলমারির বইগুলো মিথ্যে?'

'না। কখনই না। আমার মা চণ্ডীপাঠ করতেন গীতা পড়তেন। কিন্তু তাই বলে সংসার করতে তাঁর কখনও অসুবিধা হয়নি। যাও।'

বেরিয়ে এলাম। পাড়ার চায়ের দোকানে ঢুকে চা বলে কাগজটার একটা পাতা তুলে নিলাম। এই ব্যাখ্যা বেশ লাগসই। চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ করলেই যেমন সন্ন্যাসী হয়ে যায় না কেউ তেমনই কার্ল মার্কস লেনিন পড়লেই সেই আমলের কম্যুনিস্ট হতে হবে তার কোন মানে নেই। গীতা পড়েও যেমন লোক সংসারের প্যাঁচ পয়জারে অভ্যস্ত থাকে তেমনি ক্যাপিটাল পড়েও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া উচিত।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজের একটা খবরে চোখ আটকালো। মন্ত্রীর সঙ্গে তার সেক্রেটারির বিরোধ লেগেছে আলুর দাম বাঁধা নিয়ে। সেক্রেটারি পরিষ্কার বলেছেন মন্ত্রীর দুর্নীতির কারণেই আলুর দাম বাড়ছে এবং জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এত স্পষ্ট কথা বলা সত্ত্বেও সেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বছর পাঁচেক আগে

হলে এরকম খবর পেলে খুব চিঠি দিতাম। আমি এখনও মনে করি আমাদের মত সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হল খবরের কাগজ। খবরের কাগজ সেটা যদি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র না হয় তাহলে সেখানে মানুষ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে। দশটা চিঠির একটা ছাপা হয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। যার উদ্দেশ্যে চিঠি তিনি গ্রাহ্য করেননি। আমি শেষবার যে চিঠি লিখেছিলাম তাতে প্রশ্ন তুলেছিলাম গত আঠারো বছরে পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে উঁচু মাঝারি এবং নিচু তলার নেতাদের সম্পত্তির পরিমাণ কি ছিল এবং এখন কি হয়েছে তার একটা পরিসংখ্যান নেওয়া হোক। যদি কেউ ঠিকঠাক আয়ের উৎস না দেখাতে পারেন তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক পার্টি।

কিন্তু সেই চিঠি ছাপা হলেও কোন কাজ হয়নি। আমার চিঠি তো সামান্য, লক্ষ্য করেছি, আজ যা খবরের কাগজের হেডলাইন, খবর হিসেবে দারুণ চাঞ্চল্য তুলল, পরশু সেটা লোকে ভুলে যাচ্ছে, খবরের কাগজও নতুন খবরে উৎসাহী। সরকারও জেনে গিয়েছে, কোনমতে দিন সাতেক কাটিয়ে দিতে পারলেই সমস্যাটা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাবে না। মনে পড়ছে দেবশ্রী রায়চৌধুরীর কথা। মেয়েটি যখন উধাও হয়ে গেল প্রতিটি খবরের কাগজে তাকে নিয়ে কত লেখালেখি। যে করেই হোক মেয়েটিকে খুঁজে বের করতেই হবে। শেষপর্যন্ত সে তার প্রেমিকের সঙ্গে ধরা পড়ল। কিন্তু পুলিশের অসাবধানতায় তারা পালিয়ে গেল ট্রেন থেকে। আর তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না। দেবশ্রীর বাবা হন্যে হয়ে মেয়েকে খুঁজে শেষ পর্যন্ত হাওড়ার এক হোটেলে খুন হয়ে গেলেন। সেই দেবশ্রী আজও নিখোঁজ। আর কোন খবরের কাগজে ওকে নিয়ে কোন লেখা বের হয় না। কেউ ওর খোঁজে এখন সময় দিচ্ছে বলে জানা নেই।

চা শেষ করে একটা টাকা দিয়ে সোজা কলেজ স্ট্রিটে চলে এলাম। তখন সবে অফিস খুলছে। নিজের টেবিলে যাওয়া মাত্র বেয়ারা বলল, প্রকাশ আমাকে ডাকছেন। গেলাম। ভদ্রলোক একটা ক্লাসিক ধরিয়ে বললে, 'শোন, আজ থেকে তোমাকে আর প্রুফ দেখতে হবে না।'

'কেন?' আর একটা খারাপ খবর শোনার জন্যে তৈরি হলাম।

'সুভদ্রার কাছে তোমার কথা সব শুনলাম। তুমি যে আমার এখানে আটশো টাকার বিনিময়ে প্রুফ দ্যাখো একথাটা ওকে বলতে পারিনি। অতএব যা আমি বলতে পারিনি তা তোমাকে করতে দিতে পারি না। অন্তত আমার এখানে। বুঝতে পেরেছ?' প্রকাশক জিজ্ঞাসা করলেন।

'পরিষ্কার।' নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা করলাম।

'কিন্তু তুমি এডিটিং-এর কাজটা করতে পার।'

'এডিটিং না বলে রিরাইটিং বলুন। অন্যের হয়ে লিখে দিতে হবে। না। আমি ভেবে দেখলাম এরকম কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

'এমন ভাব দেখাচ্ছ যে তুমি স্বচ্ছন্দে পাতার পর পাতা চমৎকার উপন্যাস লিখে ফেলবে আর পাঠকরা সেটা স্বজনের উপন্যাস ভেবে লুফে নেবে?'

'সেই ঝুঁকি তো আপনি নিচ্ছেনই। আচ্ছা, তাহলে চলি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বসো। তুমি এমন নীতিবাগীশ কেন হে?'

'কি করব বলুন। হয়ে গেছি।'

'আচ্ছা ধর, তোমার খুব প্রিয়জনের মারাত্মক এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। এখনই রক্ত দরকার। অথচ তার গ্রুপের রক্ত কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এই সময় দালাল এসে প্রস্তাব দিল বেশি টাকা দিলে সে যোগাড় করে দিতে পারে। যেহেতু তখনই রক্ত না দিলে তোমার প্রিয়জন বাঁচবে না তুমি কি করবে? তাকে মেরে ফেলবে তোমার নীতির জন্যে?' প্রশ্নটি করে প্রকাশক আমার দিকে স্থির চোখে তাকালেন।

'আপনি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা বলছেন।'

'না। ওই এ্যাকসিডেন্টের পেশেন্ট আর সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। এখন যা অবস্থা বেঁচে থাকা মানেই যুদ্ধ করা। আর এই যুদ্ধে ন্যায়নীতি নিয়ে যত কম মাথা ঘামাবে তত তুমি সুবিধে পাবে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন? উপন্যাসটা রিরাইট করা উচিত?'

'তুমি যেতে পার।'

বেরিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে এটাকে আর নিজের চেয়ার বলে ভাবতে পারব না। এইসময় ম্যানেজার ভদ্রলোক আমার সামনে এলেন, 'ভাই বিপ্লব। অত্যন্ত বিপদে পড়েছি। আমাকে সাহায্য করতে পার?'

ওঁর দিকে তাকালাম। এইরকম কথা কখনও ওঁর মুখে শুনিনি।

'তোমার বউদি এ্যানিমিক, শরীরে রক্ত কম। চিকিৎসা চলছিল। কদিন আগে জানতে পারলাম ব্লাড ক্যানসার। বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার। আমার মত গরীব মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব তা করছি। কিন্তু আরও টাকা দরকার।' ভদ্রলোক করুণ গলায় বললেন।

'সর্বনাশ। কিন্তু ওঁকে বাঁচাতে তো হবে। অফিস থেকে টাকা চেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। স্যারকে বলেছি। শুনেই উনি কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছেন। বিনা সুদে এরকম ধার কেউ দেবে না। এত টাকা আমি রিটায়ার করলেও পাব না। উনি বলেছেন, আগে স্ত্রীকে বাঁচান, টাকা শোধ করার কথা পরে ভাববেন। উনি আমার কাছে দেবতা। কিন্তু আরও দশহাজার দরকার। ওঁর কাছে চাইতে সঙ্কোচ হচ্ছে। তুমি যদি টাকাটা যোগাড় করে দাও তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব ভাই।'

'দশ হাজার টাকা?'

'হ্যাঁ। ডাক্তার তাই বলেছেন। আমার অবস্থা দেখে খুব কম করে বলেছেন।'

আমার মাথায় ঢুকছিল না কিছু। দশ হাজার টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। অথচ ওই টাকা না দিলে ভদ্রলোকের স্ত্রীকে বাঁচানো মুশকিল হবে। আমি এম.এ. পাশ করা এক আদর্শবান মানুষ অথচ দশ হাজার টাকা সঞ্চয় নেই, যোগাড় করে দেবার ক্ষমতা নেই 'বিপ্লব।'

ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। কি বলি? নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল। যদি মানুষের উপকারে না আসতে পারি তাহলে বেঁচে থাকার মানে কি?

'তোমার ওপর খুব ভরসা করে আছি। একটু দ্যাখো ভাই।'

'দেখছি।'

উনি নিজের জায়গায় চলে যেতেই কয়েকটা ভাবনা ভেবে ফেললাম। বাপকে বললে হয়তো টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি কারণে নিচ্ছি জানলে তিনি দেবেন না। যে টাকা ফেরৎ পাওয়া যবে বলে মনে হয় না সেই টাকা উনি বের করবেন না। আর যদি বা দেন অনেক শর্ত আরোপ করবেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে না হয় আমার সব আদর্শ এক্ষেত্রে ভুলে থাকলাম। দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা মনে করতে চাইলাম যে ধার দিতে পারে। অবশ্য ধার নিয়ে কবে শোধ করব সেটা আমিই জানি না। সঙ্গে সঙ্গে হেনার মুখ মনে পড়ল। হেনা ইচ্ছে করলে দিতে পারে। কখনও ওর কাছে আমি একটা টাকাও চাইনি। হেনা আমাকে কি শর্ত দেবে? একটু ভাবলাম। তারপর সোজা প্রকাশকের ঘরে চলে গেলাম। ভদ্রলোক কিছু লিখছিলেন, অবাক হয়ে তাকালেন।

'ঠিক আছে, কাজটা আমি করব।'

'গুড। সুমতি হয়েছে বলে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু তার জন্যে আমাকে অ্যাডভান্স দিতে হবে।'

'অ্যাডভান্স? কাজটা কেমন হল না দেখে কি টাকা দেওয়া যায়?'

'সেটা আপনার সমস্যা। কিন্তু আমার অ্যাডভান্স চাই।'

'হুম। কত?'

'দশ হাজার।'

'পাগল নাকি। চল্লিশ টাকা দামের বই একটা এডিসন হলে লেখকই অত টাকা পাবে না। কি বলছ ভেবে বল। তোমাকে একটা কমিশন দেব ঠিকই সেটা কি দাঁড়াবে তা বিক্রির ওপর নির্ভর করছে।' প্রাকশক সরাসরি বলে দিলেন।

'কিন্তু ওঁর বই তো বছরে অন্তত পাঁচটা এডিসন হয়।'

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন, 'হঠাৎ টাকার দরকার পড়ল কেন।'

কারণটা বলতে গিয়ে সামলে নিলাম। ওটা বললে নিজের দর বাড়ানো হবে। আমি যে কত মহৎ, মানুষের উপকার করি, এটা বলতে ভাল লাগবে না। তাছাড়া ওই ম্যানেজারবাবুকেও জড়ানো হবে। আমি যা করি না, সেই মিথ্যে কথাই বললাম, 'আমার দরকার আছে।'

'ঠিক আছে। দিচ্ছি। কিন্তু দশ দিনের মধ্যে পুরো পাণ্ডুলিপি চাই।' প্রকাশক চেক বই খুলে লিখতে লাগলেন। বললাম, 'এ্যাকাউন্ট পেয়ি করবেন না।'

'মামার বাড়ি নাকি? অডিটার আমার মামা?'

'টাকাটা আজই দরকার।'

'উঃ।' ভদ্রলোক চেকটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। না, আমার কথা রেখেছেন উনি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা ম্যানেজারবাবুর সামনে গিয়ে চেকটা রাখলাম, 'এটা ক্যাশ করে নেবেন। আপনাকে তো ব্যাঙ্কে যেতেই হয়।'

চেক দেখে ওঁর চোখ বড় হল, 'সে কি? স্যারের চেক? উনি—উনি!'

'ওঁকে আপনার কথা আমি কিছুই বলিনি। টাকা যে আপনার দরকার তা ওঁকে কেন বলতে যাব? এখন চেষ্টা করুন, যাতে আপনার স্ত্রী সুস্থ হয়ে ওঠেন।' আমি সরে এলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

টেবিলে বসেও দেখলাম ভদ্রলোক এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বের করলাম। এখন আমি কাজটা করতে বাধ্য। যে কাজের জন্যে টাকা নিয়েছি সেটা নেবার আগে মনে হয়েছিল খুব সহজবোধ্য। এখন কি রকম ভয় করতে লাগল। যদি খারাপ হয়। যদি আমার কলম ছোঁয়ানোর কারণে এই বই তেমন বিক্রি না হয়?

প্রথম পাতাটা আবার পড়লাম। এবার মনে হল ভুলটুল যাই থাকুক না কেন প্রত্যেক লেখকের যেমন নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে স্বজনবাবুরও কিছু আছে। মাঝে মাঝেই আবেগের টোকা দিতে তিনি খুবই পটু। প্রথমবার লিখতে গিয়ে বুঝতে পারলাম কোন লেখা পড়ে সমালোচনা করা অথবা সহজেই লেখা যায় বলে মনে হওয়া এক জিনিস আর সেটা কাগজে কলমে লেখা আর এক জিনিস। দেখে দেখে লিখছি। শুধু মাঝে মাঝে বাক্য পাল্টাচ্ছি কিন্তু তাতেই প্রচুর সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে চললে দশ দিন কেন দশ মাসেও কাজটা করা যাবে না।

বিকেলবেলায় বের হলাম। সারাদিনে বুঝে গিয়েছি একমাত্র বানান ঠিক করা আর ছেটিখাটো শব্দ জোড়া ছাড়া আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের সাফল্যের পেছনে অনুশীলন করা প্রয়োজন, যে কখনও সাইকেল চালায়নি তাকে সাইকেল দিয়ে চালাতে বললে সে কিছুতেই সক্ষম হবে না। লেখার ক্ষেত্রে আরও কিছু বাড়তি ক্ষমতা দরকার। স্বজন মুখার্জি যত খারাপই লিখুন না কেন সেটারও পেছনে তাঁর দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় রয়েছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অতএব হার স্বীকার করতেই হবে। আর তা করলে দশ হাজার টাকা ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু আমি দশ হাজার টাকা কোথায় পাব? বাবার কাছে যাওয়ার বদলে—।

হেনার ফ্ল্যাটের সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন সাতটা বেজে গিয়েছে। বেল টিপলাম। দরজা খুলল না। হেনা কি তাহলে এখনও ফেরেনি? দ্বিতীয়বার একটু ধরে রাখলাম বোতামটা।

ঝট করে দরজা খুলে গেল। মাথায় তোয়ালে মোড়া, পরনে হাউসকোট, মুখে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি নিয়ে হেনা দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার? আবার?'

প্রশ্ন দুটো এমনভাবে করল সে যে আমার মনে হল ফিরে যাওয়া উচিত।

'প্রয়োজন আছে।'

'কি প্রয়োজন? কেন তুমি এভাবে আমাকে বিরক্ত করতে আসো?'

'আমি আর বিরক্ত করব না।'

'কিসে মানুষ বিরক্ত হয় সে জ্ঞান তোমার আছে?' সরে দাঁড়াল সে, 'যা বলবার তাড়াতাড়ি বল। আমাকে আবার বেরুতে হবে।'

ঘরে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ করে সে তোয়ালে খুলে চুল মুছতে লাগল। বুঝতে পারলাম এতক্ষণ বাথরুমে ছিল। ওর কানের পাশের চুলে এখনও জল লেগে আছে। জলের ফোঁটা মুক্তোর মত ঝুলছে। আলো পড়ায় সেটাকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছিল। হঠাৎ আমি

তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম। ওই জলের ফোঁটাকে স্পর্শ করতে খুব ইচ্ছে হল। হেনাকে এখন কী দারুণ টাটকা লাগছে, এই রাগ বা বিরক্তি ওই শরীরের সঙ্গে মানাচ্ছে না।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত হেনার দিকে এগোলাম।

হেনা খুব অবাক হয়ে শুধু বলতে পারল, 'আরে!'

কিন্তু আমি ততক্ষণে সেই মুক্তোর ফোঁটা ছুঁয়ে ফেলেছি। ছোঁয়ামাত্র আমার আঙুল ভিজে গেল। মুক্তো নেই? হেনা চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চাইল আমি কি করছি। ওর গালে আমার আঙুল লাগাতেই শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আমি দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানলাম। হেনার শরীর প্রতিবাদ করতেই ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলাম।

চুম্বনের স্বাদ কিরকম হয় আমার জানা ছিল না। ওই মুহূর্তে স্বাদের কথা চিন্তাও করতে পারলাম না। আসলে কোন চিন্তা করার মত মাথার অবস্থা আমার ছিল না। হেনার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আমি পৃথিবীটাই ভুলে গেলাম। আমি তখন অসাড়। আর সেই মুহূর্তে সাড়া দিল হেনা। ওর জিভের ডগায় এক নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে গেল। হেনার হাতের বাঁধন আরও শক্ত হল। শেষপর্যন্ত ও মুখ নামিয়ে আমার বুকে মাথা রাখল। আমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

হঠাৎ এক পা সরে দাঁড়িয়ে এক রাশ বিস্ময় মুখে হেনা জিজ্ঞাসা করল, 'একি হল? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? তুমি বিপ্লব তো?'

আমি নিশ্বাস ফেললাম। হাসবার চেষ্টা করলাম।

'তোমার মাথা ঠিক আছে তো?' ঘাড় কাৎ করল হেনা।

'তোমাকে এখন দারুণ দেখাচ্ছে।' কোন রকমে বলতে পারলাম আমি।

'কিন্তু এ তুমি কি করলে?'

'আমি—আমি।' কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'এতদিন আসছ, মনে হত ভাল হয়তো বাসো কিন্তু কখনও সীমা ছাড়াওনি। মনে মনে তোমাকে আমি আর পাঁচটা মানুষের থেকে আলাদা বলে ভাবতাম। কিন্তু একি করলে?'

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। তখনও আমার নিশ্বাস স্বাভাবিক নয়, সমস্ত মনে এক লক্ষ অশ্বারোহীর দৌড়ে যাওয়ার চাপ।

'তুমি কি জানো আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে চুমু খায়নি?'

'জানি।'

'জানো? কি করে?'

'ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

'আচ্ছা! নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা ছিল যে আমার স্বামী হবে শুধু তাকেই এই অধিকার দেব। কিন্তু তুমি শেষ পর্যন্ত জোর করে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গালে?'

'প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে কেন?'

'কেন? কি ভেবেছ তুমি। আজ সাত আট বছর ধরে তুমি যাওয়া আসা করেছ। আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছ কিন্তু কখনও স্পর্শ করোনি। ক্রমশ আমার মনে হয়েছিল তুমি সাধারণ সহজ নও। কিন্তু আমি তো মেয়ে। আমি সব সময় চাইব যে আমার প্রেমিক হবে

www.boiRboi.blogspot.com

আমার স্বামী হবে সে সহজ থাকবে। তার ওপর ওই আদর্শের বাসি ভূত যা আজকের যুগে অচল তা তোমার ঘাড়ে এমন ভাবে জেঁকে বসেছে যে আমার পক্ষে মানিয়ে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমার অপছন্দ তুমি জানো। তা সত্ত্বেও তুমি আজ জোর করে এই কাণ্ড করলে। তারপরও বলছ, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে হবে কেন?'

'আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে?'

'অবশ্যই। এই তোমাকে বিয়ে আমি কখনই করতে পারি না। আত্মহত্যা করার শখ আমার নেই।'

'আত্মহত্যা?'

'নয়তো কি? স্ত্রীর দায়িত্ব তুমি নিতে পারবে?'

'চেষ্টা করব!'

'কিভাবে? কটা টাকা রোজগার কর তুমি? তোমার ওই আদর্শ বাধ্য করবে তোমাকে আধপেটা খেয়ে থাকতে। ঝুপড়িতে থাকা মানুষের শান্তিটুকুও আমি পাব না। অথচ তুমি শিক্ষিত, রবীন্দ্রনাথ থেকে সেক্সপীয়র পড়া মানুষ। কিন্তু কতটুকু তোমার দাম?'

'কিন্তু আমি যদি বাবার প্রস্তাব অ্যাকসেপ্ট করি?'

'তার মানে?'

'ওই এন আর আইদের সঙ্গে ব্যবসায় নামি?'

'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ?'

'একদম না। আমি সিরিয়াস।'

'তোমার বাবার সুপারিশ নিতে লজ্জা করবে না?'

'করবে। কিন্তু আজ আমার অন্য উপলব্ধি হয়েছে।'

'কি রকম?'

'একজন পরিচিত মানুষ তাঁর স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে আমার কাছে দশ হাজার টাকা চেয়েছিলেন। আমি প্রথমে ভেবেই পাইনি কি করে দেব? সামান্য দশ হাজার টাকা। শেষে যে প্রকাশনা সংস্থায় প্রুফ দেখি তার মালিকের কাছে টাকটা চাইলাম । তিনি আগে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটি পাণ্ডুলিপিকে রিরাইট করে দিল কিছু কমিশন দেবেন। বইটার কোথাও আমার নাম ছাপা হবে না। আমি প্রথমে রাজি হইনি। পুরো ব্যাপারটা শুধু বেআইনি নয়, অনৈতিকও। কিন্তু দশ হাজার টাকা আগাম নিয়ে শেষপর্যন্ত সম্মতি দিতে বাধ্য হলাম। অথচ কাজটা করতে গিয়ে দেখলাম আমি পারছি না। আদর্শের দোহাই দিয়ে সরে দাঁড়ানো এক কথা আর কাজে নেমে নিজের অক্ষমতা আবিষ্কার করা অন্য কথা। শেষেরটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক। আর কাজটা না করতে পারলে দশ হাজার টাকা শোধ করব কি করে তাও বুঝতে পারছি না। আমি আর কিছুর সঙ্গেই তাল রাখতে পারছি না হেনা।'

'অদ্ভুত তো। একজন পরিচিত লোক দশ হাজার চাইল আর তুমি ধার করে সেটা দিয়ে দিলে? ভদ্রলোক ফেরৎ দেবেন কবে?'

'আমি জানি না। জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ উনি উত্তরটা দিতে পারতেন না।'

'চমৎকার। কিন্তু লিখতে গিয়ে যেমন আবিষ্কার করলে লেখাটা তোমার পক্ষে সহজ

ব্যাপার নয় তেমনি ঘটনাটা তো ব্যবসার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে!'

'তার মানে?'

'তুমি জীবনে কখনও ব্যবসা করোনি? এন আর আইরা যে ব্যবসা করতে চাইছেন তার সম্পর্কে কোন ধারণাই তোমার নেই। তুমি কি করে ভাবছ দুম করে সেই ব্যাবসায় নেমে রাতারাতি সফল হবে? কোন ট্রেনিং বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই সাফল্য আসবে? একি ছেলের হাতের মোয়া? আমি কি বলছি বুঝতে পারছ?' হেনা কাছে চলে এল।

'পারছি। কিন্তু তা হলে কোনদিনই কিছু করা সম্ভব নয়। হেনা আমি তোমার সাহায্য চাই।'

'কিরকম'?

'আমাকে মানসিক শক্তি দাও।'

'ওটা কেউ কাউকে দিতে পারে না। নিজেকে অর্জন করতে হয়।' হেনা ঘুরে দেওয়াল-ঘড়ি দেখল, ইস। কী দেরি হয়ে গেল আমি যে—!'

'যেতেই হবে?'

'মানে?'

'না গেলেই নয়। বসো না। তোমার সঙ্গে গল্প করি।'

হেনার মুখের চেহারা বদলে গেল। এরকম লাজুক মুখ কখনও দেখিনি আমি। আমি ওর হাত স্পর্শ করলাম। হেনা মুখ ফেরাল, 'বসো। আমি কিছু খাবার তৈরি করি। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ খাওনি তুমি।' সে হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল ভেতরে।

কিরকম সহজে হয়ে গেল পৃথিবীটা। আমার চারপাশের ঘনিষ্ঠ মানুষজন চাইছে তাদের কাছে যেটা স্বাভাবিক সেই ব্যবহারটা আমি করি। আমি যদি কেরানিগিরি করি তাহলে ঘুম থেকে উঠে কেরাসিনের লাইনে না দাঁড়িয়ে দুনম্বরী করে কেরাসিন নিয়ে আসি বাড়তি ক্যানে। বাজারে গিয়ে চোটপাট করে দাম কমাই। বাড়ি ফিরে এসে ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসে বিদ্যাসাগর নেতাজীর আদর্শের কথা বলি। ট্রামে বাসে এর ওর পা মাড়িয়ে সম্ভব হলে কন্ডাক্টরকে ফাঁকি দিয়ে অফিসে যাই এগারটা নাগাদ। লেট কেন হল এই প্রশ্নের জবাবে চিৎকার করে বড়বাবুর পিলে চমকে দিই, আগে ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা ঠিক করতে বলুন সরকারকে তারপর ঠিক সময়ে এ্যাটেনডেন্স চাইবেন? তারপর খবরের কাগজ বা পার্টির মুখপত্র খুলে বসি টেবিলে। সেকসনের অন্যদের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ নিই। টিফিনের সময় দলের সঙ্গে ঘরে ঘরে ইউনিয়নের ইস্যুগুলো প্রচার করি। বিকেলে মিছিলে যাওয়ার আগে সেকসন থেকে দিনের প্রাপ্য উপরির অংশটুকু নিতে যেন না ভুলি। কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও বলতে বলতে একসময় মিছিল থেকে সটকে পড়ে বাড়ি ফিরে এসে বউ-এর শাড়ির ভাঁজে উপরির টাকা গুঁজে রাখি। তারপর ছেলেমেয়েদের গল্প শোনাই কীভাবে হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম দেশের জন্যে ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এও বলতে হবে আগে পড়াশুনা শেষ করে ভাল চাকরি যাতে পাও সেই চেষ্টা কর।

আর যদি কেরানি না হয়ে ওপরতলার চাকুরে অথবা বড় ব্যবসায়ী হই তাহলে

www.boiRboi.blogspot.com

জীবনে অন্য খাতে বইয়ে দেবার নামই স্বাভাবিক হওয়া। সকালে উঠে চা খেয়ে টয়লেটে ঢোকা। স্নান শেষ করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্ত্রীকে আদর করে গাড়িতে উঠে বসতে হবে যেটা আমাকে অফিসে পৌঁছে দেবে ন'টার মধ্যে। সেখানে সারাদিন নানান সমস্যার সমাধান করে এম ডি-কে তুষ্ট করা আমার কর্তব্য হবে। এর মধ্যে কনফারেন্স আর মিটিং, লাঞ্চের সময় ধান্দাবাজি এসব তো আছেই। অফিসের পর বাড়ি ফিরেই বউকে নিয়ে পার্টিতে যেতে হবে। নিজের বউকে অন্য লোকের সঙ্গে গল্প করার সুযোগ দিয়ে অন্যের বউ-এর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে করতে মদ গিলতে হবে পাঁচ সাত পেগ। তারপর স্খলিত পায়ে বাড়ি ফিরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ার নাম জীবনযাপন, সহজ এবং স্বাভাবিক।

হ্যাঁ। আমাকেও স্রোতে ভাসতে হবে। স্রোতের উল্টোদিকে সাঁতার কাটলে বেশিক্ষণ ভেসে থাকা যে যায় না তা এতদিনে টের পেয়েছি। আমি যেমন হেনাকে হারাতে চাই না তেমনি নিজের কাছেও হারতে চাই না। রাত দশটা নাগাদ হেনার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছিলাম। একটু আগে হেনা বাপকে ফোন করেছিল। বাপ না বলে এখন আমার বাবা বলা উচিত। সব শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। হেনাকে নাকি বাড়িতে যেতে বলেছেন। বলেছেন, 'তোমার জন্যে মা আমি বুড়ো বয়সে শান্তি পেলাম।' হেনা আপ্লুত।

ঠিক সেইসময় মারুতি ভ্যানটা পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়ির সামনের দরজা খুলে লোকটি নামল, 'এই যে স্যার। চেনা যাচ্ছে?'

চিনলাম। মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ। সেইসঙ্গে ভয় ভয় করতে লাগল।

'কাল দুনম্বরী করলেন কেন? আমাদের ফাঁসাতে চেয়েছিলেন?'

'দূর।' আমি হেসে উঠলাম, 'ওটা ভরকি। মহিম গুপ্ত কিছু বলেনি? আমি তো তোমাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে একটা কথাও বলিনি। গাড়ির নাম্বার দিইনি। দিয়েছি?'

'তা দেননি। কিন্তু থানার ঢুকেছিলেন কেন?'

'তার আগে বল এখানে আমি আছি সেটা কি করে জানলে?'

'আমার লোক আপনার পেছনে ছিল। শুনুন মহিম গুপ্ত বা আপনার বাবা আছেন বলে আপনাকে কিছু করিনি। কিন্তু খবর পেলাম বাইপাশের পাশে বিদেশিদের সঙ্গে কারখানা করবেন। আমার দশটা লোককে চাকরি দিতে হবে।'

'চাকরি?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও কোন কথাই ফাইন্যাল হয়নি।'

'হবে। হয়ে যাবে। মহিমদা মিথ্যে খবর দেয় না।'

'তার চেয়ে এক কাজ করো।' আমি হাসলাম। ছেলেটি তাকাল।

'গাড়ির ডিকিতে কেউ আছে না কি হাতপা বাঁধা অবস্থায়? ময়দানে নিয়ে চল, কাল যা পারিনি আজ সেটা করে দিচ্ছি।'

'রসিকতা করছেন?'

'না। চাকরি দেওয়ার চেয়ে কাউকে গুলি করে মারা অনেক সহজ।'

'আচ্ছা দুনম্বরী লোক তো আপনি।' সে গাড়িতে ফিরে যেতেই ওটা হুস করে বেরিয়ে

গেল। এত সহজে ছাড়া পাব আমি ভাবতে পারিনি। আজ সকালেও এই কথাগুলো বলতে পারতাম না। বেঁচে থাকার জন্যে যে বর্মের দরকার হয় তা আমার হাতে এসে গেছে।

একটা ট্যাক্সি ডাকলাম। পেছনের সিটে বসে গন্তব্য বলে দিলাম। অনেক অনেক বছর পরে নিজের পয়সায় ট্যাক্সিতে চড়লাম। আধঘণ্টার মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত হয়েছে?'

'তিরিশ টাকা স্যার, ঊনত্রিশ হয়েছে।'

'আপনার মিটার খারাপ।'

'না স্যার।'

'আমি বলছি খারাপ। চলুন, থানায় চলুন।'

'থানায় নিয়ে যাবেন কেন স্যার। আমি এই গাড়ি চালাই না, আজ সন্ধ্যেবেলায় বের করেছি। মিটার খারাপ থাকলে মাপ করে দেবেন।'

'কিন্তু সন্ধ্যে থেকেই আপনি লোক ঠকাচ্ছেন। তাছাড়া একথাটাও মিথ্যে হতে পারে। পুলিশ ঠিক বের করবে কবে থেকে ট্যাক্সিটা চালাচ্ছেন।'

'আপনার কাছে হাত জোর করছি স্যার। অন্যায় হয়ে গেছে। আর হবে না।'

'তাহলে কত দিতে হবে?'

'কিছু না। কিছু দিতে হবে না স্যার।' আমি নেমে দাঁড়াতেই দ্রুত বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব ছিলাম। তারপরই মনে হল, বাঃ। কি সুন্দর ব্যবস্থা। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে ভাড়া দিতে হল না। এইটে আগে কখনও মাথায় আসতো না।

দরজার সামনে দুজন দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে ফিসফিস করছিল। একজন এগিয়ে এল, 'দাদা, আপনার বাবার সঙ্গে দরকার ছিল। জরুরি।'

'হবে না। বাবা এখন আহ্নিক করছেন। কাল সকালে আসুন।'

'কাল! তখন তো খুব ভিড় হয়। পার্টির লোকজন দেখা করতে দেয় না।'

'আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ব্যবস্থা করে দেব।'

'ঠিক আছে। আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'ওকে। কাল দেখা হবে।'

অনেক দিন পরে, বোধহয় জ্ঞান হবার পর এই প্রথম মধ্যরাত্রে বাড়ির সদর দরজার কলিং বেলের বোতাম টিপলাম আমি। এখন যে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে পারব, বাজি রেখে দেখুন।

www.boiRboi.blogspot.com

ম্লান-অম্লান

নিরাপদ বসুকে এই কাহিনীর নায়ক বলা যাবে না। অথচ যা কিছু ঝামেলা ওকে নিয়েই। নিরাপদ অবশ্য ঝামেলা বলে স্বীকার করে না। সে যথেষ্ট ঝামেলা-এড়ানো ভদ্রলোক। ওর স্ত্রী হৈমন্তী যদিও এই স্বভাবটার জন্যে ওকে ব্যক্তিত্বহীন মানুষ বলে মনে করে। নিরাপদ এসব শুনতে দুঃখ পায়। কিন্তু ইদানিং স্ত্রীর কথাবার্তা সে উপেক্ষা করতে শিখে গিয়েছে। নিরাপদ একজন সারকারি চাকুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া হিসেবে ফল ভাল করেছিল। চাকরিতে ফাঁকি দেয়নি। তাই পঞ্চাশ বছরেই যতটা ওপর তলায় ওঠা সম্ভব উঠেছে।

হৈমন্তী খুব গোছানো মেয়ে। স্বামীর যা আয় তাতেই সে সংসারটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। চাহিদা তো অনেক থাকে কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে দিনরাত অশান্তি করে না। চল্লিশের এপাশে এসেও হৈমন্তী এখনও আকর্ষণীয়, যাকে বলে সুন্দরী, ঠিক তাই। আর এখানেই তার যা কিছু কষ্ট। নিরাপদ পঞ্চাশেই কেমন বুড়ো বুড়ো হয়ে গিয়েছে। অফিস আর বাড়ি ছাড়া কিছুতেই উৎসাহ নেই। সুন্দরী স্ত্রী যে তাকে তেমন আকর্ষণ করে তা আর আজকল বোঝা যায় না। হৈমন্তী নিরাপদের মেয়ের নাম অদিতি। বয়স আঠারো-উনিশের মাঝামাঝি লম্বা, দারুণ দেখতে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় হৈমন্তীর রাত্রের ঘুম নেই। টেলিফোন বাজলেই অদিতিকে কেউ না কেউ ডাকবে। লেটার বক্সে প্রেমপত্রের বন্যা বয়ে যায়। ভরসা এই মেয়েটা এসব পাত্তা দেয় না। হৈমন্তীর রাগ, নিরাপদ একটুও চিন্তিত নয় মেয়ের ব্যাপারে। কখন কোন উটকো ছেলের সঙ্গে মজে গেলে সারাজীবন কপাল চাপড়াতে হবে। সারা সময় মেয়েকে সেকথা শোনায় হৈমন্তী।

এই নিরাপদকে অফিসের কাজে একবার দিল্লীতে যেতে হয়েছিল। দিল্লীতে হৈমন্তীর দিদি থাকেন। কোন অসুবিধে হয়নি। ফেরার সময় কালকার টিকিট পাওয়া গেল না। সেকেন্ড ক্লাশ স্লিপারে সে বেশী স্বচ্ছন্দ। ভায়রাভাই রাজধানীর চেয়ারকারের টিকিট ম্যানেজ করে দিল। বড়লোকী পরিবেশ একদম সহ্য হয় না নিরাপদর। এয়ার কন্ডিশন্ড মানে সেই রকম ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল তার। কিন্তু সিটে বসে দেখল তার মত পোশাক ও চেহারার অনেক যাত্রী যাচ্ছে। সে সাইড ব্যাগ থেকে আগাথা ক্রিস্টির একটা বই বের করে চোখ রাখল হেলানো চেয়ারে মাথা রেখে। আগাথা ক্রিস্টি ওর খুব প্রিয় লেখিকা। গাড়ি চলল। ভেতর থেকে গতি বোঝার উপয় নেই, ধুলো নেই। নিরাপদর

ভাল লাগল। এই সময় বেয়ারা গোছের একটি লোক এসে সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। চমকে উঠে বসল নিরাপদ। তারপর লোকটিকে লক্ষ্য করে বুঝল সেলামটা তার পাশে বসা যাত্রীর জন্যে। বেয়ারা খুব বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, কফি চাহিয়ে?'

'কফি? হোলে মন্দ হয় না।'

'ঠিক হ্যায় সাব।' বেয়ারা চলে গেল।

নিরাপদ অবাক। কম্পার্টমেন্টের কাউকে এই প্রশ্ন করেনি বেয়ারা। এই লোকটি কি এমন তালেবর যে তাকেই খাতির করতে হবে! কিন্তু এই প্রশ্ন মনে এলেও মুখে কিছু বলল না নিরাপদ। সেটা তার স্বভাবে নেই। নিজেকেই বোঝাল, নিশ্চয়ই রেলের কোন বড় কর্মচারী। সে আড়চোখে তাকাল। বছর পঁয়ত্রিশেক হবে। রোগা, ফর্সা, চশমা পরা। এধরণের চেহারার বয়স চট করে অবশ্য আন্দাজ করা যায় না।

কফি এল। আরাম করে খেলো লোকটা পাশে বসে। কম্পার্টমেন্টের অনেকেই এই খাওয়াটা দেখছে। সবার চোখেই বিস্ময়।

পাশাপাশি বসেও কথা হচ্ছিল না। আগ বাড়িয়ে কথা বলার স্বভাব নেই নিরাপদর। সে বই-এ দৃষ্টি রেখেছিল। বেয়ারাটা আবার এল কাপ প্লেট নিতে। জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, আপনি কি আলাদা কোন মেনু ডিনারে নেবেন?'

লোকটি বলল, 'না, না। যা সবাইকে দিচ্ছ তাই আমাকে দিও।'

নিরাপদ নিশ্চিত হল লোকটি রেলের অফিসার। তার অবশ্য রেলের অফিসারের সঙ্গে আলাপ রাখার প্রয়োজন নেই। কালেভদ্রে কলকাতা থেকে সে বের হয়।

'ওটা কি আগাথা ক্রিস্টি?'

চমকে উঠল নিরাপদ। দ্রুত মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আমার খুব প্রিয় লেখক। কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি থেকে আমাদের ফেলুদা, হাতে পেলে পৃথিবী ভুলে যাই আমি।'

নিরাপদ হাসল। অথবা বলা যেতে পারে, হাসবার চেষ্টা করল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিল্লীর লোক নন নিশ্চয়ই?'

'না, না, আমি কলকাতায় থাকি। কাজে এসেছিলাম। সরকারি কাজে।'

'প্রায়ই আসেন?'

'না। হঠাৎই আমাকে আসতে হল।'

'কোন ডিপার্টমেন্ট আপনার?'

নিরাপদ সেটা জানল। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'যাক খুব দুশ্চিন্তা ছিল, আমার পাশে যদি কোন উটকো লোক বসত তাহালে সারাটা পথ মুখ বন্ধ করে থাকতে হত। আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না!'

'আমি নিরাপদ বসু। আপনি?'

'অম্লান মিত্র।'

ভদ্রলোক কি করেন, রেলের অফিসারা কিনা তা জানা গেল না। জিজ্ঞাসা করতেও সঙ্কোচ হচ্ছিল নিরাপদর। নিজের ওপর এই কারণেই তার ক্ষোভ হয়। হৈমন্তীর রেগে যায় এই কারণে। ডিনার এল। ভদ্রলোক বেয়ারাকে বললেন খাবার দেওয়ার আধঘণ্টা

www.boiRboi.blogspot.com

বাদে আবার যেন কফি দিয়ে যায়। এবার দুকাপ।

না, লোকটা খারাপ নয়। রাত্রে ঘুমাবার আগে অনেক কথা হল। সকালেও। নিরাপদর অফিস এবং বাড়ির ফোন নম্বর নিলেন ভদ্রলোক। নিজের ফোন নম্বর দিলেন না। বললেন, টালিগঞ্জের নাম্বার শুনছি পাল্টে যাবে। গিয়ে দেখব হয়তো এরই মধ্যে পাল্টে গিয়েছে। আপনাকে পরে জানিয়ে দেব।'

এই লোকটির কথা বাড়িতে ফিরে হৈমন্তীকে বলেনি নিরাপদ। বললেই হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করত, 'একটা লোককে সব জানিয়ে দিলে অথচ সে কি করে কোথায় থাকে তা জানলে না?' খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু নিরাপদ বোঝাতে পারবে না যে তার মনে হয়েছিল লোকটি নিজের সম্পর্কে বেশী কথা বলতে চায় না। তাই জিজ্ঞাসা করতে তার ভদ্রতায় লেগেছিল। তাছাড়া একজনের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছে এবং সেখানেই শেষ, তাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা করে কি হবে। হৈমন্তীকে একথা বলা মানে ঝামেলা পাকানো। হৈমন্তীকে খুসী করার জন্যে ও রোজ সকালে বাজারে যায়, গ্যাস বুক করে, তাগাদা দেয়, রেশনের দোকানে যায়, শুধু কেরোসিনের লাইন দেয় না। সেটা হৈমন্তীই নিষেধ করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বস্তির লোকেদের সঙ্গে স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে চায় না সে। কিন্তু ইলেক্ট্রিক বা টেলিফোনের বিলটা ওর পকেটে গুঁজে দেয়। ডাবল সিলিন্ডার থাকার গ্যাস ফুরাবার আগেই দ্বিতীয় সিলিন্ডার পাওয়া যায়। হৈমন্তীর সমস্যা থাকে না। এবার দিল্লী থেকে এসে শুনল যে কোন মুহূর্তে আগের গ্যাস শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দোকানে বলা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। বলেছে সাপ্লাই নেই। পাড়ার দোকানে গ্যাস সাপ্লাই না থাকলে নিরাপদ কি করতে পারে? হৈমন্তী অবশ্য কাজের মেয়েকে দিয়ে অনেকটা কেরোসিন তুলিয়ে রেখেছে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে নিরাপদ দেখল লোডশেডিং। মেজাজ খারাপ হয় না আজকাল। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রথম প্রথম ফোন করত অদিতির তাড়নায়। শুনত কেবল ফল্ট আজকাল করে না। মোমবাতি জ্বলে, গরমে পচতে হয়। আজ টেলিফোন বাজল। হৈমন্তী কথা বলে জানল অম্লান মিত্র নামে একজন তাকে ডাকছে।

নিরাপদ ফোন ধরল। অম্লানের গলা পাওয়া গেল, 'কি মশাই, চিনতে পারছেন? আমি অম্লান। রাজধানীতে আলাপ হয়েছিল।'

নিরাপদ শুকনো হাসল, 'হেঁ হেঁ। কেমন আছেন।'

'ফার্স্টক্লাশ। আপনাদের পাড়ায় এসেছিলাম। ভাবলাম যোগাযোগ করি। কি করছেন?'

'কিছু না।'

'তাহলে একবার আপনাদের ওখানে টুঁ মেরে আসি। ঠিক কোথায় যেন বাড়িটা?'

নিরাপদ মোটামুটি বুঝিয়ে দিল।

টেলিফোন রেখে সে কিন্তু কিন্তু হৈমন্তীকে বলল, 'অম্লানবাবুর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। খুব বড় অফিসার।'

'কোথাকার?'

'রেলের বোধহয়।'

'বোধহয় মানে? উনি বলেন নি?'

নিরাপদ অস্বস্তিতে পড়ল, 'সেই রকম মনে হল।'

'আশ্চর্য! একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল, টেলিফোন নাম্বার দিলে অথচ সে কোথায় কাজ করে জানলে না! কি করে সরকারি চাকরি কর? কি বললেন?'

'এ পাড়ায় এসেছিলেন। তাই ঘুরে যেতে পারেন।'

'এই অন্ধকারে? নিষেধ করলে না?'

'কেউ যদি আসতে চায় নিজে থেকে তো মানা করব কি করে?'

'আমি লোডশেডিং-এর মধ্যে চা ফা খাওয়াতে পারব না।'

মিনিট দশেক বাদে অম্লান এল। এসেই বলল, 'একি দাদা, অন্ধকারে বসে আছেন?'

নিরাপদ বলল, 'কি করব, উপায় তো নেই।'

'উপায় নেই হয় নাকি? আপনার টেলিফোন কোথায়?'

নিরাপদ অবাক হলেও টেলিফোন দেখিয়ে দিল। মোমবাতির আলোয় ডায়াল ঘোরাল অম্লান। নিরাপদ শুনল অম্লান বলছে, 'হেলো, চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন?' ও, অম্লান বলছি। আমি এখন তিনশো বাইশ সার্কুলার রোডে আছি। এখানাকার ফেজটা অন করে দিতে বলুন। ধন্যবাদ।' রিসিভার রেখে দিয়ে অম্লান বলল, 'এই গরমে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে?'

নিরাপদ অবাক। সে একেবারেই হতভম্ব হয়ে গেল যখন এর মিনিটখানেক বাদেই আলো এসে গেল। চার পাশে উল্লাস শোনা গোল। ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে হৈমন্তী সমস্ত ব্যাপারটা শুনল। আলো জ্বলতে সেও অবাক। নিরাপদ না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইতে আপনার চেনাজানা আছে বুঝি?'

'ওই একটু আধটু।' অম্লান বলল। এই সময় অদিতি ছুটে এসে জানাল একমাত্র তাদের বাড়ি এবং রাস্তার এপাশের কয়েকটিতে আলো এসেছে। উল্টোদিকটায় এখনও লোডশেডিং। অম্লান অদিতিকে দেখছিল। হেসে বলল, 'যাতে তোমাদের এই বাড়িতে কখনও লোডশেডিং না হয় সেই ব্যবস্থা করবো?'

'আপনি পারবেন? অসম্ভব।'

'দেখি।' রহস্যের হাসি হাসল অম্লান।

নিরাপদ স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে অম্লানের আলাপ করিয়ে দিল। অম্লান খুবই ভদ্রভাবে কথা বলল। অদিতি টিভি খুলেছিল। ছবি এখনও কাঁপছে। দুবছরের টিভি, মিস্ত্রি দেখিয়েও ঠিক হচ্ছে না। অম্লান বলল, 'এই টিভি দেখবেন না দাদা, চোখ খারাপ হয়ে যাবে।'

হৈমন্তী বলল, 'কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না গ্যারান্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকবার মিস্ত্রি দেখালাম, যখন করে দিয়ে যায় তখন ঠিক থাকে তারপর যাকে সেই। আর একটা যে কালার টিভি কিনব তার তো উপায় নেই। যা দাম।

'আহা কিনবেন কেন বউদি। দুবছর তো বেশীদিন নয়। কোম্পানিকে লিখছেন না কেন? ঠিক আছে, টিভি কেনার রসিদটা আছে? অম্লান জিজ্ঞাসা করল।

রসিদ পাওয়া গেল। সে সেটা পকেটে রেখে বলল, 'এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। দেখি কি করা যায়।'

অনেকক্ষণ গল্প করে চা খেয়ে চলে গেল সে। এর মধ্যে হৈমন্তী জানতে পেরেছে

www.boiRboi.blogspot.com

বিয়ে থা করার সুযোগ হয়নি এখনও ওর। টালিগঞ্জে বাড়ি। বাড়িতে মা আছে। সরকারি চাকরি করে। কিন্তু কোন ডিপার্টমেন্ট তা বের করতে পারে নি হৈমন্তী। অম্লান বলেছে, 'বউদি মাপ করবেন, এটা বলতে অসুবিধে আছে।'

তাজ্জব ব্যাপার। সেদিনের পর আর লোডশেডিং হচ্ছে না এ বাড়িতে প্রতিবেশীরা এতে অবাক। ঈর্ষান্বিত অনেকেই। হৈমন্তী বলল, 'সত্যি ভদ্রলোক খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল।'

হৈমন্তীর ভাই এসেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন করে। বলল, 'সত্যি দিদি, এই কারণে তোমরা এত সহজে টুঁ পি পরো।'

হৈমন্তী চটে গেল, 'আজে বাজে কথা বলিস না।'

ভাই বোঝাল, 'ধরে', আমার সঙ্গে খুব জানপয়চান আছে ইলেকট্রিসিটির ইঞ্জিনিয়ারের। এপাড়া এসে জানলাম তোমার বাড়িতে লোডশেডিং। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে তাকে অনুরোধটা করলাম। তারপর তোমার বাড়িতে এসে যেন প্রথম লোডশেডিং দেখছি এমন অভিনয় করে লোকটাকে দ্বিতীয়বার ফোন করলাম। ব্যাস, আলো এসে গেল। আর তুমি ভাবলে, ব্যাপস, লোকটার কি ক্ষমতা।'

হৈমন্তী এতটা বোঝেনি। এবার বুঝে বলল, 'যাক বাবা, আমাদের তো আর লোডশেডিং হচ্ছে না, সেইটেই উপকার।'

কিন্তু দিন তিনেক বাদে টিভি কোম্পানি থেকে টেলিফোন এল। তাঁরা পুরোন টিভি ফিরিয়ে নিয়ে নতুন সেট দিয়ে দিতে চান। আজ বিকেলে তাঁদের লোক সেটা পৌঁছে দেবে। হৈমন্তী হতভম্ব। গ্যারান্টি কার্ডে এক বছর সময়সীমা ছিল তবু এটা সম্ভব হল কি করে? সে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল নিরাপদকে। নিরাপদ ছুটে এল বাড়িতে। কোম্পানির লোক বিকেলবেলায় এসে পুরোন সেট নিয়ে গেল নতুন সেট বসিয়ে। তারা জানাল ওপরতলার হুকুমে কাজটা করা হচ্ছে। নতুন সেট অনেক বেশী আধুনিক এবং দামের তফাৎ তিন হাজার টাকা।

হৈমন্তী বলল, 'নাঃ, ক্ষমতা আছে বটে অম্লানের। তবে গায়ে পড়ে এত উপকার করছে, এটা আমার ভাল লাগছে না।'

নিরাপদ বলল, 'তুমি বড্ড সন্দেহবাতিক।'

'হয়তো। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না।'

তাহলেও আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপারটা জানল। অনেকেই অম্লানের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। হৈমন্তী ঠেকিয়ে রাখে। দিন দশেক বাদে ছুটির দশ মিনিট আগে নিরাপদ দেখল তার সামনে অম্লান, 'এদিকে এসেছিলাম ভাবলাম দাদাকে নিশ্চয়ই অফিসে পেয়ে যাব।' নিরাপদ টিভিটার জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিল।

অম্লান বলল, 'এ কিছু নয়। আসলে আমরা অনেকেই নিয়ম জানি না। কোন কোম্পানি চাইবে না বিক্রির দুই বছরের মধ্যে তাদের জিনিস খারাপ এটা বাজারে চালু হোক। নিজেদের মান বাঁচাতে ওরা পাল্টে দেবে।'

নিরাপদ অম্লানের সঙ্গে বের হল। সামনের গাড়িতে তাকে নিয়ে উঠল অম্লান। গাড়ির ওপর লাল আলো। ড্রাইভার নেই। অম্লানই চালান। ডালহৌসি এলাকায় অত স্পীডে গাড়ি চালাতে কাউকে দ্যাখেনি নিরাপদ। মাথার ওপর লাল আলো থাকায় মোড় পার হবার সময় সেপাইরা সেলাম ঠুকছে।

নিরাপদ বাকশক্তি রহিত। নিরাপদ কোনমতে অনুরোধ করল আস্তে চালাতে। অম্লান হাসল, 'আস্তে চালাতে কোন মজা নেই দাদা।'

'কিন্তু আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।' আর্তনাদ করল নিরাপদ।

গাড়ির গতি কমাল অম্লান। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গাড়িতে লাল আলো কেন হে? শুনেছি মন্ত্রীমশাই, জাজ ছাড়া লাল আলো কোন সাধারণ নাগরিক জ্বালাতে পারে না।'

অম্লান গম্ভীর হল, 'তাহলে আমকে অসাধারণ নাগরিক মনে করুন।'

বাড়িতে পৌঁছে দিল অম্লান। নিরাপদ তাকে নিমন্তন্ন করল চা খেয়ে যেতে। ওপরে এল ওরা। অদিতি দরজা খুলল। অম্লান তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ? লোডশেডিং-এর কষ্টটা নেই তো?'

অদিতি হাসল, 'না নেই। থ্যাঙ্কস। সে ভেতরে চলে গেল।'

নিরাপদ দেখল ওর চলে যাওয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে অম্লান। সেই সময় হৈমন্তী ভেতর থেকে আসছিল। অম্লানের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে সেও লজ্জা পেল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

সম্বিত এল যেন, অম্লান বলল, 'কিছু না। কেমন আছেন?'

'ভাল। হৈমন্তী স্বামীর দিকে তাকাল, সর্বনাশটা হল।'

'কি ব্যাপার?' নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল।

'গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। দোকানে গিয়েছিলাম। বলল, দিন দশেক লাগবে।'

হৈমন্তী চিন্তিত, 'আগামী পরশু মেয়ের জন্মদিন।'

সবাইকে আসতে বলেছি, 'কি হবে?'

অম্লান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের ডাবল সিলিন্ডার নেই?'

নিরাপদ জবাব দিল, 'ডাবল সিলিন্ডারেই এই দশা।'

অম্লান মাথা নাড়ল, 'এটা কোন প্রব্লেমই নয়।'

হৈমন্তী রেগে গেল, 'প্রব্লেম নয় মানে? কেরাসিন পাওয়া যায় বাজারে?'

'যায়। দাম বেশী দিতে হয়। কিন্তু বউদি, চিন্তা করবেন না, আপনি গ্যাসই পাবেন। কাল সকালে আপনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব।'

অম্লানের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল নিরাপদ। যে ইলেকট্রিক এনে দিতে পারে, টিভি সেট পাল্টাতে পারে সে হয়তো গ্যাসও পারবে। একটু বাদে নিরাপদর শ্যালক অবিনাশ এল। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল অম্লানের। অবিনাশ ট্রেড ইউনিয়ন করা মানুষ। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি চাকরি করেন মশাই।'

অম্লান হাসল, 'আমি যে চাকরি করি সেটা সাধারণকে বলা যাবে না।'

'কেন?'

'নিষেধ আছে।'

'আপনার বাড়ির ঠিকানা?'

'টালিগঞ্জে থাকি, এটুকু জানলেই চলে না?'

www.boiRboi.blogspot.com

'না। চলে না, আপনি কেমন লোক মশাই? হট করে ট্রেনের আলাপ সম্বল করে ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন অথচ নিচের পরিচয় কাউকে জানাচ্ছেন না? এটা কোন ভদ্রতা?'

নিরাপদ শালাকে সামলালো, 'আহা, নিশ্চয়ই ওঁর অসুবিধা আছে।'

'অসুবিধে না ধান্দাবাজি। আপনাকে ফাঁসাবে এই লোকটা।'

অম্লান হাসল, 'আপনি আমাকে অপমান করছেন।'

এখানে এখন আপনি আমাকে যা ইচ্ছে করতে পারেন, গায়ের জোরে আমি পারব না। কিন্তু এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনাকে কোন কারণ না দেখিয়ে কয়েকমাস জেলের ভাত খাওয়াতে পারি। আচ্ছা বউদি, বলুন তো, আমি কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি?'

'তা নয়।' আমতা আমতা করল হৈমন্তী।

'আপনার খুব ক্ষমতা, না?' অবিনাশ তেজী গলায় বলল।

'খুব না, সামান্য।'

'আমি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিলাম গড়িয়ায়। নাইনটি পার্সেন্ট টাকা জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রমোটার এখন এক্সট্রা এক লাখ চাইছে। এটা সমস্ত রীতিনীতি ভদ্রতার বাইরে। প্রমোটার এখন বেশী দাম পাচ্ছেন বাইরে থেকে। বলছেন হয় আমাকে এক্সট্রা টাকাটা দিতে হবে নয় উনি আমার জমা দেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন। কেস করে কোন লাভ হবে না। করণ সবাই জানে প্রমোটার ফ্ল্যাট একেবারে সাদা টাকায় বিক্রি করে না। কিছু উপায় হতে পারে?'

অম্লান নিরাপদর দিকে তাকাল, 'দাদা, আপনি কি চান কিছু হোক?'

নিরাপদ নিজের মাথায় হাত বোলালে, 'হওয়া খুব শক্ত। এক, পাড়ার ছেলেরা যদি লোকটাকে চাপ দেয় তাহলে—।'

অবিনাশ মাথা নাড়ল, 'সেটা আর সম্ভব নয়। লোকটা ওদের হাত করে ফেলেছে।'

অম্লান এবার হৈমন্তীকে জিজ্ঞাসা করল, 'বউদি আপনি কি চান?'

হৈমন্তী একটু গদগদ গলায় বলল, 'দেখুন না, চেষ্টা করে।'

অম্লান অবিনাশের কাছে ঠিকানা, প্রমোটারের নাম ধাম চাইল। তারপর আগামীকাল কিছু করা যাবে বলে চলে গেল। অদিতি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখল লাল আলো লাগানো গাড়িতে ওঠার আগে অম্লান ওপর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

পরদিন দুপুরে অফিসে অবিনাশের ফোন পেল নিরাপদ। সে খুব উত্তেজিত হয়ে বলল তাকে থানা থেকে ডেকে পাঠিয়েছে আজ বিকেল পাঁচটায় ফ্ল্যাট নিয়ে কথা বলার জন্যে। প্রমোটার বোধহয় থানাকেও ম্যানেজ করেছে। জামাইবাবু যদি সঙ্গে আসেন তাহলে সে সাহস পায়। নিরাপদ স্ত্রীর ভাই-এর দুর্দিনে সঙ্গী হল।

দারোগার সামনে বসেছিলেন প্রমোটার এবং এক ভদ্রলোক। অবিনাশ নিজের পরিচয় দেওয়া মাত্র দারোগা তাকে বসতে বললেন। প্রাথমিক আলোচনার পর প্রমোটর যখন জিনিসপত্রের বাজারদর বেড়ে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছেন তখন দারোগা স্পষ্ট বলে দিলেন, 'মাসখানেকের মধ্যে যদি আপনি অবিনাশবাবুর হাতে ফ্ল্যাটের চাবি না তুলে দেন তাহলে

ভীষণ বিপদে পড়বেন। আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবেন না।'

প্রমোটর ভদ্রলোক প্রতিবাদ করতে চাইলেন কিন্তু দারোগা কোন কথা শুনতে চাইলেন না। এবার প্রমোটার প্রস্তাব দিলেন একটু আলাদা করে তার সঙ্গে বসে কথা শুনতে। দারোগা সেটাকেও নাকচ করলেন। এবার প্রমোটারের সঙ্গী ভদ্রলোক কথা বললেন বেশ গম্ভীর গলায়। দারোগা শুনলেন। হেসে বললেন, 'অজিতবাবু, পলিটিক্যাল প্রেসার দিয়ে কোন লাভ হবে না। অর্ডারটা এসেছে এত ওপরতলা থেকে যেখানে আপনারাও পৌঁছতে পারবেন না। এর পরে প্রমোটার দারোগাকে লিখিতভাবে জানালো যে তিনি এক মাসের মধ্যে ফ্ল্যাটের চাবি অবিনাশকে দিয়ে দেবেন।

নিরাপদ তো বটেই অবিনাশেরও মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ সবই অম্লানের জন্যে হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হল না। লোডশেডিং দূর করা বা টিভি সেট পাল্টানো খুব দারুণ ব্যাপার নয় কিন্তু ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়া?

নিরাপদ বাড়িতে ফিরে শুনল হৈমন্তী বেরিয়ে গিয়েছে। অদিতি বলল, দুপুরে অম্লানকাকু ফোন করেছিল। ভবানীপুরের এক গ্যাস ডিলারের কাছে গিয়ে নিরাপদর নাম বললেই নাকি সিলিন্ডার পাওয়া যাবে। নিরাপদ হতভম্ব। সেই দোকানে তাদের নাম লিস্টে নেই।

বললেই দেওয়া যায় নাকি? কিন্তু হৈমন্তী ফিরে এল একটি কুলিগোছের লোকের সঙ্গে যার হাতে সিলিন্ডার। পুরোনটা নিয়ে নতুনটা দিয়ে সে চলে যাওয়া মাত্র হৈমন্তী যেন সাতমুখে কথা বলে উঠল, 'তুমি জানো অম্লান কে?'

'কে?' ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল নিরাপদ।

'ডেপুটি গভর্ণর অফ ওয়েস্টবেঙ্গল। ভাবতে পারো?'

'যাঃ।'

'হ্যাঁ গো। আমি সেই ডিলারের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার নাম শুনে উনি একটি চিরকুট বের করলেন। ওদের ওপরতলার এক সাহেব লিখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি গভর্ণরের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমাকে যেন একটা গ্যাসের সিলিন্ডার এখনই দিয়ে দেওয়া হয়।' হৈমন্তী বসে পড়ল।

'ডেপুটি গভর্ণর? এরকম পোস্ট তো পশ্চিমবাংলায় আছে বলে শুনিনি।'

'আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।'

নিরাপদ বিড় বিড় করল, 'একবার অজয়বাবুর আমলে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার পোস্ট তৈরি হয়েছিল, ডেপুটি প্রাইমমিনিস্টার পোস্ট মাঝে মাঝে হয় কিন্তু ডেপুটি গভর্ণর?' সে উঠে টেলিফোন গাইড দেখে রাজভবনে ফোন করল। রাজভবন জানাল অম্লান মিত্র নামে কাউকে তারা চেনে না। নিরাপদ পরিচিতজনদের ফোন করল। সবাই হাসাহাসি করল ডেপুটি গভর্ণর নামে কোন পোস্ট আছে শুনে। অথচ হৈমন্তী জোর দিয়ে বলছে সে ওই শব্দ দুটো কাগজে দেখেছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় জনাদশেক আত্মীয়স্বজন এল এ বাড়িতে অদিতির জন্মদিন উপলক্ষে। হৈচৈ হচ্ছে অবিনাশের ছোটভাই বিকাশ থাকে বিরাটিতে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে রাত করতে চাইল না। সে যখন আটটা নাগাদ বের হচ্ছে তখন অম্লান এল লাল আলো

www.boiRboi.blogspot.com

জ্বালানো গাড়ি চালিয়ে। এসে বলল, 'দাদা, অদিতির জন্মদিনে আমাকেই বাদ দিলেন? তবু অযাচিতের মত এসে পড়লাম।'

অবিনাশ তাকে দেখে খুব খুশী। হৈমন্তীও। সে বলল, 'আপনার ঠিকানা জানা ছিল না বলে নেমন্তন্ন করতে পারিনি। খুব খুশী হয়েছি এসেছেন বলে।' তার সঙ্গে বিকাশেরও আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। বিকাশ চলে যাচ্ছে শুনে ব্যস্ত হল অম্লান, 'সেকি, এখন তো সবে সন্ধ্যে, এখনই চলে যাচ্ছেন কেন?'

বিকাশ বলল, 'ফ্ল্যাটে তালাচাবি দিয়ে এসেছি। খুব চুরি হচ্ছে এখন ওপাড়ায়। তাই বেশী রাত করতে চাই না।'

'এটা কোন প্রব্লেম নয়। ঠিকানাটা বলুন।'

ঠিকানা শুনে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিচু গলায় কিছু বলে এসে অম্লান হাসল, 'নিন, আড্ডা মারুন। দশটা নাগাদ উঠবো।'

'কিন্তু—।' বিকাশ আপত্তি করতে যাচ্ছিল।

অবিনাশ বলল, 'আর কিন্তু করিস না। অম্লানবাবু যখন বলছেন তখন মন ঠিক করে আড্ডা মার! কোন ভয় নেই।'

হঠাৎ অম্লান নিরাপদকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনার জমি কেনা আছে?'

'জমি? না। ওসব আর হয়ে উঠল না।'

হৈমন্তী বলে উঠল, 'একদম বিষয়ী মানুষ নয়। এই ভাড়ার ফ্ল্যাটেই সারাজীবন পচতে হবে।'

অম্লান হাসল, 'তা কেন? আপনি সল্টলেকে পাঁচ কাঠা জমি নিন। স্টেডিয়ামের ঠিক পেছনে। খুব ভাল জায়গা। নেবেন?'

নিরাপদ কিছু বলার আগে অবিনাশ চেঁচিয়ে উঠল, 'সল্টলেকে? ওরে ব্বাস। ওখানে এখন তিনলাখ করে কাঠা।'

নিরাপদ বলল, 'আমাকে বিক্রী করলেও পাওয়া যাবে না।' অম্লান হাসল, 'তিনলাখ তো ব্ল্যাক। বারো হাজার করে কাঠা পাবেন। নিয়ে নিন দাদা। ষাট হাজার দিয়ে জমিটা কিনে ফেলুন। ওটাই আইনসম্মত দাম। পরে বাড়ি করতে ইচ্ছে না হলে না হয় বিক্রী করে দেবেন।'

অবিনাশ উল্লাসিত, 'নিয়ে নিন জামাইবাবু। বাড়ি না করলে চৌদ্দলাখ চল্লিশ হাজার এখনই প্রফিট। এত লাভ ভাবা যায় না। জমি এখন সোনা।'

অম্লান বলল, ভেবে দেখুন। যদি চান তাহলে একটা চেষ্টা হতে পারে।'

নিরাপদ বলল, 'ভেবে দেখি।'

হঠাৎ অম্লানের যেন মনে পড়ল এমন ভঙ্গীতে সে উঠে অদিতির সামনে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে ছোট, প্যাকেট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ।' অদিতি বলল, 'থ্যাঙ্কু।'

বিকাশরা চলে গেল নটা নাগাদ। দেখে বোঝা যাচ্ছিল স্বস্তিতে নেই। নিরাপদই যেতে বলল তাকে। খাওয়া দাওয়া হৈচৈ করতে করতে এদের দশটা বেজে গেল। এক ফাঁকে অম্লান নিরাপদকে বলল, 'দাদা, আপনারা সবাই ভাবছেন আমি কে অথচ আমি সেটা

জানাতে পারছি না। খুব খারাপ লাগে। এবার আমার সঙ্গে অপনাদের দেখা আর ঘনঘন হবে না।'

'সেকি, কেন?' নিরাপদ অবাক।

'আমাকে মাদ্রাজে বদলি করা হয়েছে। এখনও কিছু দেরি আছে যাওয়ার।'

মন খারাপ হয়ে গেল নিরাপদর। লোকটার পরিচয় অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ওর ব্যবহার তার খুব ভাল লাগে। তাছাড়া অযাচিত উপকারগুলোর কথা ধরলে—! সে বলল, 'আমরা আপনার কাছে শুধু উপকার নিয়ে গেলাম, বদলে কিছুই করলাম না।'

'ছি ছি। আপনি একথা বলছেন কেন? আমি যা যা করেছি ভালবেসে করেছি। সবাইকে কি খুশী করা যায়? আমার মাকেই খুশী করতে পারলাম ন।'

'কেন?'

'মা চান আমি বিয়ে করি, সংসারী হই।'

'এতে অসুবিধে কোথায়?'

'মেয়ে কোথায়? তেমন মেয়ে না পেলে বিয়ে করে কি লাভ?'

'কি রকম মেয়ে আপনার পছন্দ?' সরল গলায় জানতে চাইল নিরাপদ।

এইসময় হৈমন্তী পাশে এসে দাঁড়াল। তার কানেও গেছে শেষ প্রশ্নটা। অম্লান হাসল, 'বউদি যদি রাগ না করেন তাহলে বলতে পারি।'

হৈমন্তী হাসল, 'বাঃ, রাগ করব কেন?'

'তাহলে বলি। ঠিক আপনার মত মেয়ে পেলে বিয়ে করতে পারি।'

হৈমন্তী লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। নিরাপদ হেসে উঠল। আর তখনই টেলিফোন বাজল। নিরাপদ এগিয়ে গেল সেটা ধরতে। হৈমন্তী বলল, 'আপনি খুব ফাজিল।'

'সত্যি কথা বলেছি বউদি।'

'আমার মত মেয়ের কি অভাব বাংলাদেশে?'

'খুঁজে দিন। আপনাকেই দায়িত্ব দিলাম।'

এইসময় অদিতি এসে দাঁড়াল পাশে, 'মা, দ্যাখো!'

হৈমন্তী দেখল। একটি দামী হাতঘড়ি। সে বলল, 'একি, এত দামী জিনিস কেন আনলেন।'

'অপরাধ হয়ে গেছে?'

হৈমন্তী জবাব দিতে পারল না। হঠাৎ তার মনে সন্দেহটা এল। অম্লানকি অদিতির জন্যে এসব করছে? তার মতই তো দেখতে অদিতি। প্রথমদিন যেভাবে তাকিয়েছিল মেয়ের দিকে, গাড়িতে ওঠার আগে হাত নাড়া, দামী ঘড়ি উপযাজক হয়ে এসে উপহার দেওয়া—এসব কি তারই ইঙ্গিত? অসম্ভব। এই দুজনের বয়সের পার্থক্য অন্তত আঠারো বছরের। ভাবল বয়সী লোকের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারেনা হৈমন্তী। আর অদিতি কিছুতেই রাজী হবে না তাবত। ওর বন্ধুর দাদারাই পাত্তা পাচ্ছে না।

নিবাপদ ফিরে এল টেলিফোন রেখে, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'কেন?' হাসল অম্লান।

বিকাশ ফোন করেছিল। ও ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্যাখে একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

আছে ওদের ফ্ল্যাটের সামনে। ওর পরিচয় পেয়ে তারা জানায় যে অর্ডার পেয়ে এসেছিল ফ্ল্যাট পাহারা দিতে। কোন বিপদ হয়নি। বিকাশ এসে যাওয়ায় ওরা চলে গেছে। বিকাশ আপনাকে ধন্যবাদ দিতে বলেছে।'

অবিনাশ ছিল। সে বলল, 'অম্লানবাবু, আপনি কে মশাই? আরব্যরজনীর আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের গল্প শুনেছি, এ যে তার মত ব্যাপার।'

অম্লান হাসল, 'প্রদীপের দৈত্য কিনা জানিনা তবে এসব করলে দেখেছি একসময় যাদের জন্য করছি তাদের কাছে ভীতিকর দৈত্য হয়ে যাই।' তারপর ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বউদি? আমার কথা কিছু ভাবলেন?'

হৈমন্তী বাঁকা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এত পারেন আর এটুকু পারেন না?'

অম্লান হাসল, 'এখানে আমার সঙ্গে প্রদীপের দৈত্যের মিল আছে। পার্থিব জিনিস আমরা এনে দিতে পারি। কিন্তু দয়ামায়া ভালবাসা পারি না। আপনি তা পারেন।'

'অসম্ভব। আপনার কথা আমি যেটুকু বুঝেছি তাতে কিছুতেই মত দিতে পারছি না।'

'জানতাম।' অম্লান মাথা নাড়ল। তারপর নিরাপদকে বলল, 'চলি দাদা।'

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে হৈমন্তী তার সন্দেহের কথাটা নিরাপদকে জানাল। নিরাপদ চমকে উঠল। অসম্ভব। অদিতি ওর হাঁটুর বয়সী। হৈমন্তী বলল, 'লোকটা এই মতলবে এসেছিল।'

নিরাপদ অবশ্য একমত হল না। ট্রেনে অদিতির কথা ও জানত না।

দুদিন পরে লোডশেডিং হলে, গ্যাস ফুরিয়ে গেলে, জমি কেনার কথা মনে হলে হৈমন্তী নিরাপদর খুব কষ্ট হত। তাদের মনে হত অদিতিকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এখন সেটা করে কোন লাভ নেই। অম্লান সম্ভবত মাদ্রাজে চলে গিয়েছে। হয়তো সেখানে কোন দাদা বউদি পেয়ে তাদের উপকার করছে। হৈমন্তী সেটা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

www.boiRboi.blogspot.com

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com